আগস্ট, ১৯৪২

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড | কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ—আগস্ট, ১৯৪৭

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক : শিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭

নূতন কালের কাহিনীকার

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অনুজপ্রতিমেষু

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭

লেখকের এতাবৎ প্রকাশিত বই ●

ভুলি না । সৈনিক । আগস্ট, ১৯৪২ । ওগো বধূ সুন্দরী । নবীন যাত্রা । বাঁশের কেল্লা । রক্তের বদলে রক্ত । মানুষ নামক জন্তু । এক বিহঙ্গী । সবুজ চিঠি । বৃষ্টি, বৃষ্টি । বকুল । জল জঙ্গল । শত্রুপক্ষের মেয়ে । মানুষ গড়ার কারিগর । নিশিকুটুম্ব ১ম । নিশিকুটুম্ব ২য় । ছবি আর ছবি । চাঁদের ওপিঠ । রানী । বন কেটে বসত । সাজবদল । রূপবতী । স্বর্ণসজ্জা । পথ কে রুখবে ? । সেতুবন্ধ । প্রেমিক । ঝিলমিল । বনমর্মর । দেবী কিশোরী । নরবাঁধ । পৃথিবী কাদের ? । দুঃখ-নিশার শেষে । দিল্লি অনেক দূর । উলু । একদা নিশীথ কালে । খদ্যোত । কাচের আকাশ । কিংশুক । কুঙ্কুম । মায়াকন্যা । কল্পলতা । গল্পসংগ্রহ । শ্রেষ্ঠ গল্প । গল্প পঞ্চাশৎ । প্লাবন । বিপর্যয় । রাখিবন্ধন । ডম্বরু ডাক্তার । নূতন প্রভাত । বিলাসকুঞ্জ-বোর্ডিং । চীন দেখে এলাম ১ম পর্ব । চীন দেখে এলাম ২য় পর্ব । পথ চলি । সোবিয়েতের দেশে দেশে । নতুন ইয়োরোপ, নতুন মানুষ । রাজকন্যার স্বয়ম্বর । ওনারা ।

আদি কথা

(১)

ষাট বছর পূর্ণ হয়েছে এক বড় সাহিত্যিকের, তাই নিয়ে ডামাডোল। তাঁর লেখা যারা এক ছত্রও পড়ে নি, তারাও সভাসমিতি করে অভিনন্দন পাঠাচ্ছে, সাহিত্য-রসিক বলে নাম করে নিচ্ছে এই সুযোগে।

সেই মহামান্য ব্যক্তিটি আজ বিকালে সশরীর যূথীদের কলেজে আসছেন। উৎসবের বিপুল আয়োজন। ফুল-পাতা দিয়ে সাঁচির অনুকরণে মস্তবড় তোরণ তৈরি হয়েছে। দোতলার হলে সভার জায়গা। প্লাটফরমের উপরটায় গালিচা পাতা—শ্বেতপদ্ম গোলাপ আর রজনীগন্ধা চারিপাশে থরে থরে সাজানো। অতিথিকে এনে এইখানে বসাবে। দেয়াল মেজে আলপনায় ভরে দিয়েছে। যূথীর পরিকল্পনা এ সমস্ত; ছবি আঁকায় তার চমৎকার হাত। সমস্ত আলপনা একাই সে নিজের হাতে দিয়েছে। সাহিত্যিকটি অলস, অত্যন্ত কুনো-স্বভাবের— ভিড়ের মধ্যে বেরুতে চান না। যূথীই গিয়ে রাজি করিয়ে এসেছে। বড় বড় জায়গা থেকে অনুরোধ-উপরোধ প্রত্যাখ্যান করে এইরকম অতি-সাধারণ একটা কলেজে আসছেন—যে শোনে সে-ই অবাক হয়ে যাচ্ছে; শেষ অবধি আসবেন না, এই রকম সন্দেহ অনেকের মনে মনে। ছেলেদের ক'জন গিয়েছিল যূথীর সঙ্গে, লোকের মন্তব্য শুনে তারা মুখ টিপে হাসে। যূথিকা দেবী অমন করে বলতে লাগলেন, আপত্তি করবার ক্ষমতা ছিল কি বুড়োর? বয়স যা-ই হোক আর যত নামজাদাই

হোন, পুরুষের কাছে কমবয়সি মেয়ের খাতির সর্বত্র। বিশেষ যূথিকার মতো মেয়ের।

আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে খাটছে যূথী। হল সাজানো শেষ করে বেরুল, তখন বেলা দেড়টা। আলপনা দিয়ে আঙুলের ডগা টন-টন করছে। ট্রামে চলেছে, বাড়ি পৌঁছতে অন্তত আধঘণ্টা। দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ফিরতে হবে আবার এখনই। গানের মেয়েরা এসে পড়বে, শেষ গানের সুরটা কিছুতে মনোমত হচ্ছে না। আর একবার শুনে না হয় তো বাদ দেবে ও-গানটা। এদিকে ঠিকঠাক করে তারপর যেতে হবে সাহিত্যিক মশায়কে আনতে। যূথী নিজে যাবে, অন্যের উপর ভরসা করা যায় না। গল্প উপন্যাস অর্থাৎ মিথ্যেকথা লিখে লিখে নাম করেছেন, মিথ্যে অজুহাত দেখাতেও আটকায় না এসব মানুষের। শেষ মুহূর্তে হয়তো বলে বসবেন মাথা ধরেছে, হয়তো নামবেনই না উপর থেকে। এ রকম অভ্যাস তাঁর আছে, একাধিক ক্ষেত্রে এমনি ভাবে নাকি যজ্ঞপণ্ড করেছেন, এতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না ভদ্রলোকের। জানেন, লৌকিক ব্যবহার যে রকমই করুন—যতদিন লেখার ক্ষমতা আছে মানুষ তাঁর বই পড়বে, আদর করে ডাকবেও। অতএব যূথী নিজে যাবে তাঁর কাছে, দরকার হলে উপর অবধি উঠে যাবে। নিজের রূপসৌষ্ঠব হাসি-আবদারের দাম সে জানে। জানে, সে গিয়ে হাত ধরলে 'না' বলবার কারো উপায় থাকে না।

ঘড়াং করে ট্রাম থেমে গেল হঠাৎ। দেখল, অনেক দূর অবধি গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। একটা মিছিল আসছে, ভয়ানক কোলাহল। 'বন্দে মাতরম্' শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন একজনে হাঁক দিচ্ছে—'নির্মল ঘোষ', দলসুদ্ধ চেঁচাচ্ছে—'জিন্দাবাদ'। সামনের বেঞ্চিতে দুই বুড়ো মুখ চাওয়াচায়ি করে। নির্মল ঘোষটা কে হে? অপর জন অবজ্ঞার সুরে জবাব দেয়, কী জানি—দেবতা-গোঁসাই হবেন একজন। হলেই হল। এখন আর একটি-দুটি নয়—তেত্রিশ কোটির ব্যাপার।

আনাচে-কানাচে সব নেতা বেরুচ্ছে, মচ্ছব লেগেই আছে। বুঝলে না, ছেলেগুলোর পড়াশুনো না করবার অজুহাত।

পতাকাবাহী দলের মধ্যে চন্দ্রা নয়? চন্দ্রাই তো। বছরখানেক আগে একবার সে কংগ্রেসের চার আনা চাঁদা চাইতে এসেছিল। যূথী হেসে উঠেছিল, রায় বাহাদুরের মেয়ে চাচ্ছে কংগ্রেসের চাঁদা! অপ্রতিভ মুখে চন্দ্রা তখন রশিদ-বই লুকিয়ে ফেলেছিল আঁচলের তলায়। সেই একবার একটি দিন মাত্র। ইতিমধ্যে এত উন্নতি হয়েছে তার? দলের আগে আগে নিশান ধরে যাচ্ছে, খদ্দরের মোটা শাড়ি পরনে, রোদে মুখ লাল— বর্ষাসিক্ত রাস্তায় খালি পায়ে চলেছে, হাঁটুভর কাদা-মাখা। বারটি মেয়ে তারা একসঙ্গে পড়ে—এক ক্লাসে। এগার জন সকাল থেকে খাটছে, চন্দ্রারই কেবল দেখা নেই। অথচ যূথী এত করে তাকে বলে দিয়েছিল!

চন্দ্রা কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ তার নজর পড়ল যূথীর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল। ভাবখানা যেন তাকে দেখতে পায় নি! কিন্তু পারবে যূথীর সঙ্গে? সহজ ভাবে যূথী ডাক দিল: যাচ্ছ তো বিকেলে? এ বেলা ফাঁকি দিলে—আসল ব্যাপারের সময়ে যেও কিন্তু ভাই।

মিছিল এগিয়ে গেল। মনটা খারাপ লাগছে যূথীর। চন্দ্রার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে হচ্ছে। তার রূপ সাজ-পোষাক আর আলাপ-আচরণে বিস্ময় ঝরে পড়ছিল চন্দ্রার দু-চোখে। আর আজকের অনুষ্ঠানের জন্য যূথী হাতে ধরে পর্যন্ত অনুরোধ করেছিল, চন্দ্রা তা কানে না নিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় হৈ-হল্লা করে বেড়াচ্ছে।

বিকালে যথাসময়ে অতিথি নিয়ে যূথী কলেজ-গেটের সামনে এসে দেখল, বিপুল জনতা রাস্তার মাঝখান অবধি আটকে আছে।

তুমুল চিৎকারে কান পাতা যায় না। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে ভদ্রলোক ভীত ভাবে সেদিকে তাকাচ্ছেন। ব্যাপার কি হে?

যূথী বলে, দেখছি আমি। রোখো ড্রাইভার—

নেমে সে ভিড়ের ভিতর চলে গেল।

কি হচ্ছে? সভা করতে দেবেন না, ঢুকতেই দেবেন না ওঁকে? দুয়োরে ডেকে এনে অপমান করা– কী রকম ভদ্রতা?

মান-অপমানের ব্যাপার এ নয়। আচ্ছা, আমি সমস্ত বুঝিয়ে দিচ্ছি ওঁকে। নির্মল ঘোষ মারা গেছে, আমোদ-উৎসব আজকে চলতে পারে না।

যূথী তাকিয়ে দেখে, মহীন বলছে কথাগুলো। মহীন হঠাৎ কলকাতায়। পাড়াগাঁয়ে নাইট-ইস্কুল, তুলোর চাষ, চরখা, নদীর ধারে বাঁধবন্দি—সম্প্রতি এইসব কাজ নিয়ে রয়েছে, অবজ্ঞা আছে মহীনের উপর। আর আজকে যা তার চেহারাখানা দেখল, চোখ মেলে চাইতে গা শির-শির করে, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। এক-মুখ খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি, বড় বড় বিশৃঙ্খল চুল, কালো রং আরো কালো হয়ে একেবারে হাঁড়ির তলার মতো হয়ে গেছে।

আপনি কলেজের ছাত্র নন, কেউ নন। কোন সম্পর্ক নেই এখানকার সঙ্গে। কেন গোল পাকাতে এসেছেন বলুন তো?

মহীন বলল, মতলব করে আসি নি, বিশ্বাস করুন। আলাদা একটা কাজে দৈবাৎ এসে পড়েছি শহরে। খবরের কাগজে শেষ পাতায় দুটো লাইনে নির্মলের খবর দিয়েছে, আমি দেখতেও পাই নি। মেসের একজন দেখিয়ে দিল।

তারপর যূথীর মুখের দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বলে, এত রেগে যাচ্ছেন কেন? ভেবে দেখুন, ঘরে আগুন লাগলে বসে বসে শোনা যায় কি গান আর সাহিত্য-কথা?

যূথী বলে, কিন্তু আগুন কোথায় লাগল, তা তো দেখতে পাচ্ছি না।

সে কথা ঠিক, আপনারা দেখতে পান না। আগুন আপনাদের ঘরে লাগে নি, মনেও না। কিন্তু ধরে যাবে, এমন ফাঁকে ফাঁকে থাকতে আর পারছেন না। ঐ দেখুন, বুঝতে পেরে উনিই মোটর ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

ভকভক করে পিছনের নলে ধোঁয়া উড়িয়ে মোড় ঘুরে মোটরটা সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেল।

উচ্চকণ্ঠে সকলকে শুনিয়ে মহীন বলল, যাকে নিয়ে ব্যাপার, তিনি চলে গেছেন। কেউ আর ওদিকে ঢুকবেন না। নির্মলের আত্মার জন্য প্রার্থনা করিগে চলুন যাই।

যূথী বলে, আমি ঢুকব। আটকান—যদি সাধ্য থাকে।

মহীন বলে, শুয়ে পড়ব আপনার সামনে। জুতোর হিলে মাড়িয়ে চলে যান, দেখি কেমন!

পারব না মনে করেন? একটুও বাধবে না আমার—

বেশ তো, যান না—

চন্দ্রা কোন দিক থেকে মাঝে এসে পড়ল। দুপুরের সেই খদ্দরের শাড়ি পরা, খালি পা। অনুরোধ রেখেছে তা হলে—ও বেলা দেখা যায় নি, আসল ব্যাপারের সময় চলে এসেছে। ভর্ৎসনার সুরে মহীনকে বলল, আবার ঝগড়া বাধিয়েছেন? পাড়াগাঁয়ে থেকে থেকে কী স্বভাব হয়েছে আপনাকে নিয়ে পারা যায় না। চলো ভাই যূথী, লোক জমে যাচ্ছে, হাসাহাসি করছে সবাই—মহীন-দার তো সে কাণ্ডজ্ঞান নেই!

মহীনের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি হেনে চন্দ্রা যূথীর হাত ধরে টেনেই নিয়ে চলল একরকম। মহীন বলে, ঠিক হয়েছে। ছেড়ো না চন্দ্রা, নিয়ে যাও আমাদের ওদিক—

যূথী আশ্চর্য হয়ে চন্দ্রার দিকে তাকাল। এমন মুরুব্বিয়ানা ঢঙে কথা বলতে শিখল সে কবে থেকে? চন্দ্রা রাজরাণী আর যূথী এখানে নিতান্তই যেন বাইরের লোক। অথচ ছাত্রীদের মধ্যে সে-ই

বোধ করি সর্বপ্রথম আলাপ করে এই মহীনের সঙ্গে। চন্দ্রা বা আর-কেউ ঘেঁষতে সাহস করে নি।

ইস্কুল অতিক্রম করে সবে তখন যূথী এই কলেজে এসেছে। মহীন তিন ক্লাস উপরে পড়ে—সারা কলেজে তার নাম। নিজের গুণে নয় অবশ্য। সবাই আঙুল দিয়ে দেখায়, অরিজিত রায়ের ছেলে—কিন্তু বাপের মতো নয় একটুও। বইয়ের পোকা—জগতের খবরাখবর রাখে না। ফিলসফিতে সে রেকর্ড-নম্বর পাবে, এ বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ; কিন্তু পাশ করলেও মানুষ হবে না কখনো। তিন বছর পড়ছে, কলেজের হোক আর য়্যুনিভারসিটির হোক—কোন পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয় নি। অধ্যাপকরা তারই দিকে চেয়ে ক্লাসে পড়ান, তাঁদের সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত মহীনের প্রতি। সে যতক্ষণ বিহ্বল অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, জটিল বিষয়টা শত রকম ব্যখ্যায় প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করেন; তার চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটলেই সঙ্গে সঙ্গে থেমে যান তাঁরা। মহীন ছাড়া যেন ছাত্র নেই—ক্লাস-ভরতি এত যে ছেলে-মেয়ে, সবাই নগণ্য তাঁদের কাছে। একজনকে শেখাবার জন্য যেন যত আয়োজন। সকলের হিংসা আরও বেড়েছিল এই কারণে। হোক ভাল ছেলে, তবু বলতে হবে বাপের কুপুত্র।

কমন-রুমে বেশ উঁচুগলায় এই সব বলাবলি হচ্ছে—তখন দেখা যেত, এক কোণে মোটা মোটা বইয়ের মধ্যে মহীন মাথা ডুবিয়ে আছে, মুখে ভাববিকৃতি নেই, কোন আলোচনাই কানে যেন যাচ্ছে না তার। বইগুলোও ঠিক কলেজপাঠ্য নয়—নানাতন্ত্রের দর্শন ও অর্থনীতির বই। ঘণ্টা বাজলে বই বন্ধ করে কারও মুখে না চেয়ে সে বেরিয়ে গেল। ছেলেরা মুখ চাওয়াচায়ি করে, মানুষ নয় নাকি

তারা ? এত ক্ষুদ্র কীট যে চোখেই পড়ে না ?

যূথীর কি খেয়াল—একদিন গিয়ে চুপ করে মহীনের পাশটিতে বসে পড়ল। তখন সে বই থেকে খাতায় কি টুকছে, আর নিবিষ্ট হয়ে ভাবছে মাঝে মাঝে। বসেই আছে যূথী—মানুষটার নিন্দা অকারণে নয়—এত কাছে, মহীন তবু একবার তাকিয়ে দেখলে না। টের পায় নি, না ইচ্ছে করে অবহেলা করা ?

যূথীই শেষে কথা বলল : আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

তাড়াতাড়ি মহীন খাতা ঢেকে ফেলে। যেন তার গোপন ভাবনা জেনে ফেলবে এই মেয়েটি, যা সে প্রকাশ করতে চায় না। যুক্তকরে বলে, নমস্কার ! আমাদের কলেজেই পড়েন ?

যূথী মনে মনে আহত হয়। যে কেউ সান্নিধ্যে আসে, তার দিকে না চেয়ে পারে না—দৃষ্টি গোপন করতে গিয়ে বিমুগ্ধ ভাব আরও প্রকাশ করে ফেলে। এ সৌন্দর্য-গৌরব সমগ্র সত্তা দিয়ে যূথী উপভোগ করে। আর এতদিনের মধ্যে তার দিকে একবার চেয়েও দেখে নি এই মহীন ?

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলল, নিচের ক্লাসে পড়ি, আর পড়াশুনোও মন দিয়ে করি নে। নিচের দিকে নজর যায় না তো আপনার মতো ভাল-ছেলেদের—

কী বলতে হবে এ অবস্থায়—কথা খুঁজে না পেয়ে মহীন বিব্রত হল। বলে, সত্যি, কী রকম অন্যমনস্ক স্বভাব যে আমার। পথ চলি, তা-ও ভাবতে ভাবতে চলি—কোন দিকে তাকিয়ে দেখি নে। কলেজের পড়াশুনো এ অবস্থায় কদ্দিন যে চলবে বলতে পারছি নে। আচ্ছা, নমস্কার !

তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ল। যেন পালিয়ে গেল প্রগল্ভ মেয়েটার কাছ থেকে।

দাম্ভিক মানুষ কি এই ? যেন জলে পড়ে গেছে, এইরকম তার চোখমুখের অসহায় ভাব। যূথীর মনটা খারাপ হয়ে রইল মহীনের

কথাগুলো শুনে। রাত্রেও বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে। অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়তো ওদের—পোশাক আর চালচলনে অন্তত তাই মনে হয়। এমন মেধাবী ছেলে পড়া বন্ধ করছে অর্থের অভাবেই—সেই কথাটাই মহীন পাকে-প্রকারে বলল হয়তো।

কিন্তু যূথীদের অবস্থা এমন নয়, অন্যকে সাহায্য করতে পারে। চন্দ্রাকে সে কথাটা বলল। তারপর একদিন মহীনকে পাকড়াও করল দু-জনে একসঙ্গে মিলে। গোবেচারাকে বিপদে ফেলে খুব মজা পাওয়া যায়। সেদিনের সেই পলায়নের ছবি এখনো যূথীর মন মনে ভাসে। গেটের কাছে দেখা—মহীন ঢুকছে, যূথী সামনে গিয়ে বলল, চিনতে পারছেন, না ভুলে বসে আছেন?

মহীন হেসে বলল, পাড়াগাঁয়ের মানুষ—শহরের আদবকায়দা জানি নে। তা বলে স্মৃতিশক্তি একেবারে নেই, তা ভাববেন না।

যূথী বলে, পাড়াগাঁয়ের দোহাই দিয়ে এড়াতে পারবেন না। শহরে রয়েছেনও তো তিন-চার বছর—

আর থাকব না ভাবছি। থাকা উচিত নয়।

তারপর সহসা অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে উঠল, শহরে এমন ভাবে পড়ে থাকা আর উচিত হচ্ছে না।

চন্দ্রা আশ্চর্য হয়ে মহীনের দিকে তাকাল। যূথী বলে, চলুন, বসিগে কোথাও একটু। আমার বন্ধু চন্দ্রার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। রিটায়ার্ড জজ রায় বাহাদুর নৃসিংহ হালদারের মেয়ে।

মহীন ইতস্তত করে: কিন্তু আমার বড্ড জরুরি কাজ রয়েছে—

কাজ বন্ধ থাকবে এখন। দু-জনে মিলে আমরা বলছি।

হুকুমের স্বরে কথাটা বলে যূথী হাত বাড়াল। হাত ধরে বসবে নাকি? কিছু বিচিত্র নয় এই মেয়ের পক্ষে। সভয়ে মহীন এদিক-ওদিক তাকায়। যূথী হেসে উঠে বলে, পালিয়ে যাবেন? দু-জনেই পিছু পিছু দৌড়ব তা হলে। সে বড্ড বিশ্রী হবে, ভেবে দেখুন।

বলতে বলতে ফিক করে হেসে ফেলল। বলে, বসিগে চলুন যাই। আপনার বাবার কথা শুনতে চাই আমরা কিছু।

মহান বলে, আমি কিচ্ছু জানি নে, বিশ্বাস করুন। তাঁকে চোখে দেখি নি—আমার জন্মই হয় নি তাঁদের কাজকর্মের সে সময়ে। আর বাড়িতেও কেউ কোন কথা তোলে না তাঁর সম্পর্কে।

সহসা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বলে, মাপ করুন। সত্যি, বড্ড দরকার আমার এখন।

নমস্কার করে মহীন যেমন এসেছিল, হন-হন করে সেই পথে আবার বেরিয়ে চলে গেল।

চন্দ্রা বলে, অন্যায় হল যূথী। পড়াশুনা করতে আসছিলেন। নিজেরা তো কিছু করি নে, ওঁর দিনটা মাটি করে দিলাম।

ক'দিন পরে চন্দ্রা এক দুঃসাহসিক কাজ করেছিল—সে কথা কাউকে বলে নি, যূথীকেও না। মহীনের মুখোমুখি সোজা দাঁড়িয়ে বলেছিল, পড়া ছেড়ে দিচ্ছেন—প্রিন্সিপ্যালকে নাকি জানিয়ে দিয়েছেন আপনি?

কোথায় শুনলেন?

কারো জানতে বাকি নেই কলেজের ভিতর।

একটু ইতস্তত করে বলল আর কেন ছাড়ছেন তা-ও জানি।

মহীন চমকে উঠল: জানেন? কি জানেন বলুন তো?

চন্দ্রা বাঁ-হাতের অনামিকা থেকে হীরে-বসানো আংটি খুলে মহীনের হাতে গুঁজে দিল।

বিস্মিত মহীন প্রশ্ন করে, কি হবে?

চন্দ্রা কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল, আপনি কিছু মনে করবেন না। এতে আপনার অসম্মান হল কিনা বুঝতে পারছি নে। কিন্তু আপনার মতো ছেলের পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এ আমার সহ্য হবে না কিছুতে।

মহীনের মুখে মৃদু হাসি ফুটল এতক্ষণে।

দামি জিনিষটা দিয়ে দিচ্ছেন, বাড়ির লোকে কিছু বলবে না?

চন্দ্রা বলে, বলব যে হারিয়ে গেছে। একটা-দুটো এমন আংটি খোয়ালে বাবার কিছু যায় আসে না। কিন্তু অজুহাত করে আপনি যদি ফিরিয়ে দেন, বড্ড কষ্ট হবে আমার।

মহীন বলে, কিন্তু কি করব বলুন আংটি দিয়ে? আপনার আংটি আমার আঙুলে ঢুকবে না। নইলে হীরের ঝিলিক দিয়ে হাত ঘুরিয়ে বেড়াতাম না-হয় দিন কতক।

তারপর হাসতে হাসতে বলল, বড়লোক নই বটে, তবে টাকার অভাবে আপনার আংটি বেচে পড়া চালাতে হবে এ অনুমানও আপনার ঠিক নয়।

ব্যাকুল আগ্রহে চন্দ্রা বলে, পড়া ছাড়ছেন কেন তা হলে?

ছাড়বেন না, না শুনে?

চন্দ্রা বলে, গোপন কিছু নিশ্চয় নয়—

মহীন বলে, সবটা নয়, কিছু প্রকাশ করা চলে। এমন দরদী মানুষ আপনি—আপনার কাছে বলব এক সময়। এই আংটির চেয়ে বড় দান চাই আপনার কাছে—ঢের বড় জিনিষ।

হাস্যমুখ—কিন্তু বজ্র-জ্বালা কণ্ঠস্বরে। অরিজিত রায়ের কথা শুনেছে, তাঁর কণ্ঠ ছিল এমনি? লাজুক মহীন্দ্র রায়ের মধ্য দিয়ে এদের কল্পনার অরিজিত যেন বেরিয়ে এলেন মুহূর্তকাল। পরক্ষণেই আবার আগেকার সেই শান্ত মানুষটি।

পরে একদিন মহীন চন্দ্রাকে তার কথা বলেছিল। স্বল্পবাক্ এই যুবা গতানুগতিকতার প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এত কথা এমন সুন্দর করে ভেবেছে! কে বলে পৃথিবীর ঘটনাধারার খোঁজ রাখে না মহীন? প্রতিপাদ্য বিষয় ভুলে মাঝে মাঝে শুধু তার বলবার বিশেষ ভঙ্গিটাই চন্দ্রা বিমুগ্ধ হয়ে উপভোগ করছে। এই যেভাবে পড়াশুনা করে যাচ্ছে—এটা নিতান্তই পণ্ডশ্রম এখন। গ্রামে যাবে,

মহীন ঠিক করেছে। শহরে আলো জ্বালিয়ে পোকার ভিড়ই বাড়ছে, বেকার হচ্ছে মানুষ, চিরাচরিত স্বাভাবিক সমাজ-ব্যবস্থা বিচূর্ণিত হচ্ছে। গ্রাম-সংস্কারের চেয়ে নগর-সংস্কারের কথাই বেশি ভাববার দরকার এখন। টাকা এক জায়গায় জমে থাকবে না, সব মানুষ ভাল খাবে ভাল পরবে—এই চাচ্ছে আজকের পৃথিবী। আগামী কালের পৃথিবীর আরও চাইবে—রাষ্ট্রশক্তিও কোন রূপে কোন অবস্থায় এক জায়গায় জমে থাকবে না, টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে হবে গণ-মানুষের মধ্যে। সভ্যতার সেই হবে সর্বোত্তম প্রাপ্তি। গোটা কয়েক শুধু মানুষ আছে পৃথিবীতে, বাকি সব কঙ্কাল। সেই কঙ্কালদের আত্মশক্তিতে জাগিয়ে তুলতে হবে, জাগাতে হবে বেঁচে উঠবার বল-ভরসা, জীবন-চর্চার শৃঙ্খলা ও নীতি, পরিচ্ছন্নতা ও মননশীলতা। বাইরে থেকে সমস্যা যত দুর্লঙ্ঘ্য মনে করি আসলে তা নয়। অভ্যাসের জড়তা কাটিয়ে ঝাঁপ দিতে পারলে কঠিন আর কিছু থাকবে না।

মুখচোরা মহীনের মুখ খুলে গেছে। চন্দ্রার জবাব জোগায় না। নূতন এক সমাজের ছবি প্রতিভাত হচ্ছে ধীরে ধীরে যেন চোখের সামনে। বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রশক্তি, সত্যকার গণতন্ত্র ও ধনসাম্য দেখা দিয়েছে, বেকার নেই, দুঃখী-গরিব কেউ নেই, বিশ্বের কানে মুক্তির অভীঃ-বার্তা পৌঁছল এত শতাব্দীর অগ্রগতির ফলে। ভারতের সাতলক্ষ গ্রাম ঐক্যবদ্ধ পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে—যেন সাতলক্ষ বলিষ্ঠ মানুষ। কেউ কারো উপর নির্ভরশীল নয়। মহীনের আবেগ-উচ্ছ্বসিত কথা শুনতে শুনতে চন্দ্রার মনে হচ্ছে, যে সব বিধান আবিষ্কার করে মানুষ ভেবেছে প্রগতি চূড়ান্ত অবধি পৌঁছে গিয়েছে, তার বাইরে আরও অনেক—অনেক দূর অবধি ভাবছে কেউ কেউ। পূর্ণতর সত্য ভাবীযুগের বিশ্বের জন্য সঞ্চিত হচ্ছে। স্পষ্ট বুঝিয়ে বলতে পারবে না, কিন্তু এই রকম একটা উপলব্ধি হচ্ছে চন্দ্রার।

কিন্তু সংস্কার এড়ানো সোজা নয়। এসব সত্ত্বেও তার কষ্ট হচ্ছে মহীনের জন্য। সত্যিই এই ধীমান ছেলেটি গ্রামে যাবে, স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করে চাষাভুষোর মধ্যে কাল কাটাবে? একদিন মরে যাবে, কেউ জানবে না, গ্রামপ্রান্তের শ্মশানঘাটে চিতার আগুন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসবে, কলসির জলে চিতা-ভস্ম ধুয়ে দেবে, তারপর আরও কয়েক মাস বা কয়েক বৎসরে ধুয়ে যাবে তার নাম সঙ্কীর্ণ গ্রামের সামান্য ক'জন নরনারীর মন থেকেও।

নিশ্বাস পড়ে মহীনের জন্য। আর একবার একাকী যখন তার কথাগুলো ভাবার চেষ্টা করে, সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়—মনে সন্দেহ জাগে। যা বলেছে সব বাজে। সামনাসামনি তার যুক্তির গলদ বের করতে পারে নি বটে, কিন্তু কতটুকুই বা বোঝে চন্দ্রা! মহীনের মতো ছেলে ধোঁয়াকে যুক্তি-জালে বাস্তব নিরেট-পাথর বলে ধোঁকা দেবে—এ আর আশ্চর্য কি? আবার অন্য কথাও ভাবছে—গোপন কারণ যা সে বলল না, তাই ই হয়তো তাকে তাড়িয়ে নিয়ে তুলছে নির্জন গ্রামে। গ্রামে না গিয়ে তার উপায় নেই।

সেই গোপন কারণের অবশেষে কিছু আঁচ পাওয়া গেল, নির্মল ঘোষের সঙ্গে মহীনকেও যখন গ্রেপ্তার করল—ধার্মিক ও স্বদেশি বলে খ্যাত একজনকে গুলি করার সম্পর্কে। গোবরায় নির্মলদের যিনি বৎসরাধিক কাল আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন, সেই লোক নাকি স্পাই। এতদিন ধরিয়ে দেন নি একেবারে ঝাঁকসুদ্ধ ধরাবেন এই আশায়। সে আর এক গল্প—কেমন করে হঠাৎ তাঁর স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গেল। নিতান্ত নিরীহ গোছের আধবুড়ো ভদ্রলোক—হয়তো আগে ঠিক-মানুষই ছিলেন, লোভে ও ভয়ে পড়ে পতন ঘটেছে। তিনি চলে যাচ্ছেন পুরীধামে তীর্থ করতে। এরা বলাবলি করে, যাচ্ছেন আর ফিরবেন না, ফিরবার সাহস নেই আর এ অঞ্চলে। বুঝতে পেরেছেন এরা টের পেয়ে গেছে। আর ফেরা উচিতও নয় এরকম লোকের। বেঁচে থাকাই উচিত নয়।

রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং। গেট বন্ধ—বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে নির্মল ঘোষ বিরক্তির সঙ্গে হাতঘড়ি দেখছে। একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল। হাত কাঁপছে, দেশলাই নিভে গেল। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, গেট খুলে দেবে কতক্ষণে। কিন্তু গেট খুলবার আগেই মোটর এসে পৌঁছল। ফট···ফট! মোটর থেকেও আওয়াজ। বিকালের শান্ত জঙ্গল বিচলিত হয়ে উঠল, পাখীরা কিচমিচ করে উঠে পালাল। ধরা পড়ল সেইখানে আহত নির্মল ঘোষ। আর মহীনকে ধরল এর তিন দিন পরে।

ধরবার ঠিক আগের দিন প্রিন্সিপ্যাল মহীনকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

শোন, তোমার সম্বন্ধে পুলিশ খোঁজখবর করতে এসেছিল।

মহীন টেবিলে হাত রেখে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে। ভালমন্দ কোন কথা সে বলল না।

প্রিন্সিপ্যাল বলতে লাগলেন, আমি আমলই দিলাম না। বললাম, এদ্দিন পড়ছে এখানে, খুব ভাল করে চিনি। রাজনীতির ধার দিয়েই সে মাড়ায় না, সব দিক দিয়ে আদর্শ ছেলে।

তারপর ভরসা দিয়ে বলতে লাগলেন, কোন ভয় নেই। তোমার বাপের নামে দাগ আছে, সেই সুবাদে এসেছিল আর কি! টি. এন. জি. তখন তোমাদের ফিলসফির ক্লাস নিচ্ছিলেন—

মহীন বলল, আমি স্যার ক্লাসে ছিলাম না কিন্তু।

ছিলে না—বল কি। ভুল দেখলাম নাকি তবে?

হাজিরা-বই খুলে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই তো—এই যে রয়েছে।

মহীন বলে, টি. এন. জি. ভালবাসেন আমাকে। রোজই ক্লাসে থাকি—না দেখেই তাই বসিয়ে দিয়ে যান এই রকম। পিরিয়ডের গোড়ায় রোল-কল হয় বলে অনেকেই এসে পৌঁছয় না—আগেভাগেই অনেক সময় অনেক সময় উনি 'পি' বসিয়ে রাখেন।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, আহা, ক্লাসে না থাক, লাইব্রেরিতে ছিলে তো! কম্পাউণ্ডের ভিতর থাকলেই হল।

কম্পাউণ্ডের ভিতরেও ছিলাম না স্যার।

একমুহূর্ত তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, তা না থাকো, আশা করি ঐ ব্যাপারের মধ্যেও ছিলে না। যাও যাও—মুখ দিয়ে উচ্চারণ কোর না আর ওসব।

কলেজের রেজেস্ট্রি-বইয়ে হাজির থাকার দরুনই মাস পাঁচেক আটক থেকে মহীন শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেল। ছাড়া পেয়ে দেশে চলে গেল, কারও সঙ্গে দেখা করল না। কলেজ থেকেও নাম কাটা গিয়েছিল, তা হয়তো সে জানে না আজও। অরিজিত রায়ের ছেলেকে বাপের গৌরবে বসাবার জন্য যারা উঠে-পড়ে করে লেগেছিল, তাদের হাত থেকে যেন ছুটে পালিয়ে সে বসে আছে মা-দিদিমার নির্ভয় অঞ্চলাশ্রয়ে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল নির্মল ঘোষের।

(২)

সেই নির্মল মারা গেছে। আন্দামানে তাকে যেতে হয় নি, বাংলা দেশেরই এক মফস্বল শহরের জেলে তিন বছর কাটিয়েছে। মাঝে একবার খবর রটল, কি কারণে অনশন-ধর্মঘট করেছে তারা ক'জন। আবার খবর এল, ধর্মঘট ভেঙেছে। এবং তারই পরে মরার খবর।

বিচ্ছিন্ন কতকগুলো ছবি মহীনের মনে ভাসে—কতক চোখে দেখা, কতক আন্দাজি।···নির্মলের বুড়ো বাপকে জানলার গরাদের সঙ্গে বেঁধেছে। মারছে। বুড়োর কোটরগত দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। হাতজোড় করছেন তিনি ছেলের দিকে: আর পারি নে বাবা, যা জানিস বলে দে। নির্মল রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ছে, ঠোঁটদুটো নড়ছে অল্প অল্প। জপমন্ত্রের মতো অনুচ্চ স্বরে কতকটা নিজের মনেই যেন বলে যাচ্ছে, কিছু জানি নে আমি, কিছু না, কিছু না, কিছু না।···হাতে হাতকড়ি, পরম শান্ত মুখে শুয়ে আছে নির্মল সেলের মধ্যে, উঠে হাত বাড়িয়ে বাইরে-রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল এক ঢোক, বারকয়েক চোখে-মুখে দিল··· যমদূতাকৃতি জনচারেক পাশে হাঁটু গেড়ে বসে টিউবে করে খাওয়াচ্ছে, মরতে দেবে না, বেঁচে থাকতে হবেই তাকে···হাসপাতালের লাস-ঘরের মেজেয় নির্মল পড়ে রয়েছে, সকল সংগ্রামের অবসান অবশেষে।

নেতা নয় নির্মল ঘোষ, সামান্য সাধারণ কর্মী। এই কলেজেই অল্প কিছু দিন পড়েছিল, আসতই না প্রায় কলেজে—এলেও শেষ বেঞ্চিতে ঘাড় গুঁজে বসে থাকত—অধ্যাপকরা চেহারাই মনে করতে পারেন না কিছুতে। তার স্মৃতি-অনুষ্ঠান বড় ব্যাপার নয়। কলেজের সীমানার মধ্যে কর্তৃপক্ষ জায়গা দেন নি, খেলার মাঠের

পশ্চিমদিকে বকুলগাছ—তারই নিচে নির্মলের একখানা ছবি রেখে দিয়েছে। ছেলেমেয়েরা প্রায় কেউ তাকে দেখে নি, আজকের ছবির ভিতর দিয়ে হাসছে সে সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে। বক্তৃতা হবে না। সারবন্দি আসছে সকলে—এসে শান্ত গভীর দৃষ্টিতে ক্ষণকাল ছবির দিকে চেয়ে যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। কোন আড়ম্বর নেই অনুষ্ঠানে, ঠিক একেবারে ঐ নির্মল ছেলেটির মতো। বাইরে থেকে দেখতে নিতান্ত সাধারণ, হাজার হাজারের মতোই একটি সরল সহৃদয় যুবা। দূর দুর্গম অজানা জায়গায় উঁচু পাঁচিলের অবরোধের মধ্যে নিঃশব্দে চোখ বুজেছে, খবরের-কাগজে দুটোর বেশি তিনটে লাইন জায়গা জুটল না, জানা গেল না কেমন করে হঠাৎ সে মারা গেল।

যূথীর হাত ধরে চন্দ্রা চলেছে। ঝাঁঝালো কণ্ঠে যূথী বলে উঠল হাত ছাড়, যাচ্ছিই তো। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার দরকার নেই, পালিয়ে যাব না।

চন্দ্রা বলে, বড্ড চটে গিয়েছ তুমি।

যূথী বলে, মহীন বাবুর নাম কেটে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল—আজকে একটা অজুহাত তুলে তাই তিনি শোধ নিলেন কলেজের উপর। শোধ নিতেই হঠাৎ এসেছেন গ্রাম থেকে। এ আমার নিশ্চিত ধারণা।

আহত কণ্ঠে চন্দ্রা বলে, দেশকর্মী একজন ঐ অবস্থায় মারা গেলেন। এটাকে অজুহাত বলছ?

এমন দেশকর্মী তো হাজার হাজার।

চন্দ্রা বলে, মহাভাগ্য আমাদের। কেবল দুঃখ এই, এত আত্মত্যাগেও আজও এঁরা দেশের ভাগ্য ফেরাতে পারলেন না।

যূথী বলে জন্মোৎসব-মরণোৎসব করে করে পেছন থেকে তোমরা নাচিয়ে দাও, আর বোমা-রিভলভার ছুঁড়ে মারা পড়ছে সেন্টিমেন্টাল ছেলেগুলো। এই নির্মল ঘোষের কথাই ধর, জীবন দিয়ে লাভটা

কি হল? দুশমনটা মরতও যদি, তবু চরবৃত্তি করবার লোকের অভাব হত কি দেশের মধ্যে? দু-দশটা অমন কীটপতঙ্গ মেরে এ গবর্নমেণ্ট ঘায়েল করা যাবে না, নিজেরাই মারা পড়ছে শুধু।

চন্দ্রা বলে, মরে মরে মরার ভয়টা ভেঙে দিচ্ছে—সেই তো মস্ত লাভ।

ভাঙছে কি?

লোকের মনের তলায় নজর পড়ে না যে! ভেবে দেখ তো—ফাঁসির-দড়ি গ্রাহ্য করে না, ফাঁসির হুকুমের পর ওজন বেড়ে যায়, 'তোমার ছেলে আমি, তোমার কান্না সাজে না মা'—এই বলে চোখ মুছিয়ে মাকে সান্ত্বনা দেয়—মৃত্যুর সামনে লোক-দেখানো অভিনয় করে না নিশ্চয়—এমন ছেলে আজ আর একটা-দুটো নয়। দিনকে-দিন বেড়েই যাচ্ছে, গোণাগুণতিতে আসে না।

মহীন দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলা-বিধান করছিল। যূথীকে বলল, জুতো খুলতে হবে।

কেন?

হ্যাঁ—

যূথী বলে, ঠাকুরঘর নাকি? অর্থ হয় এসব মিথ্যে সংস্কার মানার?

চন্দ্রা বলল, সবাই খালি-পায়ে। দরকারই বা কি পায়ে জুতো রাখবার?

নিচু হয়ে জোর করে চন্দ্রা জুতো খুলে ফেলল যূথীর পা থেকে। বলে, যেতে লাগো তুমি ওখানে। জুতোজোড়া এক দৌড়ে হস্টেলে রেখে আসছি।

রোষদৃষ্টিতে মহীনের দিকে চেয়ে যূথী এগিয়ে চলল। বকুলতলায় ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে দেখছে নির্মলের ছবিখানা। বক্তৃতার ব্যবস্থা নেই— খুশি হল সে এর জন্য। এদের আত্মদানের মূল্য লঘু হয়ে যেত কথার চাপল্যে। এমন কি ক্ষণপূর্বে সাহিত্য-সভা পণ্ড হওয়ার দরুন বক্তৃতা করতে না পারায় যে আক্রোশ মনে

জমেছিল, তা-ও স্তিমিত হয়ে এল এই জায়গায় দাঁড়িয়ে। সবাই ফিরে যাচ্ছে, যূথী তখনো তাকিয়ে আছে তদ্গত হয়ে সেই ছবির দিকে।

চন্দ্রা তার ধ্যান ভেঙে দিল : চল যাই—

মহীন কথা বলে উঠল। কখন থেকে সে পাশাপাশি চলেছে—বলে, খুব রাগ করে আছেন, কিন্তু রাগ পুষে রাখতে দিলে চলবে না আমার। স্বার্থের খাতিরে ভাব করতে এসেছি। একটা কাজ নিয়ে এসেছি, সাহায্য চাই।

ছবির মুখের হাসিটা তখনো ভাসছে যূথীর মনের মধ্যে। বলল, একলা আপনার উপর রাগ করেই বা কি হবে বলুন? গোটা দেশই দেখছি ক্ষেপে গেছে। সকলের উপর রাগ করতে হলে রাতদিনই মুখ গোমড়া করে থাকতে হয়। জানেন তো, সে আমার ধাতে সইবে না।

চন্দ্রাকে বলল, জুতো কোথায় রেখে এলে ভাই, এনে দাও। সন্ধ্যা হয়ে এল, বাড়ি যাব। আর ততক্ষণে শুনে নিই, কোন স্বার্থে মহীন বাবু কলকাতায় এসেছেন।

রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে যূথী। আশ্চর্য সুন্দর দেহে মনোরম ক্লান্তির ভঙ্গিমা। লোকজন কেউ নেই এখন।

মহীন বলল, আপনাদের কেবিনের দোকানে আমায় নিয়ে গিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। গোটা চারেক চরখা বানিয়ে দিতে হবে দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যে।

এদ্দূর থেকে বয়ে নিয়ে যাবেন—গ্রামে মিস্ত্রি মেলে না?

মহীন বলে, নতুন ধরনের চরখা। অনেক খেটেখুটে এক নক্সা তৈরি করেছি।

তারপর খদ্দরের পাঞ্জাবির পকেট থেকে পরমোৎসাহে বের করল সেই নক্সা। নক্সাই নয় শুধু—সেই কাগজের প্রান্তে দস্তুরমতো

অঙ্ক কষে দেখানো হয়েছে, সাধারণ চরখার তুলনায় কত বেশি সুতো আদায় হবে।

আকৃতি ও আয়তন মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়ে সগর্বে মহীন বলে, বুঝতে পারলেন? এখন কাজে কদ্দূর কি দাঁড়াবে, সেইটে হল কথা।

কিন্তু কি গরজ বলুন তো কম সময়ে বেশি সুতোর? তা হলে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা কি করে কাটাবে আপনাদের পাড়াগাঁয়ের মানুষ?

পাড়াগাঁয়ে যান নি কখনো। গেলে দেখতেন, কাজ করে সময়ই পায় না চাষীর বাড়ির মেয়েপুরুষ।

তবে কেন জেহাদ ঘোষণা করেছেন মিল আর কলকজার বিরুদ্ধে—খুব কম সময়ে খুব বেশি সুতো পাওয়া যাচ্ছে যেখানে?

মহীন বলে, শ্রদ্ধা করে বুঝতে চাচ্ছেন না। দরকার কি মিছে তর্কাতর্কি করে?

আকাশের দিকে চেয়ে বলে, বড্ড মেঘ করেছে, বৃষ্টি হবে বোধ হয়। তা হলে তো মুশকিল।

হস্টেলের বারাণ্ডা অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে চন্দ্রা দোতলার কোণের ঘরটার সামনে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাক দিল, আছিস বিজলী?

এসো—

চন্দ্রা ঘরে ঢুকে আবার দরজা ভেজিয়ে দিল। ফার্স্ট ইয়ারের মেয়ে বিজলী—এই সন্ধ্যাবেলাতেই খাটের উপর আড় হয়ে একটা সিনেমা-প্রোগ্রামের পাতা উল্টাচ্ছে।

যাস নি ওদিকে?

বিজলী বলে, শরীরটা খারাপ লাগছিল।

হুঁ—বলে চন্দ্রা খাটের নিচে থেকে ছোট একটা স্যুটকেস বের করল।

আড়চোখে আপনার স্যুটকেস নিয়ে যান চন্দ্রা-দি। বিজলী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তারপর বলল—

কেন?

ছাত্রী-সমিতি নিয়ে আপনার নাম ছড়িয়ে যাচ্ছে। যখন-তখন আসেন বলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অনেক জেরা করছিলেন আপনার সম্বন্ধে। কেন আসেন, কি বৃত্তান্ত, আমি ঐ ছাত্রী-সমিতির মধ্যে আছি কিনা।

চন্দ্রা কাপড় বদলাচ্ছিল। খদ্দরের শাড়িটা পাট করতে করতে বলল, বলে, দিও আত্মীয়তা আছে— এসে দেখাশুনা করে যাই।

বিজলী বলে, যে রকম মানুষ—কোন দিন হয়তো ঘরে এসে উলটে-পালটে বের করে ফেলবেন ঐ স্যুটকেস!

করলেনই বা। উলটে-পালটে দেখতে পাবেন খদ্দরের শাড়ি-ব্লাউজ আর বড় জোর সমিতির রশিদ-বইটা।

বিজলী বলে, তা হোক—নিয়ে যান আপনি। আমার ভয় করে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে চন্দ্রা একমুহূর্ত তার দিকে চাইল। তারপর বলে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের চেয়ে তোমারই বেশি আপত্তি বুঝতে পারছি। আচ্ছা—

যূথীর জুতাজোড়া হাতে নিয়েছিল, স্যুটকেসও তুলে নিল এবার। বিজলীর দিকে চেয়ে কঠোর কণ্ঠে সে বলল, আচ্ছা—নির্বিঘ্ন হলে তো এবার? আমার জন্য ঘর আগলে বসে থাকতে হবে না, দুপুরের শো-তে কলেজ পালিয়ে হরদম সিনেমা দেখে বেড়িও।

মুখ ফিরিয়ে চন্দ্রা বেরিয়ে এল।

নূতন পোশাকে চন্দ্রাকে দেখে যূথী উচ্ছ্বসিত হল।

বাঃ এই তো—যাকে যা মানায়। গুণ-চট পরে খালি পায়ে এক-হাঁটু ধুলো-মাটি মেখে এতক্ষণ দাসী-বাঁদীর মতো ঘুরছিলে—বিশ্রী দেখাচ্ছিল। হস্টেলে আছ নাকি আজকাল?

আমি নই, খদ্দরের এই জামাকাপড় ক'টা—

স্যুটকেস উঁচু করে দেখাল।

যূথী হেসে উঠে বলে, বেশ বুদ্ধি করেছ। জবড়জং বোঝা বয়ে তোমাদের বরানগরের বাড়ি অবধি অদ্দূর যাওয়া-আসা সোজা ব্যাপার? গ্রীনরুম থেকে সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়, কাজকর্ম চুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোশাক নামিয়ে দিয়ে খালাস।

চন্দ্রার মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটল, যূথীর ব্যঙ্গের হাসি ছুরির মতো তার অন্তরে কেটে কেটে বসছে। বলে, আমার অদৃষ্ট ভাই! 'বন্দে মাতরম্' শুনলে বাবা আতঙ্কে মূর্ছা যান। তার উপর ছোড়দা'র পুলিশের চাকরি। রক্ষে আছে বাড়ির মধ্যে এ সমস্ত ঢোকালে?

তারপর সহসা চন্দ্রা প্রশ্ন করে, তোমার বাড়ির সবাই কেমন?

খদ্দর পরেন না, দেশোদ্ধার নিয়ে মাথা ঘামান না।

চন্দ্রা ঘাড় নেড়ে বলে, তা নয়—আমি বলছিলাম কি—

একটু ইতস্তত করে বলল, তোমাদের বাড়ি ক'টা দিন রাখা চলে স্যুটকেসটা? এর মধ্যে বোমা-রিভলভার নেই গোলমেলে জিনিষ কিছু নেই, খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি।

যূথী বলে, দেখাবার দরকার নেই। খদ্দর গায়ে রাখতে পারি নে রিভলভারও চালাতে জানি নে। কিন্তু ভয় করি নে কোনটাই। রাখতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু—

মহীনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল: দোকানে আজকেই যেতে হবে না কি?

মহীন বলে, এক্ষুনি। দেরী করবার উপায় নেই।

তা হলে মুশকিল হচ্ছে যে ভাই চন্দ্রা। এটা হাতে নিয়ে কাঁহাতক ঘোরাঘুরি করা চলে?

মহীন বলে, দাও চন্দ্রা। আমার হাতে থাক।

চন্দ্রা ইতস্তত করছে দেখে মহীন বলল, অভ্যাস আছে আমার।

মস্তবড় খদ্দরের গাঁট নিয়ে হামেসাই এ-গ্রাম সে-গ্রাম করতে হয়, এ স্যুটকেস তার তুলনায় পালকের সামিল।

চন্দ্রা বলে, যাবে কোথা তোমরা?

যূথী বলল, মহীন বাবুর স্বরাজ-যন্ত্র তৈরি করাতে। দেশসুদ্ধ লোক বন-বন করে ঘোরাতে থাকলে স্বরাজ আপনি বেরিয়ে আসবে। আর আর জাত পাল্লা দিয়ে নিত্য নূতন অস্ত্র বের করছে, আর এদেশে গোবর চাপা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বড় বড় মস্তিষ্কে।

মহীন হেসে উঠে বলল, সকলের সেরা অস্ত্র বের করেছে এদেশের মস্তিষ্ক।

যূথী বলল, চরখায় সুতো হয়, সুতোর কাপড় হয়, মানুষের ঘর-ব্যবহারে তা লাগে না—দেশের কাজ করা যাদের পেশা তাঁদের লাগে মীটিং আর মিছিলের সময়।

চন্দ্রার দিকে বক্র কটাক্ষ করে বলল, এই অবধি বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু সুতো হয় বলে স্বরাজও হবে, সৈন্য-কামান জাহাজ-এরোপ্লেনে ঘেরা ইংরেজের রাজত্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে—

মহীন বলল, শুধু ইংরেজের রাজ্য বা কেন, এই সব শহরও ভাঙব আপনাদের। ভেঙে টুকরো টুকরো করে গ্রামে ছড়িয়ে দেব। আর আপনার অঙ্গের ঐ দামি পোশাক আর টয়লেট সরিয়ে সরল সুন্দর অবারিত মানুষের রূপ ফুটিয়ে তুলব সেখানে। কিন্তু তর্ক মুলতুবি থাক এখন। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, চলুন।

(৩)

কর এণ্ড কোম্পানির দোকানে একটা মাত্র মিস্ত্রি বসে বসে খাটের পায়ায় শিরিষ-কাগজ ঘসছে। শশিশেখর বেরিয়ে গেছেন।

মহীন বলে, তাই তো! ওঁকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারলে

পাঁচ-সাত দিন পর লোক পাঠিয়ে দিতাম। একটা দিনের জন্ত এসেছি, কালকেই ফিরতে হবে। কাজটা না হলে মুশকিল।

যূথী বলল, একটা কাজ তো হল। দক্ষযজ্ঞ বাধালেন এসে আমাদের অনুষ্ঠানে।

মিস্ত্রিটাকে প্রশ্ন করে জানা গেল, ফিরবেন শশিশেখর নিশ্চয়ই। ফিরে এসে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাবেন। আর সকলে চলে গেছে, সে-ই শুধু অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য।

যূথী বলে, তবে চলুন, ময়দানে গিয়ে বসিগে। ঘণ্টাখানেক পরে আবার আসা যাবে।

অর্থাৎ ঘণ্টাখানেক ধরে নিরিবিলি ঝগড়া চালাবেন, এই মতলব? চলুন তাই। আমরা গ্রামে টানতে চাই সকলকে, আপনারা শহরে। টাগ-অব-ওয়ারে কে জেতে দেখা যাক, কোন দিকে দড়ির জোর।

যূথী বলে, দেখুন, ইংরেজ বললে মানে পাওয়া যেত। দেশের মানুষের মুখে এ সব বেমানান।

মহীন আশ্চর্য হয়ে তার মুখে তাকায়: ইংরেজ বলতে যাবে এখন কথা?

স্বার্থের দিক দিয়ে বলাই তো স্বাভাবিক তাদের পক্ষে। সংগ্রাম ছেড়ে গাঁয়ে বসে সবাই অহিংস বুলি কপচাক্, মানুষগুলো মেয়েমানুষ হয়ে তুলো ধুনুক, পাঁ'জ বানাক, সুতো কাটুক বিশ নম্বর তিরিশ নম্বর চল্লিশ নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে।

চুঙি দিয়ে গ্যাসের আলো ঢেকে দিয়েছে। আধ-অন্ধকারে রহস্যাবৃত রাজপথ। মিলিটারি লরী তীরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

যূথী বলে, হয়েছে বেশ। দিনকে দিন ওরা সৈন্য আর সাজ-সরঞ্জামে দেশ ছেয়ে ফেলছে, আর গাঁয়ে ঢুকে নিঃসাড়ে আপনারা সূত্র-যজ্ঞে বসে যাচ্ছেন।

তার মানে—ওরা দেখছে আজকের দিনটাই, আমরা দেখি আগামী ভবিষ্যৎ।

কয়েকটা গাছ পাশাপাশি, তার নিচে বেঞ্চি পাতা। দু-জনে সেখানে বসল। যূথী বলে, পালানোর এই মনোভাব ছাড়ুন। নির্মল ঘোষের নাম নিয়ে আমায় অপমান করলেন, কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে বেশি অপমান করছেন আপনারা। সভ্যতার চাকা উল্টো দিকে ঘোরাচ্ছেন।

মহীন বলে, কোটি কোটি মানুষকে ধূলো-কাদায় ফেলে রেখে আপনাদের ঐ সভ্যতা শুধুমাত্র কয়েকটিকে নিয়ে আলোর দিকে ছোটে, শহর নামক সঙ্কীর্ণ দ্বীপ গড়ে মুষ্টিমেয়র স্বতন্ত্র সমাজ আর বিশেষ সুবিধা তৈরি করে। খানিকটা পিছিয়ে সকলের মধ্যে এসে সকলকে নিয়ে এগোবার ভাবনা যদি আমরা ভাবি, সেটা কি অপরাধ? আদপে আমি একে পিছিয়ে আসাই বলব না। দু'পা যদি পিছিয়ে থাকি সে কেবল সবেগে এগিয়ে যাব বলেই।

স্তব্ধ হয়ে এক মুহূর্ত সে কি ভাবল। আবার যখন কথা বলল, তখন তার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠেছে। বলে, নির্মলদেরই কাজ ভাল করে করতে যাচ্ছি যূথিকা দেবী। তারা মারা পড়ল একা-একা। একদিন আমার বাবার কথা শুনতে চাচ্ছিলেন—সে-ও নতুন-কিছু নয়, দেশে দেশে যেমন ঘটে আসছে—ওঁদের অসহায় একাকিত্বের মামুলি ইতিহাস। ওঁরা পায়ে-চলার পথ তৈরি করে গেছেন। সবুর করুন—দলবল সুদ্ধ এবারে আসছি আমরা সেই পথে।

যুক্তি বিশেষ কিছু নয়, আশা ও বিশ্বাসের কথা। অনেক তর্ক চালানো যায়, প্রচুর গালি বর্ষণের ফাঁকও আছে। কিন্তু যূথীর উৎসাহ লাগে না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ বৃষ্টি এল ঝুপঝুপ করে। ছুটে এক গাছের গোড়ায় দাঁড়াল। জলের ছাট সেখানেও। আর বাতাসের বেগে ডালাপালা এমন

আন্দোলিত হচ্ছে, আশঙ্কা হয় ওগুলো ভেঙে ঘাড়ের উপর পড়েই বা। কাপড়চোপড় ভিজে জবজবে। বিনুনি খুলে গেছে, জল গড়িয়ে পড়ছে কপাল বেয়ে। রাস্তার ওপারে ছাতে ঢাকা ফুটপাথ—অনেক মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। যূথী দৌড়ল। একটা লরী খুব জোরে আসছে—সেটা কাটিয়ে দ্রুত পার হতে গিয়ে পা পিছলে সে পড়ে গেল। বিষম আঘাত লাগল, হাটু গেল ছড়ে। আর তার চেয়ে বেশি, লজ্জার দায়। বৃষ্টির মধ্যেই মানুষগুলো ছুটে এসেছে। উঠে বসেছে সে কোন গতিকে, কিন্তু খাড়া হবার উপায় নেই। উঃ-আঃ—করে একটু আর্তনাদও করতে পারছে না। চোখে তার জল এসে গেল।

লেগেছে বড্ড ? কেটে গেছে ?

ভেলভেটের উপর জরির কাজ-করা দামি জুতোর এক পাটি পায়ে—কিন্তু কাদায় এমন লেপটে গেছে যে, জুতো বলে চেনা যায় না—কাদা-ই এক-বট পুরু হয়ে আছে যেন পায়ে জড়িয়ে। সেদিকে তাকিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে যূথী অশ্রু রোধ করল।

বিরক্ত স্বরে মহীন বলল, জুতো নয়—আপনার পায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। উঠতে পারছেন না, বড্ড লেগেছে ওখানটায় ?

যূথীর ইচ্ছে করছিল, মহীনকে চলে যেতে বলে। কিন্তু উপায় নেই তার সাহায্য নেওয়া ছাড়া। জনকয়েক লোক তখনো ঘিরে দাঁড়িয়ে। তাদের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মহীন বলল, বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কষ্ট করতে হবে না আপনাদের। ট্যাক্সি-স্টাণ্ডে গিয়ে বরঞ্চ গাড়ি ডেকে দিয়ে যান একটা।

হাত ধরে সযত্নে যূথীকে ট্যাক্সিতে তুলে মহীন বলল, কোন দিকে যেতে হবে, বাড়ি কোথায় আপনাদের ?

যূথী বলে, আমি একলাই যেতে পারব। সঙ্গে যাবার দরকার নেই, আপনার কাজের ক্ষতি হবে।

মহীন বলে, হবে কেন—হচ্ছে। তবে কতক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারব, আপনার বাবার যদি দেখা পেয়ে যাই বাড়িতে।

উঠে এসে যূথীর পাশে বসল। যূথী রাস্তার নাম বলে দিল। বৃষ্টি তখন ধরে গেছে। একটা ভাঙা কল থেকে ঝর-ঝর করে জল পড়ছে, যূথী সেই জায়গায় গাড়ি থামাতে বলল।

মহীন বলে, কোন বাড়ি আপনাদের?

বাড়ি একটা মাত্র—সাদা রঙের, রাস্তার বিপরীত দিকে। সেইটে ছাড়া আর সব বস্তি।

যূথী বলে, ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিন। বাড়ি গিয়ে আপনার টাকা দিয়ে দেব।

একটা গলি আছে বস্তির পাশ দিয়ে—এত সঙ্কীর্ণ যে দু-জনের পাশাপাশি যাওয়া কষ্টকর। যাদের না জানা আছে, গলি বলে বুঝতে পারে না এটাকে, মনে করে বস্তিরই অংশ—বস্তির আনাচ-কানাচ। গোটা দুই গ্যাস-পোস্ট আছে, ব্লাক-আউটের দরুন আলো জ্বালা হয় নি। গলি যে কখনো সাফসাফাই হয়, অবস্থা দেখে মনে হয় না। আবর্জনার স্তূপ—জল জমে আছে মাঝে মাঝে।

চলেছে তো চলেইছে। মহীন বলে, কদ্দূর আর বাড়ির?

যূথী সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐ যে—

কিন্তু ত্রিসীমানায় বাড়ি দেখা যায় না। সাপের মতো এঁকে-বেঁকে গলি চলেছে।

মহীন বলে, সঙ্গে আনতে চাচ্ছিলেন না। এত পথ তা হলে ধরে নিয়ে আসত কে বলুন তো?

আরও অনেকটা এসে একটা টিনের বাড়ি। টিনের বাড়ি ঠিক নয়, পাকা ঘর আছে একটা—অন্য দু-তিন খানারও পাকা দেয়াল পাকা মেঝে, ছাদের বদলে কেবল টিন দেওয়া উপরে। অসমাপ্ত বাড়ি—দেখে বোঝা যায় দীর্ঘকাল ঐ অবস্থায় পড়ে আছে। পাশে আরও ঘর হবে বলে ইট বের করা আছে দেয়ালের পাশে, সে ইটের

রং ছাতা ধরে কালো হয়ে গেছে। ঘরের যে ভিত তৈরি হয়েছিল, সেখানেই উঠানের কাজ চলছে আপাতত। পাশে পাশে ক'টা বেলফুলের চারা বসানো। ভাগ্যিস ঘর না হয়ে ঐ ফাঁকা জায়গাটুকু রয়ে গেছে, নইলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা পড়ত এরা নিশ্চয়। বাড়িটার ঠিক দক্ষিণ গায়ে সুপ্রাচীন এক বাগিচা—আম, জামরুল ও লিচুর বড় বড় ডাল ঝুঁকে এসে নীরন্ধ্র অন্ধকার জমিয়ে তুলেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, টপ-টপ করে তবু অবিরত জল পড়ছে ডালপালা থেকে। ভাপসা দুর্গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মহীনকে বসিয়ে যূথী পিছনের ঘরে গেছে। চাপা-গলায় কথা হচ্ছে মা-মেয়ের ভিতর—মহীন শুনতে পাচ্ছে। চা দেবার ইচ্ছে, কিন্তু চা ফুরিয়ে গেছে- এনে দেবার মানুষ হচ্ছে না। একমাত্র ঝি গেছে যূথীর ছোট বোন রেখার সঙ্গে তাদের ইস্কুলে। সপ্তাহে দু-দিন সন্ধ্যার পর গানের ক্লাস বসে, ঝিকে অপেক্ষা করতে হয় যতক্ষণ রেখার ক্লাস না ভাঙে। যূথী রাগ করছে, নবাবনন্দিনী হয়ে উঠছে যে দিনকে-দিন। চেঁচিয়ে ওঁরা ঘর ফাটাবেন—আর ঝি হতভাগীকে ততক্ষণ আগলে বসে থাকতে হবে। ঐ গানের ঠেলায় তোমার ঝি ঠিক পালিয়ে যাবে, বলে রাখলাম।

মহীন মনে মনে বলে, নবাবনন্দিনী কেন হবে না, তোমারই বোন তো। যূথী এলে বলল, চায়ের জন্য ব্যস্ত হবেন না চা আমি খাই নে। আর এই ধরনের শহুরে আপ্যায়নের উপর মোহও নেই কিছুমাত্র। কাল সকাল আটটায় দোকানে যাব, আপনার বাবাকে সেই সময় থাকতে বলে দেবেন। টাকাটা দিয়ে দিন, চলে যাই এবার। অনেক কাজ বাকি।

টাকা যূথী নিয়েই এসেছে। হেসে বলল, ভেবেছিলাম নিতে চাইবেন না সামান্য এই ক'টি টাকা।

আশ্চর্য ভাবে যূথীর মুখের দিকে চেয়ে মহীন বলে, কেন ?

মনের মধ্যে কেমন একটা ধারণা হয়েছিল।

যূথী টিপে টিপে হাসতে লাগল।

মাথা নেই, মুণ্ড নেই—কেন হয় এমন বেয়াড়া ধারণা? তিন টাকা ট্যাক্সি-ভাড়া আমি দেব, আর পাউডার-রুজ-ক্রীমে আপনার অঙ্গরাগের খরচাই বোধকরি দৈনিক তিন টাকার কম নয়। বাতাসে উড়ে যায়, ধুয়ে ফেলতে হয়—তারই বাবদ তিন টাকা।

একটু থেমে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, এ বাড়ি আসবার আগে আমি তো মনে করতাম কোন্ প্রিন্সেস বুঝি আপনি?

মুখ রাঙা হয়ে গেল যূথীর। বলল, দারিদ্র্যে ব্যঙ্গ করছেন?

না, ব্যঙ্গ যদি করে থাকি, সে আপনাদের এই পালিশ-করা চেহারা আর ইঞ্চি মাপা হাসির ভদ্রতা-বৃত্তিকে।

যূথীর ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে, দেখুন, আমার বাড়ি দূর পাড়াগাঁয়ে। তা-ও নিজের বাড়ি নয়। ভাই-বোন দু-জনে আমরা দাদামশায় দিদিমার অন্নে প্রতিপালিত, তাঁদেরই আশ্রয়ে আছি। সে হিসাবে আপনাদের চেয়েও অবস্থা খারাপ আমার। দারিদ্র্যের জন্য অপরাধ যখন আমাদের কারো নয়, তা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে যাব কেন? সহজ জীবন চাপা দিয়ে গিল্টির উপর এই যে আপনাদের মোহ-মায়া, আক্রোশ তারই বিরুদ্ধে।

যূথী সশব্দে টাকা ফেলে দিল যে বেঞ্চিতে মহীন বসেছে তার উপর। বক্র হাসি ফুটল মহীনের ওষ্ঠ-প্রান্তে। যূথীর দিকে না তাকিয়ে টাকা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

যূথী মনে মনে ভাবছে, মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে এর পর কখনো দেখা হয় মহীনের সঙ্গে। কথাই বলবে না। ছেলেরা যা বলাবলি করত, ঠিকই—মানুষটি যা, অহঙ্কার তার বিশগুণ। পোকামাকড় বলে মনে করে অপরকে।

(৪)

বরানগরে চন্দ্রাদের বাড়ি—বড়রাস্তার ঠিক উপরে নয়। রিটায়ার করবার পর রায় বাহাদুর এই বাড়ি করেছেন। বারো বিঘে জমির উপর বাড়ি। জায়গাটায় যেমন বাড়িটাতেও তেমনি—শহর-পাড়াগাঁয়ের সমন্বয় হয়েছে। গেটে ঢুকে অনেকখানি গিয়ে অট্টালিকা। মস্তবড় বাগান, দুটো বড় বড় পুকুর। পুকুর-ধারে তরকারির ক্ষেত—হেন তরকারি নেই, যা এখানে ফলে না। গোয়ালে পাটনাই ও দেশি গাই-বাছুর দশ-বারোটা। ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে ধানের জমি করেছেন, ধান-বোঝাই নৌকা এসে কুঠিঘাটায় লাগে। সম্বৎসরের খোরাকি ধান গোলায় তুলে রাখা হয়। ঢেঁকিশাল রয়েছে, ধান ভেনে সেই চাল খাওয়া হয় এ বাড়ি—কলের চাল চলে না।

রিটায়ার করবার পরেই সরকারি আহ্বানে এক স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বসতে হয়েছিল রায় বাহাদুরকে। না হলেই ভাল ছিল বোধহয়। আসামিদের শাস্তি দিয়েছিলেন। আইনে হাত-পা বাঁধা—তা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু মনটা কি রকম হয়ে গেল সেই থেকে। হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠা হয়েছে। একালের রীতি-নীতির উপর বিষম অশ্রদ্ধা। ইদানীং শরীর খারাপ হয়ে পড়ছে, তপ-জপ পূজা-আহ্নিকে ততই তিনি মেতে উঠছেন। নিচের তলায় পূর্ব-দিককার শেষ প্রান্তের ঘরটিতে অহরহ এই সব নিয়ে থাকেন। এক মেজবউ বীণা ছাড়া পারতপক্ষে কেউ সেদিকে ঘেঁষে না। ঘরটার সবাই নাম দিয়েছে—তপোবন।

রোজ সন্ধ্যাবেলা তপোবনের সামনে বারান্দায় ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে রায় বাহাদুর চুপচাপ খানিকক্ষণ বসে থাকেন। বড় ভাল লাগে এই সময়টা, তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেন, দীর্ঘ দিনের চাকরির

পর হাত-পা মেলে জিরোচ্ছেন এতদিনে। মেয়ে-বউমাদের ডেকে মাঝে মাঝে বলেন, কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর পরে পায়ে আলতা দিয়ে সন্ধ্যা দেখিয়ে বেড়াও মা-লক্ষ্মীরা। এই গোলা-গোয়াল-দালানকোঠা, ওদিকে কলাবন, কাঁকুড়ক্ষেত, বাঁধা-পুকুর—অনেক ভেবে অনেক দিনের সাধ মিটিয়ে তৈরি করেছি। তোমরা ঘুরঘুর করে বেড়ালে মনে হবে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আমার রচনায়। জীবন ভরে গোলামি করার গ্লানি ঘুচবে খানিকটা। মনে করব, দেশের মানুষের না হোক—নিজের ছেলেপুলেদের জন্য অন্তত আনন্দ-নিকেতন গড়ে তুলেছি একটা।

সেই ট্রাইব্যুন্যালে বিচারে বসবার পর থেকে দেশের মানুষের প্রসঙ্গ একটু-আধটু আসছে রায়বাহাদুরের মুখে। বড়-বউ কেতা-দুরস্ত শহুরে মেয়ে, শ্বশুরকে বিশেষ আমল দেয় না। কিন্তু মেজ-বউমাটি ভালই, অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী—নৃসিংহ যা বলেন, অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, বেশিও করে। একটা কারণ বোধহয়—মেজ ছেলেটা গোমূর্খ, যাত্রা করে বেড়ায় আর মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে নাকি শেষ-রাত্রে। বাণী শ্বশুরকে খুশি রাখতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। শ্বশুর ভাল বলবেন, তাই লক্ষ্মীর ব্রত করছে প্রতি বৃহস্পতিবার। জুতো পায়ে দেয় না—অন্তত শ্বশুরের সামনে তো নয়ই। তার মাঙ্গল্য-আচার ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে, ঘরে ঘরে দীপ দেখায়, গোয়ালে গোলায় দেখায়, তারপর তুলসীতলায় দীপটি রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে শ্বশুরকে এসে প্রণাম করে।

চন্দ্রা ঘরে পা দিতেই বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা। সোল্লাসে সে সম্বর্ধনা করে উঠল, এই যে—ফেরা হল এতক্ষণে!

আস্তে ছোড়দা—

গলা নামিয়ে বঙ্কিম বলতে লাগল, সারাটা দিন কোথায় ছিলে—সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

চন্দ্রার গা কেঁপে ওঠে। রাস্তায় মিছিল নিয়ে যাবার সময় দেখে ফেলেছে নাকি বাড়ির কেউ? বাবা নিশ্চয় নয়—বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় জোর তিনি গঙ্গার ধার অবধি ঘুরতে যান, শহরের পথে তিনি পা বাড়াবেন না। কেউ দেখে এসে বলে দিল কি তাঁকে? বড়বউ পাটনায় বাপের বাড়িতে, বড়দাও তার পিছু পিছু সেখানে গিয়ে উঠেছেন। মেজদা দেখেও থাকেন যদি, বাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নালিশ করবার সাহস তাঁর হবে না। আর ছোড়দা—তাঁর মুখ বন্ধ করা এমন কিছু-কঠিন নয়। কিন্তু কতদূর কি জেনেছে সঠিক না বুঝে আলোচনা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। অতএব মনের ভিতর যে আতঙ্কই থাক, নিতান্ত অবহেলার ভাবে মুখ ঘুরিয়ে চন্দ্রা রোয়াকে গিয়ে উঠল।

বঙ্কিম বলে, উপরে চলে যাও—বড় ঘরে।

চন্দ্রা বলে, দারোগাগিরি বাড়ির মধ্যে ফলাতে এস না ছোড়দা, কেউ তোমায় মানবে না।

স্বচ্ছন্দ সরল হাসি হেসে বঙ্কিম বলে, বাইরেও বড় কেউ মানতে চায় না। কেমন করে যেন চিনে ফেলে।

তারপর বলল, কিন্তু তোমার রক্ষে নেই। ক্লান্ত হয়ে এসেছ, আমি না হয় আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি, সকালবেলা মোকাবিলা হবে। তা বলে বড়-হাকিম শুনবে না, কৈফিয়ৎ দিতে হবে সামনে দাঁড়িয়ে।

ততক্ষণ চন্দ্রা সিঁড়ির পাশে পড়ার ঘরে ঢুকে পড়েছে। আলো জ্বেলে আয়নার সামনে চেহারা দেখছে, সারা দিনের শ্রমের চিহ্ন ফুটে আছে কি না। পাউডার-কেস খুলে পাফটা দ্রুত কয়েক বার বুলাল গ্রীবায়, মুখের উপর। তবু তেমন ভরসা পাচ্ছে না। ডিভানে গড়িয়ে পড়ল। এখন আর সে যাচ্ছে না কারও সামনে। সকালবেলা দেখা যাবে, একটা রাত তো সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ছোড়দাকে খোশামোদ করে জেনে নেবে, কে কি

বলেছে। আগাগোড়া সে সাফ অস্বীকার করবে বাবার কাছে। কিম্বা জুতমতো একটা-কিছু বানিয়ে বলবে, চক্রান্তে পড়ে কেমন ভাবে তাকে যেতে হয়েছিল দলের মধ্যে। ভেবেচিন্তে ভাল গল্প বানানো যাবে, সময় রইল তো সকাল অবধি।

ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আছে, মাথার উপর বিশ মন পাথর চাপিয়েছে কে যেন।

বীণা এসে গা নাড়া দেয়, বেশ তো এখানে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ। ওদিকে একজন সেই বেলা দুপুর থেকে যে হা-পিত্যেশ বসে—

আঃ মেজবউদি—

না ভাই, এটা উচিত হচ্ছে না। ঝগড়াঝাটি হয়েছে নাকি? ওঠ লক্ষ্মীটি। কি ভাবছে বল তো মনে মনে?

চোখ খুলে চন্দ্রা খাড়া হয়ে বসল: কার কথা বলছ? কে এসেছে?

বীণা বলে, খোদ হাকিম সাহেব। ছোট্ট-ঠাকুরপোর কথা তুমি মোটে যে কানে নিলে না—

শিশির এসেছে। আসবার কথা দু-পাঁচ দিনের মধ্যে, এসে গেছে তা হলে। ঘুম জড়িয়ে আছে চন্দ্রার চোখে, হাসির আভা ফুটল তার উপর। আবার সে এলিয়ে পড়ল।

কি হল? যাবে না?

চন্দ্রা বলে, দু-শ মাইল চলে আসতে পেরেছে, আর দশটা সিঁড়ি নেমে আসতে পারবে না? গরজ থাকে তো আসতে বলো মেজ-বউদি, আমায় কেন কষ্ট দেওয়া!

আবার সে চোখ বুঁজল।

চোখবুঁজে আছে, কিছুই যেন দেখছে না। শিশির এসে নিঃশব্দে বসল, সন্তর্পণে তার মুখের উপর থেকে অলকগুচ্ছ সরিয়ে দিল, সরিয়ে দিয়ে হাত দু-খানা নড়ছে না আর সেখান থেকে, দু-চোখের পলকহীন দৃষ্টি পড়ছে এসে মুখের উপর···কিছুই

যেন চন্দ্রা টের পাচ্ছে না। হঠাৎ এক সময় চোখ মেলে সরোষ ভঙ্গিতে বলে, এই—

কিন্তু শিশির সামলে নিয়েছে সেই মুহূর্তে, সরে গিয়ে টেবিলের উপরের একটা বইয়ের পাতা উলটাচ্ছে। একেবারে নিরীহ, নির্দোষ।

চন্দ্রা বলে, ঘুমুচ্ছিলাম আর তুমি অমনি—

শিশির বলে, বদনাম দিচ্ছ, দেখেছ কিছু তুমি?

বাইরে চল। চল, চল আমার সঙ্গে। বাড়িসুদ্ধ সবাইকে দেখিয়ে দিই।

ছাড়বেই না তাকে চন্দ্রা, টানাটানি করছে। বলে, বেড়ালে চুরি করে দই খেতে গেলে যেমন হয়, তেমনি হয়েছে। ঠিক হয়েছে। পাউডার সিঁদুর লেপটে গিয়ে কি বাহার খুলেছে মুখের! ও কি, কুঁজোর জল ঢালাঢালি করছ কেন? কীর্তি তোমার দেখিয়ে আনি ছোড়দা মেজবউদি ওঁদের।

কুঁজোর জল গড়িয়ে শিশির তখন মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে আর রুমাল ঘসছে। ছেলেমানুষের মতো চন্দ্রা সহসা হাততালি দিয়ে উঠল।

মিছামিছি মুখ ধোয়ালাম তোমার। কিচ্ছু ছিল না, একেবারে কিচ্ছু না—

বৃষ্টি নামল ঝুপ-ঝুপ করে। আর বাতাস। কাঁচের শার্সিতে বৃষ্টির ছাট বাজনা বাজাচ্ছে। ঘরের প্রখর আলোটা নিবিয়ে দিল, দালানের আলোর একটা ফালি শুধু এসে পড়েছে। আলো-অন্ধকারে স্বপ্ন আর জাগরণ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

সুসংবাদ নিয়ে এসেছে শিশির—এক মহকুমার সর্বময় কর্তা হয়ে যাচ্ছে। সার্কেল-অফিসার হয়ে ক্রমাগত সাইকেল ঠেলে বেড়ানোর অবসান এত দিনে। যুদ্ধের সময় বলেই সম্ভব হয়েছে এটা। লোকাভাব। নইলে এত বড় প্রোমোশান আদায় করতে চুল

পেকে যায়। সকলের ভাগ্যে জোটেও না শেষ পর্যন্ত। যুদ্ধ সরকারি মানুষদের অভাবিত সৌভাগ্য এনে দিচ্ছে। জনসাধারণের অনেককেও—যারা আখের বুঝে চলতে জানে।

কথার মাঝে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথায় ছিলে বল তো সমস্তটা দিন? দুপুরেও খাও নি শুনলাম।

চন্দ্রা বলে, এত দিনের কলেজ ছেড়ে যেতে হবে। মেয়েরা ছাড়ল না কিছুতে। পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। বিষম হৈ-হল্লা।

পিকনিক কোন জায়গায় হল, সে প্রসঙ্গ চন্দ্রা এড়িয়ে গেল। জেরার মধ্যে যত কম পড়া যায়। শিশিরও আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না। বলে, যাকগে—চুকিয়ে দিয়ে এসেছ তো? কাল আর পরশু দু-জনে মিলে মার্কেটিং করা যাবে। সন্ধ্যাবেলা সিনেমা। তারপর দেশের বাড়ি থেকে ঘুরে আসব দুটো দিন। আসছে মঙ্গলবারে এমনি সময় ট্রেনের-বার্থে গড়াচ্ছি। তার পরদিন রাজ-গদিতে।

হাসি-গল্পের মধ্যে ছাঁৎ করে চন্দ্রার মনে হল, চিরবন্দিত্ব শুরু হল এবার থেকে। কালকের দিনটা মহীন-দা কলকাতায় আছে, আবার কবে আসবে—দেখা পাবার সুযোগই হয়তো আসবে না আর জীবনে। কিন্তু সকাল থেকে মার্কেটিং, সন্ধ্যায় সিনেমা। ভাবছে, মহীনের সঙ্গে আলাপ হত যদি শিশিরের! কাঁধ-ধরাধরি করে চলত যদি দু'টিতে! দু-জন নয়, তিন জন—তার ছোড়দা বঙ্কিম বড় ভালমানুষ—কিন্তু পুলিশের চাকরি নিয়ে ক'দিন লাগবে ঝানু হয়ে উঠতে?

এক ইজিচেয়ারে গুটিসুটি হয়ে দু-জন। মৃদু গুঞ্জনে কথা বলছে, চপল হাসি হেসে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। শিমুলবনে তুলো ওড়ার মতো রঙিন ভাবনা উড়ে বেড়াচ্ছে মনের ভিতর, ভাবনা যেন খেলা করছে—বিলের উপর ঝিরঝিরে হাওয়ায় যেমন তরঙ্গ ওঠে

তেমনি ভাবে।

সহসা দেয়াল-ঘড়িতে নজর পড়ল। চমকে জাগল যেন চন্দ্রা, আবেশ উড়ে গেল কোথায়! শিশিরের বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে ধুপধাপ সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে চলল। শিশির হতভম্ব হয়ে তাকায়।

কি হল? চললে কোথা?

মুখ ফিরিয়ে অনুনয়ের সুরে চন্দ্রা বলল, আসছি—পনের মিনিট ছুটি আমার।

তেতলার ছাতে উঠে চন্দ্রা সিঁড়ির দরজায় তাড়াতাড়ি খিল এঁটে দেয়। অদম্য কৌতূহলে শিশিরও পিছু-পিছু এসেছে। সে দরজা ঝাঁকাচ্ছে। খোল—আমায় ঢুকতে দাও লক্ষ্মীটি—

চন্দ্রা ফিরে এসে দরজা খুলে দিল। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ!

কি ওখানে—চিলেকোঠায়?

চুপ!

দরজা দিল আবার। চিলকোঠারও দরজা-জানলা বন্ধ করল।

রেডিও। চাবি ঘুরিয়ে দিল। আলো জ্বলে উঠল। আওয়াজ আসছে: অল-ইণ্ডিয়া রেডিও—খবর বলছি। ঘোরাও—ঘোরাও চাবি। কুড়-কুড়-কুড়—শুকনো খোলায় চাল-কড়াই ভাজছে যেন। ঘোরাও আরও। অজানা ভাষায় বিচিত্র সুরের গান…হো-হো-হো—উদ্দাম হাসি…একপাক চাবি ঘোরানোর মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর নানান দেশের নরনারীর আলাপ শোন, ছ-ফুট চওড়া চিলেকোঠার মধ্যে বসে।

শিশির বলে, বোঝা যাচ্ছে না কিছু।

চন্দ্রা ধমক দিয়ে ওঠে: আহা—

আর একটু জোর দিয়ে দাও।

একাগ্রভাবে ক্ষণকাল কান পেতে চন্দ্রা বলল, ইংরেজিতে বলছেন—ঠাণ্ডা হয়ে শোন, বুঝতে পারবে।

I Rash Behari Bose, representing the Indians living in East Asia, pay my homage to you.

শিশির সবিস্ময়ে বলে ওঠে, সেই রাসবিহারী ?

চুপ চুপ !

মহাজাতি আপনারা—আপনাদের সংস্কৃতির-গৌরব বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই।

শিশির বলে, আচ্ছা মানুষ তুমি তো ! ফাঁকি দিয়ে একা একা আসছিলে।

চন্দ্রা ডান হাতে শিশিরের মুখ চাপা দিয়ে জোর করে তাকে পাশে এনে বসাল।

পরাধীনতা-মোচনের জন্য আপনাদের দীর্ঘস্থায়ী অসম-যুদ্ধের প্রশংসা এদের জনে জনের মুখে আমি শুনতে পাই। গর্বে আর আনন্দে তখন আমার বুক ভরে যায়। যেদিন হাজার হাজার আমার স্বদেশীয় নরনারীর আত্মত্যাগ ফলপ্রসূ হবে, বৈদেশিক অধীনতা-পাশ মুক্ত হয়ে আপনারা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারবেন, সেদিন আর দূরে নয়, প্রত্যাসন্ন সেই দিন।

তারপর কণ্ঠধ্বনি নিস্তব্ধ হল, ছোট ঘরখানি ঘুরে ঘুরে কথাগুলো তবু ঝঙ্কৃত হচ্ছে—

The day is not far off, when your efforts will be crowned with success, when the sacrifices of thousands of Indian will come to fruition and you will be free from bondage.

আর চন্দ্রা ভাবছে সুদূরবর্তী সেই কথককে—চশমা-পরা দীর্ঘ-দেহ প্রৌঢ় মানুষটি জীবনে কোন দিন তাঁকে চোখে দেখে নি, ক'জনই বা দেখেছে ! চিনত না কেউ তখন তাঁকে—কৃষ্ণকায় দরিদ্র বাঙালি যুবা শৃঙ্খলের অবমাননায় যখন উল্কাপিণ্ডের মতো ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে। বোমা চালান যাচ্ছে বাংলা থেকে লাহোরে, সৈন্যদের লাইন অবধি ধাওয়া করছে কর্মীরা, ভারে ভারে অস্ত্র জোগাড় হচ্ছে, রেল-লাইন উপড়ানো, টেলিফোনের তার

কাটা—সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, লাহোর পিরোজপুর রাওয়ালপিণ্ডি জব্বলপুর ঢাকা আর কাশীতে একই সময়ে অভ্যুত্থান হবে। সিঙ্গাপুর অবধি ছড়িয়ে গেছে সেই বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ, মাইকেল ওডায়ারের বডিগার্ডরা পর্যন্ত দলে ভিড়ছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫—দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে একসঙ্গে সর্বত্র।

কিন্তু আগুন জ্বলল না। কতদিন গেল তারপর, বার্ধক্যের বলিরেখা দেখা দিয়েছে সেদিনের যৌবন-প্রদীপ্ত সেই মুখের উপর। দূর নির্বাসন থেকে উদগ্র কান পেতে তিনি জন্মভূমির প্রতিটি খবরাখবর নিচ্ছেন। সহসা বাদলার বাতাসে ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো ফর-ফর করে উড়ল। তারিখটা দেখল চন্দ্রা—আজ ৯ই মার্চ, ১৯৪২। সাতাশ বছর পরে সাত সমুদ্র পার হয়ে আশাময় আকাশবাণী এসে পৌঁছচ্ছে, দেরি নেই আর সেদিনের।

আরও অনেকক্ষণ পরে সম্মোহিত দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করে: কেমন?

শিশির সেই আগের অভিযোগ জানায়: আচ্ছা মানুষ কিন্তু তুমি।

ভয়ের ভঙ্গি করে চন্দ্রা বলে, ওরে বাবা—বিষম বেআইনি যে এসব। অন্যায় আজকাল সবাই করছে—কিন্তু হাকিম সাক্ষি রেখে মারা যাব না কি? ধরে তুমি শেষকালে যদি জেলে পাঠিয়ে দাও। অসম্ভব নয় কিছু। সহোদর ভাইকে ধরিয়ে দিয়ে তোমাদের সরকারি মানুষ প্রোমোশান আদায় করে।

চন্দ্রা ভাবছে, এই আত্মবিরোধ শেষ হবে আর কত দিনে, জীবনকে সহজ করে নেওয়া চলবে যখন? ছেলের বাপের কাছে, স্ত্রীর স্বামীর কাছে মনোভাব ঢাকাঢাকি করতে হবে না। মুক্তির স্বপ্নে ব্যাকুল সোনার ছেলেমেয়েদের জেলে পুরে অস্বস্তিতে দিন কাটাতে হবে না জবরদস্ত সরকারের। দেশের মানুষ সরকার গড়বে, সরকারি মানুষ হবে দেশের মানুষের গোলাম। নির্মল ঘোষ

মহীনের বাপ অরিজিত রায় এবং অতীত ও বর্তমানের সর্বত্যাগী নরনারীরা আজকের রেডিওয় শোনা ঐ বাণীই যেন লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে মন্দ্রিত করে চলেছেন, নিঃসংশয় প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন : The day is not far off, এগিয়ে এল সেদিন—

(৫)

এগিয়ে আসে সেই দিন। যার জন্য বুকে অগ্নিজ্বালা নিয়ে দেশ-বিদেশে আজও ছুটে বেড়াচ্ছে দেশের দুলালরা। জেল আনন্দধাম হয়েছে তাদের কলহাস্যে, জেলের অন্ধকার দেয়ালেও তাদের প্রত্যাশা বিজলীলেখায় ঝিকমিকিয়ে বেড়ায়। আন্দামানের সমুদ্র-সৈকতে সিন্ধু-বিহগের মতো কত তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি এপারের মাটি খুঁজে ফিরেছে, স্বাধীনতার সঙ্গীত-মূর্ছনায় ফাঁসির-দড়ি কবিত্বময় হয়েছে। বালেশ্বরের প্রান্তে বাঘা যতীনের পিস্তলের আওয়াজ তোমাদের কানে পৌঁছয় নি, সেবারে প্রথম-মহাযুদ্ধের সময়। সুযোগ আবার এল—আমাদের অপার দুঃখের মধ্যে অনন্ত সান্ত্বনার আলোকোজ্জ্বল অবমাননা-বিমুক্ত মুক্তির দিন অকস্মাৎ অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে।

পৃথিবী তোলপাড়। দীর্ঘকাল ধরে কূট-কৌশলে গড়ে-তোলা সাম্রাজ্য গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। লড়াই ভারতের পূর্বদুয়ারে এসে হানা দিল বলে! আর দেরি নেই—। পার্ল বন্দর, ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বজ্রপ্রতিরোধী সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ঝড়ের মুখে খেলাঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। নিরীহ নিরস্ত্র জাতিগুলোর উপর আস্ফালন আর প্রতাপের বহর দেখে ভয়ে ভক্তিতে তাজ্জব হয়ে ছিলাম, ঝড়ের একটুখানি ধাক্কায় উলঙ্গ হয়ে পড়েছে জৌলুষভরা ঐ

সব শক্তি-বিগ্রহের ভিতরকার খড়-মাটি। অতি-সাধারণের স্তরেও এসব খবর পৌঁছে গেছে। বৃটিশের বিপর্যয়ে দেশের মানুষের আনন্দের অন্ত নেই।

হেসে চন্দ্রা বলে, শুনবে একটা গল্প? এই সেদিন আমাদের পাড়ায় ঘটেছিল ব্যাপারটা। এক বেয়াড়া ঘোড়া কেবলি পেছুচ্ছিল—কোচোয়ান চাবুকের পর চাবুক মারছে, ঘোড়া জোড়াপায়ে তবু পেছোয়। বিরক্ত কোচোয়ান ঘোড়াকে গালি পাড়ে: ইংরেজ হয়ে গেলি নাকি রে বেটা? অন্দরে ঢুকে পড়লি যে পেছুতে পেছুতে।

খুট করে একটু শব্দ হল জানলার দিকে। ধড়মড়িয়ে চন্দ্রা সরে গিয়ে ভদ্র-ব্যবধান রেখে শুয়ে পড়ে।

শিশির বলে, কি হল?

মেজবউদি আড়ি পাততে এসেছে হয়তো--

জানলা বন্ধ, চোখে তো দেখতে পাচ্ছেন না। কথাবার্ত্তা শুনে ঠিক ভাববেন, খবরের-কাগজ পড়ছি আমরা রাত্রি জেগে জেগে। বিরক্ত হয়ে এক্ষুনি সরে পড়বেন। এসো—

ছু-হাতে জড়িয়ে শিশির আকর্ষণ করল। আপত্তি করে না চন্দ্রা। বলে, মেজবউদি না হয়ে ইঁদুরও হতে পারে অবিশ্যি।

ফিক করে সে হেসে উঠল: সত্যি, কি হয়ে উঠছি আমরা দিনকে দিন। আর কোন-কিছু নেই যেন জীবনে। মিষ্টি হাসি অর্থহীন প্রলাপ একেবারে ভুলে গেছি।

কিন্তু অকারণ বিলাপও এখন শুনতে রাজি নই।

মুখখানা জোর করে শিশির চেপে ধরল বুকের উপর। পরম আরামে চন্দ্রা এলিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ চুপচাপ। টক-টক দেয়াল-ঘড়ি বেজে চলেছে, তরেই কেবল শব্দ।

খানিক পরে চন্দ্রা অনুভব করল, মুখে কিছু না বলুক--নরম উষ্ণ বিছানায় স্বামীর সস্নেহ বাহুবেষ্টনের মধ্যে ঐ খবর মনের ভিতর আনাগোনা করছে। দূর দুর্গম গোপন অরণ্যে বিদ্যুৎপ্রভ এক

সাধক মহাতপস্যায় নিমগ্ন হয়ে আছেন, কত ভাবনা, কত রকম গবেষণা তাঁকে নিয়ে—এক এক কাগজ এক এক ধরনের কথা রটাচ্ছে। কেউ পাঠাচ্ছে হিমালয়ে, কেউ উড়িয়ে দিচ্ছে উড়োজাহাজে এলগিন রোডের ছাতের উপর থেকে। তাঁর কানে নিশ্চয় সব পৌঁছচ্ছে না —শুনতে পেলে বিষম কৌতুকের ব্যাপার হত তাঁর পক্ষে। কথা না বলে চন্দ্রা আর পেরে ওঠে না।

আচ্ছা, সুভাষচন্দ্র কোথায় ডুব দিলেন তুমি মনে কর ?

হাই তুলে জড়িত কণ্ঠে শিশির বলে, গভর্নমেণ্ট গাপ করে ফেলেছে।

চন্দ্রা চমকে উঠল। কি বলছ তুমি ? সত্যি ?

কোন-কিছুই অসম্ভব নয় এদের পক্ষে। গোপন-জেলে আটক রেখে এখন নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কথা রটাচ্ছে। মেরেও ফেলতে পারে। অত সব পুলিশ-পাহারার মধ্যে এত বড় শহর থেকে কর্পূরের মতো উবে গেলেন, এ কি বিশ্বাস হবার কথা ?

চন্দ্রার চোখে জল এসে যাবার মতো হল।

এই যে শুনতে পাচ্ছি, রাজনীতির ঝগড়ায় বিরক্ত হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন।

শিশির বলে, বিশ্বাস হয় না। ইস্পাতে-গড়া ওসব মানুষ—ভোঁতা হয়ে যাবার মনোবৃত্তি ওঁদের নয়।

নিরন্ধ্র কারাকক্ষে শৃঙ্খলিত হাজার হাজার নরনারীর কথা ভাবছে চন্দ্রা। কত প্রাণ বলি হল আজ অবধি ! পৃথিবীর কোন জাতির চেয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের কম নয়, কারও চেয়ে ত্যাগ-স্বীকার আমরা কম করি নি। ভয়াল যজ্ঞাগ্নিতে কত কুসুম না-জানি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আরও !

আবার এক সময় চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করে : খদ্দরের শাড়ি-পরা মাদাম চিয়াং কাইশেকের ছবি দেখেছ ? যেন বাঙালি ঘরের বউটি। দেখেছ ?

শিশির ঘুমিয়ে পড়েছে। নাড়া দিয়েও সাড়া পাওয়া গেল না। চন্দ্রার কিছুতে ঘুম আসে না।

সকালবেলা ঘর থেকে বেরুচ্ছে, বঙ্কিম তার দিকে চেয়ে টিপি-টিপি হাসে। চন্দ্রা থমকে দাঁড়াল।

বঙ্কিম বলে, ধড়িবাজ বটে! হাকিমের সঙ্গে রফা-নিষ্পত্তি করলি পিকনিকের কথা বলে, নানারকম চাল দিয়ে। ভাল চাস তো আমার সঙ্গেও ভালরকম ফয়শালা করে নে। নইলে রক্ষা থাকবে না।

কি করে জানলে ছোড়দা? বল, বলতে হবে। ঠিক তুমি আড়ি পেতেছিলে।

বঙ্কিম অপ্রতিভ হল না, হাসতে লাগল।

চন্দ্রা বলে, ছোট বোন বলে রেহাই নেই। যত চরবৃত্তি তোমার ঘরের মধ্যে। ছিঃ!

বঙ্কিম বলে, ঘরে বাইরে সব জায়গায়। ছোট বোন বলেও রেহাই দেওয়ার জো নেই? পিকনিক কোথায় হল, কি কি তরকারি হল, কারা রান্নাবান্না করল—সমস্ত খবর সরেজমিনে হাজির থেকে জেনে আসতে হয়েছে।

চন্দ্রা বিচলিত হয়েছে, কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ হতে দিল না। বলল, যাও! মেয়েদের ব্যাপার—তুমি ঢুকবে সেখানে কেমন করে?

বঙ্কিম বলে, বলেছিস ঠিক। দেশসুদ্ধ সবাই তো আজকাল মেয়ে, তবে মহীন রায়টা নয়। দু-দশ জন ঐরকম পুরুষছেলে আছে, সেই ক'টাকে জেলে পুরে সরকার বাহাদুর পুরোপুরি মেয়ে-রাজ্য বানিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা চন্দ্রার। বিস্ময়ের ভান করে বলে, সত্যি নিজে তুমি গিয়েছিলে ছোড়দা? দেখতে পেলাম না তো।

তা হলে বোঝা গেল, কলাকৌশল অনেকখানি রপ্ত হয়েছে। মাঠের উপর বকুলগাছের সামনে একসঙ্গে আধঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, অথচ মায়ের পেটের বোনটা পর্যন্ত ধরতে পারে নি।

গুচ্ছের দাড়ি-টাড়ি পরেছিলে বুঝি?

একেবারে কিছু না।

ঘাড় দুলিয়ে চন্দ্রা বলে, একদম বাজে কথা। কক্ষনো তুমি যাও নি, গেলে নজরে পড়ত। কার মুখে কি শুনে এসে ধাপ্পা দিয়ে এখন কথা বের করবার চেষ্টায় আছ।

আচ্ছা, আর একটা প্রমাণ দিই। একটা মেয়ের হাত ধরে তুই টানাটানি করছিলি—

চন্দ্রা বলে, মেয়েটাকে দেখেছ চেয়ে? কেমন মেয়ে বলো তো?

ভয়ানক বাবু-মেয়ে।

বঙ্কিমের মুখের দিকে হাসিভরা দৃষ্টি স্থাপিত করে চন্দ্রা প্রশ্ন করল: মুখখানার দিকে দেখেছ একবার তাকিয়ে?

ওদের মুখ দেখবার জন্য উপরওয়ালা পাঠায় নি। যাদের দেখতে গিয়েছিলাম, তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম, যে ফুরসতই হয় নি ওর দিকে তাকাবার।

দেখলে আর অন্যদিকে তাকাতে ইচ্ছে করত না ছোড়দা। চাকরির খাতিরেও নয়।

এক মুহূর্ত বঙ্কিমের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে, দেখেছ বই কি। কেউ না দেখে পারে নাকি পটে-আঁকা প্রতিমার মতো অমন মুখ?

বঙ্কিম বলে, সে যাই হোক—প্রমাণ তো হয়ে গেল, তোর কীর্তি নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছি? কি দিয়ে এখন আমার মুখ বন্ধ করবি বল্?

বোনের কাছে ঘুস চাও?

এই সুখেই তো চাকরিতে আছি। সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হোন। তাঁর মহিমায় ধোপাকেও আমরা পয়সা দিই নে। থানায় নিয়ে

যাব—সেই ভয়ে কাপড় কেচে কাঁধে করে বয়ে দিয়ে যায়।

চন্দ্রা বলে, আচ্ছা—খুব ভাল একটা তরকারি রান্না করে আজ তোমায় খাওয়াব।

সেই যেমন চালকুমড়োর কারি রেঁধেছিলি পলতা দিয়ে? অন্নপ্রাশনের অন্ন অবধি উঠে আসবার যোগাড়।

তবে একটা সোয়েটার বুনে পাঠিয়ে দেব আসছে শীতকালে। হাকিম-ঘরণী হয়ে যাচ্ছি, কাজকর্ম থাকবে না তো কিছু। শুধু ঘরের শোভা হয়ে থাকা।

বঙ্কিম ঘাড় নাড়েঃ উঁহু—আর ও-কর্মে যাস নে। তোর সোয়েটার মাথা দিয়ে গলবে না, নির্ঘাৎ জানি। সেবারে যেমন মোজা বুনে দিয়েছিলি।

তার মানে, আমি সব কাজে আনাড়ি—এই তো?

একটা কাজ শুধু পারিস—অতি চমৎকার পারিস। ময়লা খদ্দরের শাড়ি পরে ভলন্টিয়ারি করা। নিরীহ মেয়েগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে এনে সভার ভিড় বাড়ানো।

চন্দ্রা হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে। বুঝেছি ছোড়দা। টেনে-হিঁচড়ে এ বাড়িতেও নিয়ে আসব একটা মেয়ে। যাবার আগেই এনে দেখাব। তাহলে মুখবন্ধ—কেমন?

(৬)

সেদিন বেরুনো হল না, শিশিরের শরীরটা খারাপ লাগছিল, সারাদিন শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিল। বেরুল পরের দিন বিকালবেলা। বৃহৎ এক যজ্ঞের ব্যাপার যেন। মার্কেট ঘুরে ঘুরে রকমারি জিনিসপত্র কিনেই চলেছে। টিন আর প্যাকেটে স্তূপাকার হয়ে উঠল—মোটরের খোলে পা রাখবার যায়গা নেই। এতেও নাকি শেষ হল না—কাল দুপুরের ট্রেনে শিশির দেশে যাচ্ছে, সকালে ফর্দ নিয়ে আর একবার বেরুবে দু-জনে।

চন্দ্রা বলে, সম্বৎসরের জিনিষ কিনে নিচ্ছ—যেখানে যাচ্ছি, মরুভূমির দেশ নাকি সেটা?

শিশির বলে, রিপোর্ট যা পাচ্ছি—সেই রকমই। যদ্দূর পারা যায় গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। ছেলেবেলা ভূগোলে হয়তো মহকুমার নামটা পড়ে থাকব, তারপর আর কখনো কোন সূত্রে কানে শুনেছি, মনে পড়ে না।

আমি শুনেছি, খবরের-কাগজে পড়েছি।

খবরের-কাগজে ঐ জায়গার নাম?

গঙ্গেশ বাবুর বাড়ি যে ওখানে।

শিশির সবিস্ময়ে বলে, গঙ্গেশটি কে হলেন আবার?

খুব বড়লোক—গেলে জানতে পারবে। যা ভাবছ, ততদূর খারাপ জায়গা নয় —এই আমি বলে দিলাম।

ফিরতি মুখে তারা শশিশেখরের বাড়ি গেল। ঠিকানা জানা ছিল, গাড়ি দাঁড় করিয়ে খুঁজে খুঁজে গলির মধ্যে ঢোকে। টর্চ ধরে দু-জনে এগোচ্ছে। জল জমে আছে, জুতোসুদ্ধ শিশিরের পা পড়ে জল ছিটকে উঠল।

চন্দ্রা আহা-হা করে ওঠে। দামি স্যুটটা যাচ্ছে-তাই হয়ে গেল, হায় রে!

শিশির কিন্তু হাসছে: ধুলে ঠিক হয়ে যাবে। বেশ লাগছে—এই জলকাদা পুরানো সেকেলেবাগান দৈত্যের মতো কালো কালো গাছ—

টর্চ নিভিয়ে দিয়ে শিশির কাঁধে ভর দিয়ে পড়ল চন্দ্রার।

চন্দ্রা তর্জন করে, সরো—কেউ এসে পড়বে এদিকে।

শিশির বলে, আজব লাগছে, না? এমন নির্জন পথ অন্ধকার ছায়াচ্ছন্নতা, কে জানত বলো, কলকাতার শহরের ভিতরে রয়েছে?

ভয় ধরেছে মনে। বুঝতে পেরেছি।

শিশির তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে বলল, উঁহু—ভূত চেপেছে কাঁধে।

প্রসাধন-মার্জিত সুঢোল দেহখানি চন্দ্রার—সেন্টের তীব্র সুবাসে স্যাঁৎসেতে গলিটা অবধি রোমাঞ্চিত হচ্ছে। দু-জোড়া জুতোর খুট-খুট আওয়াজ। হঠাৎ শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, তুমি এইরকম পাশে থাকলে চন্দ্রা, কোন কিছুতে আমি ভয় পাব না। কখনো—কোন অবস্থায় তুমি কাছছাড়া হয়ো না আমার।

যূথী বিষম আশ্চর্য হল।

চিনে এসেছ তো! কিন্তু এই রাত্রে? সেইটের জন্য বুঝি —জরুরি মিটিং আছে কোথাও?

চন্দ্রা চোখ টিপছে। বাইরে চেয়ে রোয়াকের আধ-অন্ধকারে যূথী শিশিরকে দেখতে পেল। কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করে: আসুন—আসুন। চন্দ্রার কাণ্ড, ওখানে দাঁড় করিয়ে এসেছে। আপনাকে আগে দেখি নি—কিন্তু ক্লাসের ভিতর চন্দ্রা আমাদের একবর্ণ লেকচার শুনতে দেয় না, আপনার গল্প করে।

শিশির হাসিমুখে চন্দ্রার দিকে তাকাল। বলে, অথচ এই

চন্দ্রাই চিঠি লিখেছিল, দরকারি ক্লাস নষ্ট হবে, কিছুতেই এখন আমার সঙ্গে যেতে পারবে না। বলুন তো, মানুষটাকে পাওয়ার চেয়ে মানুষের গল্প বলতে পাওয়াটা কি বেশি আনন্দের ?

চন্দ্রা বলে, এত কাছে তোমাদের বাড়ি ভাবতে পারি নি। কতবার তাহলে আসা-যাওয়া করতাম।

যূথীর হাত ধরে সে ভিতর দিকে চলল। শশিশেখর যথারীতি বাড়ি নেই। ইন্দুমতীকে মা বলে সে প্রণাম করল। রেখার ঘরে গিয়ে দেয়াল থেকে এসরাজ নামিয়ে তাকে বাজাতে বলল একটা গৎ। হেরিকেন হাতে ঘুরে ঘুরে চন্দ্রা চারিদিক দেখছে।

চমৎকার বাড়িটি ভাই তোমাদের।

যূথী বলে, ঠাট্টা ? দিনমানের সূর্যের আলো আসে না, দেখাদেখি ইলেট্রিক করপোরেশনও আলো দিতে রাজি হল না, রাত্রিবেলা।

চন্দ্রা বলে, সদর-রাস্তা থেকে দূরে। আমাদের কাজের পক্ষে ভারি চমৎকার, সেই কথা বলছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে চাপাগলায় বলল, তোমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে— বড় কাজ করবার ক্ষমতা আছে তোমার। একটা কথা বলি যূথী ভাই, ছাত্রী-সমিতির মধ্যে এসো তুমি। সমিতি বাইরে থেকে যত নিরীহ মনে হয়, আসলে তা নয়।

যূথী বলে, তা দেখেছি। ভয়ানক বিক্রম তোমাদের। গোটা কলকাতা শহর সেদিন চেঁচিয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছিলে।

চেঁচাচ্ছে বটে এখন। কাজের সময় কাজ করবে, কথাটি বলবে না। সময় এলে দেখতে পাবে। ঐ বাগানটা দেখে মনে হচ্ছে, ওটা অনেক কাজে লাগানো যেতে পারে।

প্রেম-চর্চার তোফা জায়গা। ভালমানুষকেও প্রেম পেয়ে বসে ঐ নিরিবিলি পোড়ো-জায়গায় এসে বসলে।

মৃদু হাসি ফুটল যূথীর মুখে। বিভাসরঞ্জনের কথা ভাবছে। নাম-করা এডভোকেট, মাঝারি গোছের নেতা। অনেক বাড়ির

মালিক—শশিশেখরের দোকানঘরটারও মালিক সে। রাসবাগান এই বাগানটার নাম—বিভাসরঞ্জন কিনবে বলে কথাবার্তা হচ্ছে। মাপজোপ হচ্ছিল সেদিন, নিজে সে এসেছিল। যূথীরা তার নাম শুনেছে, সেই প্রথম তাকে দেখল। যতক্ষণ এখানে ছিল, ক্ষুধার্তের মতো তাকিয়েছিল সে শশিশেখরের বাড়ির দিকে। যূথীর করুণা হল—প্লেটে করে দশ-বারো কোষ কাঁঠাল পাঠিয়ে দিল রেখার হাতে দিয়ে। বিভাসরঞ্জন কৃতার্থ হয়ে সবগুলি খেল।

মধ্যে এক সময় যূথী জিজ্ঞাসা করল: সত্যি কথা বল চন্দ্রা, কি মনে করে এসেছ এই রাত্রে? স্যুটকেস নিয়ে যাবে?

ম্লান দৃষ্টি তুলে চন্দ্রা বলে, কোনদিন আর আমার ওসব লাগবে না। মহাকুমা-হাকিমের বউ—মফস্বল শহরে বড় জোর মেয়েদের এ. বি. সি. আর সতরঞ্চি-বোনা শিখিয়ে দেশের কাজ করতে পারিব, তার বেশি এখতিয়ার নেই। তোমায় নেমন্তন্ন করতে এসেছি যূথী ভাই—

কি ব্যাপার?

চলে যাচ্ছি। শুনেছি, সন্ন্যাস নেবার আগে নিজের শ্রাদ্ধ নিজেকে চুকিয়ে যেতে হয়। এ-ও তেমনি আমার এ জন্মের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে যাওয়া। কালকে অনেক হাঙ্গামা আছে, কাল আর নয়—পরশু দুপুরবেলা—নিশ্চয় যেও ভাই। যাবার আগে মন খুলে একটা দিন হেসে যাব তোমার সঙ্গে।

এমন করে বলছে—যূথীর কষ্ট হয়। কিন্তু রাগ হওয়াই উচিত। এত পেয়েছে—এমন ঘর-বর, এত সম্মান-প্রতিষ্ঠা, স্বামীর এত অজস্র ভালবাসা—কিছুতে ও-মেয়ের মন ভরে না!

গলির মোড় অবধি যূথী এগিয়ে দিয়ে গেল। গাড়িতে উঠে চন্দ্রা প্রশ্ন করে: কেমন দেখলে আমার বন্ধুকে?

শিশির বলে, তোমার চেয়ে ভাল নয়।

খোশামোদ হচ্ছে? চেহারায় ওর পায়ের নখের যোগ্য

নই আমি।

গাড়ি বড়রাস্তায় পড়ে হু-হু করে ছুটছে। শিশির বলল আশ্চর্য তো!

চন্দ্রা বলে, আশ্চর্য সত্যিই। যেমন মুখশ্রী, তেমনি গায়ের রং—

তার চেয়ে আশ্চর্য, তোমার মুখের কথা। একটা মেয়ে সমবয়সি মেয়ের চেহারার সুখ্যাতি করছে, এই আমি প্রথম শুনলাম। পুরুষ আমরা, অন্যের বেশি বুদ্ধি স্বীকার করতে চাই নে, আর তোমরা স্বীকার করতে চাও না অন্য মেয়ের রূপ।

ছোড়দার বিয়ে দেব ওর সঙ্গে। চমৎকার হবে, না? মনে মনেও মিলবে ওদের। চেহারা এমন চমৎকার, কিন্তু বন্ধু হলেও বলছি—ভিতরে জৌলুষ নেই। বড় জিনিষে মন নেই, মনের গভীরতা নেই। সেজে-গুজে রূপ দেখিয়ে বেড়াবার কেবল ঝোঁক। বড় আদর্শের দিকে আকর্ষণ করা যায় না ওকে। ছোড়দাও এমনি লোক ভাল, কিন্তু চাকরির উন্নতি আর ভাল খাওয়া ভাল পরা ছাড়া অন্য কোন সাধ-বাসনা নেই তার মনে।

এইদিক দিয়ে চন্দ্রা যূথীকে অনেক ছোট মনে করে তার চেয়ে, হীন চোখে দেখে। ধরো, এই শিশিরের সঙ্গে বিয়ে হলে যূথী কৃতকৃতার্থ হয়ে যেত, আর সে—মনের তলা অনুসন্ধান করে স্বীকার করতে হবে বই কি!—একতিল সে সোয়াস্তি পাচ্ছে না।

(৭)

আধ-পাগলা পরেশ ডাক্তার। বরানগরে বারো-চোদ্দ বছর আছেন। রোগির ভিড়ে সকাল-বিকাল ডাক্তারের নিশ্বাস ফেলবার উপায় থাকে না। বয়স হয়ে গেছে, আর কেন, এইবার রিটায়ার করি—ইদানীং প্রায়ই বলছেন এই ধরনের কথা।

রোগিরা শুনে কলরব করে ওঠে : ও সব চলবে না ডাক্তার-দা। মরে ভূত হয়ে যাব আমরা তা হলে।

পরেশ হেসে ওঠেন : তা বটে! জ্যান্ত অবস্থায় ভূত হয়ে রয়েছ, মরবার ধকলটা আর কেন নিতে যাবে?

বললেন, `কিন্তু আমি যে পেরে উঠছি নে ভায়ারা। আর যে ক'টা দিন আছি, দেশে গিয়ে চুপচাপ শান্তিতে কাটিয়ে দেব ভাবছি।

এইসব কথাবার্তা যখন চলে, চাকর নিশম্ভু আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ বাঁকায়। ডাক্তারের সঙ্গে অনেকবার তাঁর দেশে গিয়ে শান্তির অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এসেছে। আপন মনে সে বলে, হুঁ—ডাক্তারি বিদ্যে ছাগলের কানে যেদিন দিতে পারবে, শান্তি সেইদিন। নইলে যমের-বাড়ি গেলেও কেউ তোমায় রেহাই দেবে না।

প্রবাদ আছে, মন্ত্রের মাহাত্ম্য নষ্ট করতে হলে একটা ছাগল ধরে তার কানে কানে সেই মন্ত্র আবৃত্তি করতে হয়। তার পর মন্ত্রে আর কোন কাজ হয় না। নিশম্ভু মনে-প্রাণে কামনা করে, পরেশ ডাক্তারি বিদ্যাটা যে কোন উপায়ে মস্তিষ্ক থেকে নামিয়ে নিরুপদ্রব হয়ে থাকুন। বিয়ে থাওয়া করেন নি, দায়ঝক্কি নেই—কেন তবে এত খাটুনি? দেশে যাবার টান হয়েছে কেন, তা-ও নিশম্ভু জানে। গেল-বছর পুজোর সময় নীলগঞ্জে পৈতৃক দালানে হাসপাতাল করে দিয়ে এসেছেন। বাইরের লোক দিয়ে সুবিধা হচ্ছে না বোধহয়। এখানে তবু ভিজিট বলে যা-হোক কিছু আসে, দেশে ও-পাট নেই। পরেশ ডাক্তারকে পয়সা দিতে হবে ও-অঞ্চলের মানুষ ভাবতেই পারে না। পরেশও প্রত্যাশা করেন না কখনো।

এখানে ভিজিট নিতে হয়। যে যা দেয়, তাই নেন। এর জন্যও পরেশের লজ্জার সীমা নেই। বন্ধুমহলে কৈফিয়ৎ দেন : কি করব, ভিজিট না নিলে পশার থাকবে না যে—হাতুড়ে গোবদ্যি বলে নাম রটে যাবে, রোগিরা মুখ সিঁটকাবে, ওষুধ ঢেলে দেবে নর্দামায়। ভিজিট না নিয়ে উপায় কি বল ভাই?

দশ মিনিটের আলাপই যথেষ্ট পরেশ ডাক্তারের বন্ধু হবার পক্ষে। বয়সের বাছ-বিচার নেই। একটা ইস্কুলের ছেলে হয়তো বসে আছে ওষুধ নেবার জন্যে—তামাক খেয়ে হুঁকোর মুখটা মুছে সসম্ভ্রমে পরেশ তার দিকে এগিয়ে দেবেন : খাও। ছেলেটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, তিনি প্রবোধ দিয়ে বলেন, খাও—তাতে কি ভাই? ভাত খেতে দোষ নেই, মিষ্টি-মিঠাই খেতে দোষ নেই, যত দোষ তামাকের বেলা? খাও।

রোগিরা খুশি। বলে, পাগল হোক যা-ই হোক—ডাক্তারের ওষুধ কিন্তু ডেকে কথা বলে। একটা দোষ—স্পষ্টবাদী। বিশেষ যে ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগি অত্যন্ত গরিব। ডাক্তারের রায় না পাওয়া পর্যন্ত রোগি এসে ভয়ে কাঁপতে থাকে! কি জানি—হয়তো বলে উঠবেন, বাড়ি চলে যা। বিলাতি ওষুধওয়ালাদের পকেট ভারী না করে সেই পয়সায় ভালমন্দ কিনে খা গিয়ে, মহাপ্রাণী তৃপ্তি পাবে। বসে থাকিস নে দাদা, ঘরে যা। দু-এক টাকা ঐ সঙ্গে হাতে গুঁজে দেন কখনো কখনো। প্রাঞ্জল ভাষায় এর মানে দাঁড়াচ্ছে, তোমার বাপু কোন আশা নেই, চিকিৎসার ভার আমি নেব না, যে-ই নিক সুবিধা হবে না। তার চেয়ে আশ মিটিয়ে ভালমন্দ খেয়ে নাও যে ক'টা দিন বেঁচে আছ।

লম্বা টিনের বাড়ির রাস্তার দিকে খোলা ছোট এক খোপ, আর তার পিছনে এক প্রাইভেট কামরা—এই হল পরেশ ডাক্তারের ডিস্পেনসারি। পিছনে ভাঙা আলমারি সামনে নড়বড়ে টেবিল—তিনি মাঝখানে বসে সারাদিন রোগি দেখেন। সন্ধ্যার পর জাঁকালো তাসের আড্ডা বসে ডিস্পেনসারিতে। পরেশ খেলেন না। এমন কি তাসের রংই চিনলেন না তিনি এতদিনে। ডাক্তারের বসুধৈব কুটুম্বকম্—পাড়ার ভাল ভাল ঘরের ছেলেরা আসে এই আড্ডায়। নিতান্ত জরুরি ডাক না থাকলে ডাক্তার বেরুন না এ সময়; সবাই খেলা করে, তিনি তখন খবরের কাগজ পড়েন আর

পা দোলান। সারাদিন এর তার হাতে কাগজ ঘোরে, তাঁর পড়বার সময় সন্ধ্যার পর এই সময়টা। মাঝে মাঝে খেলা নিয়ে তুমুল বিতর্ক ওঠে, পরেশ নিঃশব্দে আলমারি থেকে সিগারেট বের করে দিয়ে আসেন সকলের হাতে হাতে। নিজে সিগারেট খান না, ডাবা-হুঁকোয় তাওয়াদার বালাখানা চলে। এই ছেলেছোকরাদের জন্যই সিগারেটের টিন এনে রেখে দেন।

বর্ষার দিনে মানুষজন এক একদিন ঘর থেকে বেরোয় না, পরেশ ছাতা নিয়ে বেরোন সেই সময়। বাড়ি বাড়ি সকলকে ডেকে বেড়ান। নিশম্ভুকে ডেকে বলেন, ইলিশ মাছ কিনে আন দৌড়ে গঙ্গার ঘাট থেকে, খিচুড়ি চাপা। জল মাথায় করে এত কষ্ট করে এঁরা সবাই এসেছেন, না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

আজও যথারীতি আড্ডা বসেছে, কিন্তু পরেশ নৃসিংহ হালদারের তপোবনে আটকে আছেন। তিন তিন বার ডাকতে লোক গিয়েছিল, না এসে উপায় ছিল না। বিরক্তমুখে সমস্ত পথ গজর-গজর করতে করতে এসেছেন, কিন্তু রায় বাহাদুরের সামনে এখন অন্য মূর্তি—পরম কৃতার্থ হয়ে তাঁর মুখে আধ্যাত্মিক কথা শুনছেন। সপ্তাহে দুটো-তিনটে দিন ডাক্তারকে এসে রোগের ব্যবস্থা ও রোগির অধ্যাত্ম আলোচনায় সায় দিয়ে যেতে হয়। পরেশের তদগত ভাব দেখে রায়বাহাদুর বড় খুশি—পরেশ ছাড়া অন্য ডাক্তার তাঁর পছন্দ নয়।

রাত্রিবেলা বড্ড কষ্ট দিলাম তোমায় ডাক্তার। শোন, পুকুরপাড়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম—রোজই বেড়াই—হঠাৎ শরীরটা কেমন অবসন্ন হয়ে এল। আহ্নিকটা পর্যন্ত হয় নি—অথচ এই দেখ, শুয়ে পড়তে হয়েছে। ভয় পাওয়া উচিত নয় অবিশ্যি—বয়স হয়েছে, সরে যাওয়াই এখন আমাদের পক্ষে মঙ্গল, কিন্তু—

পরেশ হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। প্রতিবাদ হবে বলেই রায় বাহাদুর এই সমস্ত বলেন, প্রতিবাদ না হলে চটে যেতেন নিশ্চয়। পরেশ

বললেন, সে কি কথা। সরে যাবার এখন কি হয়েছে? আপনারা মুরুব্বি মানুষ, মাথার উপর আছেন, কত বড় বলভরসা। এই যে যখন-তখন এসে চেপে বসে থাকি, দুটো-চারটে ভাল কথা জ্ঞানের কথা শুনতে পাব বলেই তো? নইলে আমার কুঁড়েঘরেও আপনার আশীর্বাদে ভদ্রলোকের পায়ের ধূলো নিতান্ত কম পড়ে না। কিন্তু যে সমস্ত জোলো আলোচনা চলে সেখানে—ছ্যা—ছ্যা—

রায় বাহাদুর প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, যা-ই বলো ডাক্তার, আমরা এখন ব্যাক-নাম্বার। তুমি আসা-যাওয়া কর, তোমায় দেখতে পাই, আর তো কেউ এদিককার ছায়া মাড়ায় না। ছেলে-মেয়েদের ডাক দিলে ঘরে থেকেও পারতপক্ষে সাড়া দেয় না। যা আমি বললাম—যত শীঘ্র হোক, বিদায় নেওয়া উচিত। তবে ভোগান্তি না হয়, এইজন্য তোমায় ডাকাডাকি করি। গিন্নি আগে-ভাগে সরে পড়ে মজা দেখছেন। বেশি দিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে শেষ সময়ে আমার দুঃখের পার থাকবে না।

পরেশ বললেন, সোনার সংসার আপনার—দুঃখ পাবেন কেন? আপনার বঙ্কিম হামেশাই ডাক্তার-দা ডাক্তার-দা করে আমার ওখানে যায়। তাকে জানি, খুব ভাল ছেলে। মেয়েটি ভাল। বউমা'রাও লক্ষ্মী।

স্তুতিবাদ করতে করতে ডাক্তার রায় বাহাদুরের নাড়ি দেখছেন, বুক-পিঠ পরীক্ষা করছেন। দেখেশুনে হাসিমুখে রায় দিলেন, কিছু নয়—সামান্য একটু দুর্বলতা। ভাল খাওয়া-দাওয়া করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রায় বাহাদুর খাড়া হয়ে বসলেন।

এই তোমার ব্যবস্থা? অষুধপত্তোর?

অষুধের চেয়ে পথ্যের দরকার বেশি।

বেশ, ডেকে দিচ্ছি—তুমি বলো ওদের। ওরে চন্দ্রা, ও মেজবউমা—

সাড়া না পেয়ে, রায় বাহাদুর রোয়াকে বেরিয়ে এসে ডাকতে

লাগলেন। বীণা তখন নেমে এসে দাঁড়াল।

চন্দ্রা ঠাকুর-জামায়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। ফেরে নি এখনো।

নৃসিংহ বললেন, তার দরকার নেই, তাকে কি হবে? সে তো পা বাড়িয়ে আছে চলে যাবার জন্যে। কি বলছিলে ডাক্তার, তুমি আমার মেজবউমাকে বুঝিয়ে বল। ছেলেবয়সে মা মারা গিয়েছিলেন, এই মা-টি এখন বুড়ো-ছেলের ষোলআনা অভিভাবক হয়ে বসেছেন।

তারপর নিজেই আবার বলতে লাগলেন—পরেশ ডাক্তার কি বলতে কি বলে বসবেন, তাঁর উপর আস্থা করতে পারেন না। বললেন, ডাক্তারের যা ফরমাশ রাজরাজড়ার ঘরেই কেবল হতে পারে, গৃহস্থ-সংসারে এত ঝক্কি কে কুলোবে বলো দিকি মা? তাই বলছিলাম, এসব ছেড়ে দাও ডাক্তার, বুড়ো হাড় ক'খানা জিইয়ে রাখবার জন্য এত হাঙ্গামায় গরজটা কি! শেষটা ডাক্তার বলল, ওঁদের ডেকে দিন—যা বলবার, ওঁদের কাছে বলে যাব। তাই ডাকছিলাম। শুয়ে পড়েছিলে বুঝি মা?

বীণা বলে, স্টোভে করে আপনার লুচি ভাজছিলাম বাবা। স্টোভের আওয়াজে কিছু কানে যায় না। গাওয়া ঘিয়ের অমন খাঁটি জিনিষ—ঠাকুরের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস হয় না। যা-তা লুচি ভেজে নিজেরা পাতে খাবার জন্য বাটি ভরতি করে ঘি রেখে দেয়।

রায় বাহাদুর পুলকিত দৃষ্টিতে পরেশের দিকে চেয়ে বললেন, দেখ, মা-জননীর নজর কতদিকে, বুঝে দেখ একবার। একটু আগে বলছিলাম না তোমার সঙ্গে? মিলিয়ে দেখে নাও।

বীণা বলে, কি করতে হবে বলে দিন ডাক্তারবাবু। কোনো ব্যবস্থা এতদিনের মধ্যে কখনো আটকায় নি, এখনও আটকে থাকবে না।

নৃসিংহ ঘাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেন: খাঁটি কথা ডাক্তার। তোমরা যখন যা বল, মা যেন জাদুমন্ত্রে জোগাড় করে ফেলেন। কিন্তু

এবারের ফরমাশ তো সমস্ত ছাপিয়ে যাচ্ছে! বলকারক ভাল ভাল পথ্য চাই— রুইমাছের মুড়ো, ক্ষীর, সন্দেশ, কচিপাঁঠার মাংস। এই লড়াইয়ের বাজারে, বারো মাস তিরিশ দিন অত সমস্ত জোগাড় করা কি সোজা কথা?

বীণা বলল, একটা ফর্দ করে দিয়ে যান ডাক্তারবাবু। দুই পুকুর ভরতি মাছ, বাড়িতে এতগুলো গরু—কোন রকম অসুবিধে হবে না। রোগির সেবা সকলের আগে। তার জন্যে রাবণের গোষ্ঠির ভোগে কিছু যদি কমতি পড়ে, আমি নাচার— তা-ই মেনে নিতে হবে বাড়ির সকলকে। যাই আমি, ঘিয়ের কড়া নামিয়ে রেখে এসেছি।

একগাল হেসে নৃসিংহ বললেন, তাই-ই, ও-বেটি মুখে যা বললে ঠিক তাই করবে। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, ফর্দ করে নির্ভাবনায় তুমি চলে যাও ডাক্তার। অন্নপূর্ণা মা-জননী আগলে রয়েছেন, অভাব হবার জো আছে!

বীণার গমন-পথের দিকে চেয়ে পরেশ বললেন, যা বলেছেন রায় বাহাদুর, সত্যি ভাল মেয়ে। ভক্তিমতী মেয়ে।

হুঁ—

পদশব্দ সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে ক্রমশ মিলিয়ে গেল। মৃদু হেসে নৃসিংহ বললেন, ভক্তি আগে ছিল না, বছর দুই দেখা দিয়েছে। বড্ড বাড়াবড়ি রকমের হয়ে দাঁড়াচ্ছে আজকাল।

পরেশ সবিস্ময়ে চেয়ে আছেন দেখে রায় বাহাদুর বলতে লাগলেন, তুমি আমার হাঁড়ির খবর রাখ ডাক্তার, তোমার কাছে গোপন কি—আগে ইনিও আঁচল উড়িয়ে বেড়াতেন বড়বউমার মতো। প্রফুল্ল বিগড়ে গেল, ভহবিল তছরুপের দায়ে চাকরিটা খোয়াল, ঠাকরুন সেই থেকে কেঁচোটি হয়ে আছেন। ছেলেটা আবার যদি শুধরে ওঠে, উনিও সঙ্গে সঙ্গে আসল মূর্তি ধরবেন, এই তোমায় বলে দিলাম। আর ঐ যত কিছু শুনলে সমস্ত মুখে মুখে। দুই পুকুরে জাল নামিয়ে কাল থেকে রুইয়ের পোনা উঠবে তিন-চারটে

করে। ছোটখাট একটা মুড়ো পাত পর্যন্ত পৌঁছতেও পারে, কিম্বা হয়তো শুনতে পাব মাছ-মুড়ো সমস্ত বিড়ালে খেয়ে গেছে। বুঝলে ডাক্তার, ভিতরে বস্তু তা থাকলে যত্নআত্তি আসে না। এদের চালচলন আলাদা। একালের মেয়ে—মুখে রং মেখে বেড়ায় ফাঁপা ভিতরটা যাতে কারও নজার না পড়ে।

একটু স্তব্ধ থেকে নৃসিংহ গভীর কণ্ঠে বলতে লাগালন, চিরদিনের খাইয়ে-লোক আমি। গিন্নি যতদিন বেঁচে ছিলেন, সামনে বসে বাতাস করে ছেলে-ভুলানোর মতো এ-গল্প সে-গল্প করে করে এই অভ্যেসই করিয়েছিলেন। তিনি চলে যাবার পর পেট ভরে খেয়েছি হয়তো, কিন্তু খেয়ে তখনকার মতো আরামের ঢেকুর তুলি নি কোন দিন। প্রাণের দায়ে নয়—পেটের দায়ে কত ওদের খোশামোদ করি, চোখেব উপরই দেখলে তো বাপু।

শিশির ও চন্দ্রা ফিরল এতক্ষণে। সমস্ত পথ নানা মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে এসেছে। বাপের ঘরে আলো জ্বলছে, পরেশ-ডাক্তারের সঙ্গে গল্পগুজব হচ্ছে দেখে মৃদু পায়ে চন্দ্রা ঢুকল। চন্দ্রাকে উদ্যোগ করে কথা পাড়তে হল না, ভাগ্যক্রমে সেই প্রসঙ্গই চলেছে এখন এঁদের মধ্যে।

নৃসিংহ বলছিলেন, বঙ্কিমের বিয়ের চেষ্টায় আছি ডাক্তার। মনের মতন একটি বউ আনব। বাড়িতে লক্ষ্মী-স্থাপনা করে গেলাম, মরবার আগে এই সান্ত্বনা নিয়ে যেতে চাই। ভাল মেয়ে আছে সন্ধানে?

চন্দ্রা আগ্রহের সুরে বলে, যূথীর সঙ্গে ছোড়দার বিয়ে দাও বাবা। যূথীকে তুমি দেখ নি—চমৎকার মেয়ে। পরশু আসবে, নেমন্তন্ন করে এসেছি।

নৃসিংহ নিস্পৃহভাবে বললেন, তোমাদের চোখে চমৎকার হয়তো। কিন্তু এদ্দিন তোমাদের পছন্দমতো হয়েছে, বঙ্কিমের বিয়েটা ষোলআনা আমার মতে দেব—এই ঠিক করেছি মা।

চন্দ্রা আহত হয়ে বলল, ছোড়দার জন্য বুঝি খারাপ সম্বন্ধ এনেছি? দেশ-দেশান্তর খুঁজে বড়বউদিদিকে এনেছিলে, আমার বড় তার চেয়ে ভাল বই খারাপ হবে না, দেখো।

নৃসিংহ জোরে জোরে ঘাড় নাড়ালেন।

বড়বউমার সঙ্গে তুলনা করতে যেও না। ঠকেছি— বিষম ঠকেছি। সুন্দর মেয়ে কাকে বলে, তখন কোন রকম আন্দাজ ছিল না। বাইরের চেয়ে ভিতরের চেহারার বেশি খোঁজখবর নেব এবার। গায়ের রঙের জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে যাচ্ছি। ছেলেটাকে অবধি পর করে তুলেছে, ঘরবাড়ি বাপ-ভাই ছেড়ে বউ কাঁধে নেচে বেড়াচ্ছে। দণ্ডবৎ বাপু তোমাদের ঐ-সব চমৎকার মেয়ের খুরে।

চন্দ্রা চলে গেলে সদুঃখে নৃসিংহ বলতে লাগলেন, বুঝলে ডাক্তার বাড়ির মধ্যে আমি একেবারে একা। কেউ আমার দলে নয়, কেউ আমার কথা বোঝে না। বাইরে থেকে দেখলে আমার সমস্তই আছে—কিন্তু আসলে কেউ নেই, কিছু নেই। তুমিই একমাত্র বুঝবে আমাকে। ঐ যা বললাম—আমার মনের মতো একটি পাত্রীর খোঁজ নিও তুমি।

পরেশের মনে হল, বনলতা মেয়েটির সঙ্গে সম্বন্ধ হলে কি রকমটা হয়? দেশে গিয়ে সেবার শ্রীশচন্দ্র দত্ত মশায়কে দেখতে তাঁদের ওখানে যেতে হয়েছিল। এক রকম বিনা প্রয়োজনেই তিন দিন সেখানে কাটিয়ে এসেছিলেন। সে এমন বাড়ি যে ছেড়ে আসতে মন চায় না। দীর্ঘকাল বাতে শয্যাশায়ী থেকে দত্তমশায়ের মন-মেজাজ ভাল নয়। কিন্তু বড় ভালমানুষ তাঁর ছেলেটা। আর বিস্মিত হয়ে যেতে হয়, দত্তমশায়ের গিন্নিকে দেখে। অমন বুদ্ধিমতী রাশভারি আর সকল দিক দিয়ে চৌকস মেয়েলোক কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়—বিশেষ ঐরকম অতি-দুর্গম পাড়াগাঁয়ে। বনলতাকে ডাক্তারের বড় পছন্দ।

পরেশ একটু ইতস্তত করে বললেন, খোঁজ একটা আছে।

আমার খুবই পরিচিত, সব দিকে ভাল। তবে--

'তবে' বলে থামলে কেন? খুঁত আছে কোনরকম?

পরেশ বললেন, তা খুঁত বলেই মনে হতে পারে আপনার। বড্ড স্বদেশি ভাব পরিবারের মধ্যে। মেয়ের বাপ স্বদেশি করত। অভিভাবক বুড়ো দাদামশায়—তিনি ওসব তালে নেই অবিশ্যি। কিন্তু তিনি ছাড়া আর সবাই—

আর আমরা বিদেশি হয়ে গেলাম বুঝি? তোমার যেমন কথা ডাক্তার! রায় বাহাদুর হেসে উঠলেন। বললেন, স্বদেশি-ভাব আছে---ভালই তো। দেশকে ভালবাসলে তবেই তো দেশের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা জাগে।

তাঁর মনে পড়ে গেল, স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে আসামিদের কথা। কী নিষ্ঠা, কী বীর্যবত্তা প্রকাশ পাচ্ছিল তাদের চলনে বলনে!

পরেশ বললেন, তা যদি হয়—দেশে যাচ্ছি, গিয়ে ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আপনাকে খবর পাঠাব।

ভাবনায় পড়ে গেল চন্দ্রা। যূথীকে বাড়ির ছোটবউ করে আনার কল্পনা, বঙ্কিমের সঙ্গে কথাবার্তা হবার আগেও অনেকবার মনে এসেছে। যত ভাবছে আগ্রহ ততই বেড়ে যাচ্ছে। এ বিয়ে হলে ভাল হবে, ছোড়দার সঙ্গে যূথীর মনে-প্রাণে মিল হবে। ঝড়-ভাবনা কারও মনে নেই, পরম শান্তিতে দিন কাটাবে ওরা।

কিন্তু বাবার যা মনের গতিক, বঙ্কিমকে অবস্থাটা বিশেষ করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। যাতে বাপের বিরুদ্ধে ও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে। নৃসিংহকে জানে, শেষ পর্যন্ত তিনি নরম হয়ে যাবেন। খোঁজ নিল, বঙ্কিম বাড়ি নেই—বলে গেছে, রাত্রে আসবে না। খুব ব্যস্ত হয়ে বেরিয়েছে, সম্ভবত কলকাতার বাইরে তাকে যেতে হয়েছে।

বঙ্কিম ফিরল পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে। ছিল কলকাতাতেই,

কাজকর্মে বিষম ব্যস্ত ছিল। আজকে কাপড়চোপড় বিছানাপত্র বেঁধে দূরের এক জায়গায় রওনা হতে হচ্ছে, ফিরতে তিন-চার দিন হবে।

চন্দ্রা বলল, তা হলে?

বঙ্কিম বিমর্ষমুখে বলে, এ চাকরির এই তো বিপদ! কখন কোথায় যেতে হবে, ঠিক-ঠিকানা নেই। দিনকে-দিন অবস্থা সঙিন হয়ে উঠছে। তুই কর্ যা ভাল বুঝিস—তোর বুদ্ধি আমার চেয়ে ঢের ঢের ধারালো।

চন্দ্রা একটুখানি ভেবে বলে, যাবার আগে তবে পরেশ ডাক্তারকে বলে কয়ে যাও। ওঁর কথা বাবা শোনেন। নইলে যা গতিক ছোড়দা, তোমার কাঁধে তেল-জবজবে মোক্ষদা-দিগম্বরী গোছের নামওয়ালা নোলক-পরা এক খুকিঠানদিদি নির্ঘাৎ চেপে বসবেন। বাবা ঠিকঠাক করে বসলে তখন 'না' বলা মুশকিল হয়ে পড়বে।

বঙ্কিম বলে, ডাক্তার-দা এ সময় তো বাড়ি থাকেন না। আর তাঁকে বলতে যাবার সময়ই বা কোথা? বুঝতে পারছিস নে, কী ব্যাপার! বিলেত থেকে ক্রিপস সাহেব আসছে, মিটমাট হয়ে যায় তো ভাল। নয় তো কত ঘোরাঘুরি অদৃষ্টে আছে, কে জানে! সহসা গলা নামিয়ে অকারণ এদিক-ওদিক চেয়ে বলে, জানিস রে? সুভাষ এখন জার্মেনিতে।

চন্দ্রা বলে, অনেকেই তো অনেক রকম রটাচ্ছে।

বঙ্কিম বলে, অফিসের রেডিওয় নিজের কানে শুনেছি। গুজব-কথা নয়। উত্তর-জার্মেনির কোনখান থেকে বললেন। আর ব্রডকাস্টিং-স্টেশনের নাম কি দিয়েছে জানিস—আজাদ-হিন্দ রেডিও। আজাদ-হিন্দ হল কি না স্বাধীন ভারতবর্ষ।

আজাদ হিন্দ—স্বাধীন ভারতবর্ষ! কথাটা বার দুই উচ্চারণ করল চন্দ্রা। লোভী দরিদ্র যেমন ভাল অশন-বসনের নাম উচ্চারণ করে সুখ পায়।

(৮)

একা যূথী নয়--নিমন্ত্রণ আরও তিনটি মেয়ের। ওদের কলেজেরই মেয়ে সবাই। যা চালাক যূথী, একা তাকে ডাকলে গূঢ় মতলবটা ধরে ফেলবে। ভেবেচিন্তে পরে তাই আরতি, সেবা, আর বিজলীকে বলে এসেছে। বিজলীর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে—মেজবউদিদির মামাত-বোন। মনের ইচ্ছা না থাকলেও—নিমন্ত্রণের খবর এর পর জানাজানি হয়ে যাবে, আর বিজলীর সঙ্গে চন্দ্রার ঘনিষ্ঠতা কলেজে সর্বজনবিদিত, এ অবস্থায় তাকে বাদ দেওয়া চলল না।

গাড়ি নিয়ে চন্দ্রা নিজেই বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের নিয়ে এসেছে। কলিকাতার কোটরে থাকে, এখানে এসে জায়গা-জমি, পুকুর, বাগবাগিচা পেয়ে মেয়েগুলো বর্তে গেছে। মিনিট দশেকের বেশি কাউকে ঘরের ভিতর ভদ্রভাবে বসিয়ে রাখা গেল না।

এমনি গ্রহ, বড় ঠাকুরটার জ্বর এসেছে। বাচ্চা ঠাকুরের হাতে দিয়ে চন্দ্রা এদের চা-জলখাবার নিয়ে এল। পুকুর-ঘাটের পরিচ্ছন্ন সিমেণ্ট-বাঁধানো চাতালের উপর এনে রেখেছে। ওদের ডাকছে: এসো না ভাই তোমরা একবার এদিকে।

বিজলী চোখ কপালে তুলে বলে, এখন এত ?

চন্দ্রা বলে, রান্নার একটু দেরি হবে ভাই। আমাকে রান্নাঘরে থাকতে হচ্ছে মেজবউদির সঙ্গে। তোমাদের দেখাশুনো করতে পারছি নে। নিজের বাড়িই তোমাদের—অসুবিধা হলে মানিয়ে-গুছিয়ে নিও।

আরতি বলে, কিছু না, কিছু না। বেশ তো আছি—বাগান দেখে, পুকুরের মাছ দেখে, ফুল তুলে, হৈ-হল্লা করে বেড়াচ্ছি।

মিছে তোমায় ভাবতে হবে না।

চন্দ্রা বলে, এমন দলের মধ্যে আমি থাকতে পারছি নে, সে-ও তো দুঃখ আমার! আচ্ছা, শোধ তোলা যাবে দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর।

চন্দ্রা আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে। ঘাটের রানার উপর পা ঝুলিয়ে বসে মৃদুকণ্ঠে যূথী গান ধরল। আর তিন জন কানামাছি খেলছে পাতা-বাহারের গাছের সারির ওধারে।

আরতি যূথীকে ডাক দেয়: আপনি আসবেন না?

বিজলী বলে, ক্ষেপেছিস, যুথীকা দেবী আসবেন এই জায়গায়? ফর্শা গায়ে ধুলো লেগে যাবে।

যূথী গান থামাল হঠাৎ। তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখছিল, বাগানের পূর্বদিকে একটা আমগাছে বড় বড় গুটি ধরেছে। আঙুল তুলে ওদের দেখিয়ে দিয়ে বলল, ছেলেখেলার মধ্যে আমি নেই। চল গুটি কুড়িয়ে আনি। নুন দিয়ে জারিয়ে খাওয়া যাবে।

গান ও খেলাধুলোর তুলনায় লোভনায় প্রস্তাব। ধুপধাপ সবাই ছুটে চলল। নাঃ, একেবারে পরিচ্ছন্ন গাছতলা, শুকনো পাতা কতকগুলো কেবল পড়ে আছে। এতদূর অবধি এসে রোজ ঝাঁট-পাট দিয়ে যায় নাকি?

তলায় এসে কচিআমের থেলোগুলো আরও স্পষ্ট নজরে এল। নধর সুপুষ্ট—এক একটা থেলোয় দশ-বারোটা অবধি ফলেছে। নটের বীজ ছড়িয়ে বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে একদিকে। সেই বেড়া থেকে বিজলী এক লম্বা বাখারি খুলে এল। অনেক চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু বাখারি আম অবধি পৌঁছল না।

যূথী বলে, তোদের বড্ড লোভ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। নিজ-মূর্তি ধরব নাকি তা হলে?

জুতো খুলে ফেলল, শাড়িটা টেনে গাছকোমর বেঁধে সে তৈরি হল।

আরতি বলে, গাছে চড়বে নাকি? না, না—কাজ নেই, একখানা কাণ্ড ঘটিয়ে বোসা শেষকালে!

কিন্তু অতি-অবহেলায় চক্ষের পলকে যূথী একটা উঁচু দোডালার উপর উঠে বসল।

মুগ্ধ বিস্ময়ে সেবা বলে ওঠে, তুলতুলে শরীর—তা গায়ে তো বেশ জোর আছে।

হাসিমুখে যূথী বলে, তোমরা খালি বাইরেটাই তো দেখ, আর একটু সাফসাফাই থাকি বলে নিন্দে রটিয়ে বেড়াও। এতটুকু বয়স থেকে রাসবাগানের কত আম-জাম লিচু-জামরুল চুরি করে খেয়েছি লেখা-জোখা নেই। তখন ছোট খুকিটি ছিলাম, কাঠবিড়ালির মতো এ-ডাল ও-ডাল করে বেড়াতাম।

কিন্তু বড় হয়ে বিদ্যাটা কিছুমাত্র ভোলে নি দেখা যাচ্ছে। লীলায়িত ভঙ্গিতে কেমন অবলীলাক্রমে উঁচু উঁচু ডালে উঠেছে। আরতি সভয়ে অনুনয় করে, আর উঠো না। ডাল ভেঙে যদি এই পরের বাড়িতে এসে··· না-না-না—

যূথী ভেবে দেখল কথাটা। আর মগডালে ওঠা সঙ্গত হবে না। বলে, তবে কি করি ঝাঁকি দিই? ওখানে দাঁড়িও না, সরে দাঁড়াও। পিঠে পড়লে পিঠ ভেঙে যাবে। পড়ুক আগে, তারপর কুড়িও।

ডালটা ধরে একটু নাড়া দিতে টুপটাপ করে বিস্তর গুঁটি ঝরে পড়ল। এত নরম বোঁটা? যেন খোলাহাঁড়িতে খই ফুটে গেল।

কে রে?

নৃসিংহ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। তপোবনের সামনেই গাছটা। কলমের গাছ—উৎকৃষ্ট গোলাপখাস। এই আমগুলোর সম্পর্কে নৃসিংহর সতর্কতার অন্ত নেই। ডাঁসা হয়ে যখন রঙ ধরে ওঠে, পাখী ও বাদুড়ে খেয়ে যাবে এই আশঙ্কায় প্রতি বছর গাছের উপরে জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়। সেই গাছের কচিআম ঢিব-ঢিব করে পড়ছে। একটা ডাল জোরে আন্দোলিত হচ্ছে, রোয়াক

থেকে দেখতেও পেলেন।

ফটকে হারামজাদা বুঝি! গাছে উঠে গুঁটি পাড়ছে, এত আস্পর্ধা? আজ তোর হাড় এক জায়গায় মাংস এক জায়গায় করব। দাঁড়া।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটলেন। রোয়াক থেকে নামবার সময় খড়মের একটা দল ছিঁড়ে গেল। খড়ম ছুঁড়ে ফেলে খালিপায়েই ছুটেছেন। বিজলী ওরা ভয় পেয়ে তলা থেকে সরে পড়েছে।

নৃসিংহ এসে হুঙ্কার ছাড়লেন: নেমে আয় শূয়োর, কান টেনে লম্বা করে দিই। উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন—পাতার মধ্যে লুকিয়ে কি নজর এড়াতে পারবি? নেমে আয় বলছি—আর নয়, আজকে থানায় হেফাজত করে দিয়ে আসব।

চেঁচামেচি শুনে বাগানের একজন মালি এসে পড়েছে। ছড়ানো গুঁটিগুলোর দিকে সদুঃখে চেয়ে নৃসিংহ তাকে বললেন, কি করেছে দেখ্। ছোঁড়াটার বড্ড বাড় বেড়েছে। নামছে না—উঠে কানটা ধরে হিড়হিড় করে নামিয়ে নিয়ে আয় দিকি।

নৃসিংহ চোখে ভাল দেখেন না। মালি উঁকিঝুঁকি দিয়ে বলল, মেয়েমানুষ আজ্ঞে হুজুর—

সবিস্ময়ে রায় বাহাদুর প্রশ্ন করেন, মেয়েমানুষ? ফটকের মা বুঝি? মায়ে-পোয়ে বাগানের ঘাসটা অবধি খুঁটে নিয়ে যাচ্ছে। কিছু বলি নে বলে সাহস বেড়েছে। এখন গাছের উপর অবধি ধাওয়া করেছে।

উপরের দিকে তাকিয়ে হুমকি দিলেন, নাম বলছি ফটকের মা। এখান থেকে নির্ঘাৎ বাস ওঠাব, নাককাঁদুনি শুনব না। এমন প্রজায় আমার কাজ নেই।

দেখা গেল তাড়া খেয়ে যূথী সত্যিই ফন-ফন করে নেমে আসছে। নেমে নিঃসঙ্কোচে এসে নৃসিংহের সামনে দাঁড়াল। বলে, ফটকের মা নই। চন্দ্রার ক্লাসফ্রেণ্ড—আমার নাম যূথীকা কর।

তারপর হাসতে হাসতে বলে, ক'টা কাঁচা আম পাড়ছিলাম, তা অত রাগ করছেন কেন ?

নৃসিংহ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মেয়েটির সঙ্কোচহীনতা দেখে। ক্ষণকাল কথাই বলতে পারেন না। শেষে বললেন, গাছের মাথায় চড়েছিলে কেন মা ? এতগুলো গোলাপখাস নষ্ট করলে, সে ক্ষোভ আমি করছি নে। কিন্তু মেয়েছেলের এমন পুরুষালি কি ভাল, আমাদের দেশে চলতি আছে এ রকম ? নিতান্ত খুকিটি নও। ছি-ছি !

যূথী নিতান্ত ভালমানুষের ভাবে উত্তর দিল : নিচে থেকে কত চেষ্টা করেছিলাম, মস্ত বড় এক বাখারি নিয়ে এসেছিলাম ঐ দেখুন। কিন্তু নাগাল পাওয়া গেল না, কি করব ?

কৈফিয়ৎ দিয়ে হাসতে হাসতে স্বচ্ছন্দগমনে যূথী পুকুর-ঘাটের দিকে চলল।

নৃসিংহ ফিরে চলেছেন, চন্দ্রা আসছিল। পুলকিত কণ্ঠে চন্দ্রা বলল, যূথীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলে ? দেখলে তো ? বল এইবার কেমন মেয়ে।

নৃসিংহ বললেন, এর কথা বলছিলি বুঝি ?

চন্দ্রা গুণের ফিরিস্তি দিচ্ছে। চেহারা ঐ দেখলে—আর ওদিকে যেমন পড়াশুনোয়, তেমনি আলপনায়, ছবি আঁকায়, ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্মে—

নৃসিংও সেই সুরে বলতে লাগলেন, তেমনি বেহায়াপনায়, হনুমানের মতো গাছে চড়ায়। বড়বউমার কথা বলছিলি—এ যে দেখছি তাঁর ঠাকুরদাদা।

বিজলী ইতিমধ্যে কোন ফাঁকে বাড়ির ভিতর ঢুকেছিল। এখন এসে নৃসিংহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। নৃসিংহ রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালেন।

চন্দ্রা পরিচয় দিয়ে দেয় : চিনতে পারছ না বাবা ? বিজলী—

মেজবউদির মামাতো বোন। আরও একবার তো এসেছিল এ-বাড়ি।

বিজলী হেসে বলে, চন্দ্রা-দিদির বিয়েয় এসেছিলাম, আপনার মনে নেই।

নৃসিংহের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। বললেন, একসঙ্গে এসে তুমি ওদের দলছাড়া কেন? পুরুষালি পছন্দ কর না?

জবাব না দিয়ে বিজলী ওদের ডাকে: জায়গা হয়েছে। এসো এইবার তোমরা।

যাবার আগের রাত্রে চন্দ্রা ও শিশির চিলেকোঠায় খিল এঁটে দিল। আর সুবিধা হবে না এ সমস্ত শুনবার। যা ধরতে চাচ্ছে, অনেকক্ষণ অনেক অনেক চেষ্টার পর মিলল। সুভাষচন্দ্র বলছেন—সেই স্বর, বলবার সেই ভঙ্গিটি—।

> বৃটিশের পতনেই ভারতের স্বাধীনতা-লাভের আশা। আজকে যেসব ভারতীয় বৃটিশের শক্তি-বর্ধনে সাহায্য করবে, তারা দেশদ্রোহী। দেশ-নেতাদের বিরুদ্ধে যারা বৃটিশের পক্ষ নিয়েছে, তারাই একালের মীরজাফর-উমিচাঁদ—

শিশিরের দিকে কটাক্ষ করে হাসিমুখে চন্দ্রা বলে, তোমরাই-বুঝলে প্রভু? স্বাধীন-ভারতে বিচার হবে তোমাদের। প্রোমোশানের উল্লাসে মেতে আছ—পদ বাড়ল, বেশি মাইনে হল—তার মানে দাঁড়াচ্ছে, অস্ত্র শানিয়ে এগুতে হবে মুক্তিকামীদের মুখোমুখি।

শুনছে বক্তৃতার শেষ—

The day, when justice and equality will assert themselves, is not far off. India will be able to prosper and flourish in an atmosphere of freedom and justice. Long Live Revolution!

আহ্বান আসছে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে: দিন আগত ঐ। বিষম বিপন্ন বিদেশি শাসক—ভিতর থেকে আঘাত হানো এই সময়।

আঘাত হানো, নিষ্ঠুর সর্বধ্বংসী প্রচণ্ড আঘাত। কিন্তু প্রস্তুতি কই? আইনের কড়া নাগপাশ অষ্টেপিষ্টে বাঁধা। তাতে অবশ্য আটকায় না—কোন্ দেশে বা আটকেছে? দুর্বলতা ভিতরেই—দলাদলি ও অপ্রত্যয়ের অন্ত নেই। মত পথ ও চুল-চেরা হিসাব নিয়ে নেতাদের কলহ। পরম-ক্ষণ এবারও বৃথা যাবে কি বিগত মহাযুদ্ধের মতো? লক্ষকোটি নগ্ন নিরন্ন মানুষের সামনে টোপ ফেলে দিয়েছে—লড়াইতে এস, লড়াইয়ের কাজকর্মে লেগে যাও, নয় তো উপোস করে মরে থাক ঘরের কোণে। যারা অঘটন ঘটিয়েছে, বিপ্লব এনেছে, ইতিহাসে যাদের অভ্যুত্থানের কাহিনী পড়ে থাকি, তারা কি এদের মতোই মানুষ? শুধুমাত্র খাওয়া-পরার ভাবনাতেই দিন-রাত্রি কেটে যায়, ভণ্ড নেতাদের ভাঁওতা বেদবাক্য বলে জেনে বসে আছে, স্বাস্থ্য আনন্দ ও মেরুদণ্ডবিহীন এরাই কি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল প্রতাপান্বিত রাজশক্তি আর সেই শক্তির বাহন অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে?

(৯)

দোকানের একখানা নূতন পালিশ-করা চেয়ারে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে ভাবছেন শশিশেখর। দেখছেন, এ-কড়িকাঠ থেকে ও কড়িকাঠ অবধি প্রসারিত ঊর্ণাজাল। বারোখানা করে বরগা এক এক খোপে, পাঁচটা কড়ি। অনেকদিন ধরে—রোজই বোধহয় দু-তিনবার করে গণে থাকেন, মুখস্থ হয়ে গেছে। ঐ ঊর্ণাজালের উপর নানারকম অস্পষ্ট ভয়াবহ ছবি দেখে ইদানীং শিউরে শিউরে উঠছেন তিনি। জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য, সংসার-খরচ ভয়ানক রকম বেড়ে গেছে। আরও সর্বনাশ করেছেন মেয়ে দুটোকে লেখাপড়া শিখতে দিয়ে। বাড়িতে শশিশেখর খুব কম সময় থাকেন। দুটোয় এসে চাট্টি ভাত নাকে-মুখে গুঁজে তিনটের মধ্যে বেরিয়ে যান, আর ফেরেন রাত্রি এগারোটা বারোটায়। বাড়ি তাঁর কাছে কণ্টকবনের তুল্য, ইন্দুমতী

এ অবস্থা করে তুলেছেন। ইন্দুমতীর নিজের বিদ্যা সামান্যই, বাংলা চিঠিপত্র লিখতে পারেন—বানান ভুল বিশেষ হয় না, বাংলা খবরের-কাগজও পড়েন। ঐ চার পয়সা মূল্যের কাগজের সম্বল থেকে তিনি এমন সব উক্তি করেন, যে মনে হবে চার্চিল-হিটলার-স্তালিন-মুসোলিনি তাঁর কাছে বুদ্ধি নিয়ে যদি লড়াইয়ে নামত, নানাবিধ প্রমাদ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যেত তা হলে অতি সহজে। কে নাকি কবে ইন্দুমতীর সম্পর্কে বলেছিল, তিনি গ্রাজুয়েট—কথাটা একদম মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু ইন্দুমতী সগর্বে প্রায়ই বলাবলি করে থাকেন ঐ কথাটা। গর্বের হেতু, তাঁর ধারণা, গ্রাজুয়েটের চেয়ে কোন অংশে কম শিক্ষিত নন তিনি, ডিগ্রিটাই কেবল নেই। এর জন্যও তাঁর অনুযোগ শশিশেখরের বিরুদ্ধে। চোদ্দ বছর বয়সে শশিশেখর তাঁকে বিয়ে করে ফেললেন, সেইজন্য পাশ করা ঘটে ওঠে নি। সাত বোন তাঁরা—পরবর্তী কালে বাইশ-চব্বিশ বছরেও বিয়ে হয়েছে কোন কোন বোনের—কিন্তু লেখাপড়া কারো এগোয় নি। এটা অবশ্য হতে পারে, ইন্দুমতীর মতো প্রতিভার অধিকারী আর কোন বোনই নয়।

কিন্তু এ হেন প্রতিভা সত্ত্বেও জমাখরচটা তিনি লিখতে জানেন না, এক আনা আজও উল্টোভাবে অনুস্বারের মতো করে লিখে থাকেন। হিসাবে জ্ঞান না থাকায় তাঁর নিজের কোন অসুবিধা নেই—শশিশেখরের বিপদ হয়েছে, অকূল-সমুদ্রে পড়ে তিনি দাপাদাপি করেন বারো মাস।

কর এণ্ড কোম্পানি, ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স—পুরানো দোকান। সাইনবোর্ডটা বিশ্রী বিবর্ণ হয়ে গেছে—পড়া মুশকিল। ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়া—আসবাবপত্র এ-পাড়ায় তেমন বেশি বিক্রি হয় না, ভাড়ার কারবার চলে। সেটা ভালই চলত আগে। ঝকঝকে ড্রইংরুম-সেট, ড্রেসিংরুম-সেট, বেডরুম-সেট, প্রভৃতিতে পরিবৃত হয়ে এক একটি লাটসাহেবের মতো

যারা পাড়ার মধ্যে জাঁকিয়ে বসে আছে, খোঁজ নিয়ে দেখগে বাইরের হ্যাটস্ট্যাণ্ডটিও তাদের নিজের নয়, কর কোম্পানি কিম্বা অপর কেউ সাজিয়ে দিয়ে গেছে। মাসে মাসে লোক এসে ভাড়া নিয়ে যায়, মিস্ত্রি এসে বার্নিশ করে যায় মাঝে মাঝে।

ভাড়া যদি ঠিকমতো আদায় হত, উপায় মন্দ হবার কথা নয়। কিন্তু লড়াই বেধে যাওয়া অবধি সকলের উড়ু-উড়ু মনের অবস্থা, টাকাপয়সা হঠাৎ কেউ হাত-ছাড়া করতে চাচ্ছে না। আর এক বিপদ হয়েছে, পালাবার ধুম পড়ে গেছে—মাসকাবারি ভাড়া আদায় করতে গিয়ে দেখা গেল, ঘর-বাড়ি হাঁ-হাঁ করছে, মক্কেল ভেগে পড়েছে। খবর শুনে অনেক ক্ষেত্রে শশিশেখর নিজে গেছেন, গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ফিরেছেন—পালাবার মুখে ভাড়া-করা ফার্নিচার-গুলো সর্বাগ্রে চোরাবাজারে বেচে দিয়ে গেছে। সন্ধানে সন্ধানে ক'দিন ঘুরলেন, খোঁজ মিলল না। এরা খাঁটি ইংরেজ। শশিশেখরের মনে মনে বিশেষ একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল, ইংরেজ কখনো ষোল-আনা জুয়াচোর হয় না। সে বিশ্বাস ধ্বসে গেল, বোমার আগুনে খাঁটি চরিত্র প্রকট হয়ে পড়ছে। দামি দামি মালগুলো এখন ফিরিয়ে আনা যায় কেমন করে? আনতে গিয়ে—জিনিষ তো দেয় নি, উল্টে গালি খেয়ে এসেছেন একাধিক জায়গায়। দোকানদারের খুশিমতো ফেরত দেওয়া হবে, এমন চুক্তিতে এসব তো নেওয়া হয় নি, মামলা করে আদায় কর যদি ক্ষমতা থাকে—এই ধরনের সব কথাবার্তা। ভিখ চাই না, কুত্তা ঠেকা রে বাপু—ভাড়ায় কাজ নেই ঐগুলো দোকানে এনে তুলতে পারলে হয়—এই হয়েছে আজকের চিন্তা। যুদ্ধের হিড়িকে লোকের ফার্নিচারের শখ উবে গেছে। জনহীন দোকানঘরে চেয়ারে বসে বসে শশিশেখর প্রায়ই আজকাল কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভাবেন এই রকম।

কড়িকাঠে ভাবনার কিনারা মিলল না, অবশেষে শশিশেখর উঠলেন। বিভাসরঞ্জনের কাছে গিয়ে পরামর্শ নিলে হয়। তার

ইংরেজ-বিদ্বেশ প্রবাদের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহেবি স্যুট অবধি পরে না, বেশি বহরের ধুতি, বেশি ঝুলের পাঞ্জাবি, আর চাদর এই পোষাকে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। লাটের কাছে যেতে হলেও এ পোষাকের ব্যতিক্রম হয় না। বয়স কম, কিন্তু রাজনীতিক ছলাকলায় অমন্ন কর্ম্বিৎকর্মা মানুষ বাংলাদেশে দ্বিতীয় নেই। এডভোকেট হিসাবেও নাম হয়েছে। আর পুরানো ভাড়াটে হিসাবে শশিশেখরের দাবি আছে তার উপর। পরামর্শ নিতে চললেন শশিশেখর।

বিভাস কোথায় বেরুচ্ছিল। লনের সামনে মোটর দাঁড়িয়ে, স্টার্ট দিয়েছে—পারসন্যাল-ক্লার্ককে ডেকে দু-একটা জরুরি নির্দেশ দিচ্ছিল, শশিশেখরকে দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে বলল, স্টার্ট বন্ধ করো—দেরি হবে।

আসুন, আসুন—বলে শশিশেখরকে সে বসবার ঘরে নিয়ে চলল। শশিশেখর বলেন, কাজে বেরুচ্ছিলেন, এসে ক্ষতি করলাম। আর এক সময় আসব না হয় আমি।

বিভাস বলল, এ-ও তো কাজ। আপনি কি বিনা-কাজে শুধু গল্পগুজব করতে এসেছেন? আসুন।

এমন খাতির দেখে শশিশেখর আরও সঙ্কুচিত হয়ে যান। বস্তুত ব্যাপারটা অভিনব। ইতিপূর্বেও এমন দু-একবার তিনি বেখরচায় পরামর্শ নিতে এসেছেন। এত কাজের মানুষ বিভাস—অধিকাংশ দিনই দেখা পাওয়া যায় না। আজকে সেই মানুষ খাতির করে এক রকম পথ দেখিয়ে অফিস-ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে বসানো শুধু নয়, চাকর ডেকে সে চায়ের ফরমাস করল।

আপনার বাড়ির লাগোয়া বাগানটা নিয়ে নিচ্ছি কর মশায়। কেমন হবে? সেদিন গিয়েছিলাম যে ওখানে। শোনেন নি? খুব জল-টল খাওয়ালেন আপনার বাড়ি থেকে।

শশিশেখর তাঁর বিপদের কথা আনুপূর্বিক জানালেন। ভাড়ায়

আর কাজ নেই, পামার সাহেবের বাড়ি অনেক দামের ফার্নিচার—ফিরিয়ে দিলে রক্ষা পেয়ে যান তিনি। বদমায়েসের ধাড়ি পামার সাহেব— বাঙালি জাত ধরে নিন্দেমন্দ করে সেবারে সেই যে স্টেটসম্যানে চিঠি লিখেছিল। বিভাসরঞ্জন এই ব্যাপার নিয়ে বেশ খানিকটা অপদস্থও করতে পারবে সাহেবটাকে।

বিভাস টেবিল থেকে কাগজ-কাটা ছুরিটা নিয়ে হাতের নখ চাঁচছিল। আগাগোড়া মনোযোগ দিয়ে শুনল। শেষে বলল, শুনুন শশিশেখর বাবু, ও-সমস্ত থাক। আমি বলি কি—

কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বলতে লাগল, আমি বলছি এসব নিয়ে। উতলা হবার দরকার নেই। চুলোয় যাকগে ফার্নিচার আর কর-কোম্পানি। পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে রাজি আছেন? রাজি থাকেন তো বলুন।

কিসের ব্যবসা? কার সঙ্গে?

মৃদু হেসে বিভাস বলল, ব্যবসা এমন-কিছু নয়—ব্যবসার একটা ঠাট সামনে রেখে দু-হাতে টাকা কুড়িয়ে ঘরে তোলা। মস্ত সুযোগ এসে গেছে—ভাল ভাল মিলিটারি-কণ্ট্রাক্ট। দু-তিন দিন ধরে ভাবছি, কি করা যায়? আপনার কথাই বিশেষ করে মনে হচ্ছিল। আপনাকে পেলে সুবিধা হবে। আপনারও ভাল—এমন ভাল— যে দু'শ বছর ফার্নিচারের দোকান চালিয়েও সে লাভ কল্পনায় আনতে পারবেন না।

শশিশেখর বললেন, আপনি থাকছেন তো সঙ্গে?

আমি নই, আমার মা। কংগ্রেসি মানুষ—যুদ্ধের ব্যাপারে সাহায্য করি কেমন করে?

হাসতে হাসতে আবার বলল, এক হিসাবে দেখতে গেলে সাহায্য এটা একেবারেই নয়। বর্বরের ধনক্ষয় করা আর নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়া। কাজের চেয়ে অকাজই হবে বেশি—কেন ছাড়তে যাব বলুন? ভিতরে কত মজা, বুঝতে পারবেন

নেমে পড়লে। নিজে কখনো করি নি বটে, তা হলেও যাঁরা করে থাকে দহরম-মহরম আছে তাদের সঙ্গে। টাকাকড়ি সরবরাহ আর কন্ট্রাক্ট বাগানোর তোড়জোড় আমি করব, আপনি খাটাখাটনি করে কাজকর্ম তুলে দেবেন, লেনদের আপনার হাত দিয়ে হবে। দেখুন, এ প্রস্তাব যাকে দেব, সে-ই স্বর্গ হাতে পাবে। আপনার সঙ্গে পুরানো সম্বন্ধ—আপনাকেই চাচ্ছি এই কারবারে।

সেই মর্মে দলিল হয়ে গেল। নূতন কোম্পানির পত্তন হল—কর-শিকদার ইঞ্জিনিয়ার্স। ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত বিভাসরঞ্জন মায়ের নামও দিল না—বেকার এক ভাগনে ছিল ভবভূতি শিকদার, তার বেনামিতে ব্যবসা হল। বিভাসের যে যোগাযোগ আছে, লোকে কোনক্রমে টের না পায়। আগামী ইলেকশনে কংগ্রেসের মনোনয়ন পাবার প্রত্যাশা করছে, কোন সূত্রে জানাজানি হলে সমস্ত ফেঁসে যাবে। জীবনে একটা বার সাত দিনের জন্য জেল খেটেছিল উনিশ শ' তিরিশ সনে আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় সেই মূলধন ভাঙিয়ে আজকে সে এত বড় - বড় শুধু টাকায় নয়, নেতৃত্বে ও নামযশে। আন্দোলনের ঢেউয়ের পর ঢেউ এসেছে, মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, প্রাণ দিয়েছে—আশ্চর্য কৌশলে বারম্বার পাঁকাল মাছের মতো ঠিক সময়টিতে ছিটকে পড়েছে সে। কর্মীরা যখন জেলে, সেই অবসরে কিছু টাকা-পয়সা ও ভাল ভাল কথার জোরে ভাঙো ভাঙো পশার মেরামত করিয়ে নিয়ে আবার নিঃসহায় জনগণের প্রতিনিধি সেজে বসেছে।

সভাসমিতিতে সাহেবদের এত গালিগালাজ করে, অথচ শশিশেখর দেখে আশ্চর্য হলেন, তাদেরই সঙ্গে বিভাস হরিহর-আত্মা। সন্ধ্যার পর রোজই প্রায় তাদের ক্লাবে যায়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য গলাধঃকরণ করে ফিরে আসে। দুই উকিলের মামলা চালানোর মতো—এজলাসে ঝগড়া করে বার-লাইব্রেরিতে এসে এ-ওর পানের ডিবে থেকে খিলি তুলে কপ-কপ করে মুখে ফেলছে।

বিভাস বলল, সাহেবদের হাতে কাজ থাকলেই আমাদের সুবিধা। বাঁধা দরদস্তুর—হাঙ্গামা করতে হয় না। ছ্যাঁচড়া হল দেশি মানুষ—যত খাওয়াও পেটের বহর বেড়েই চলে।

সুবিধাই হল। প্রথম যে কাজটা ধরল সেটা লালমুখ খাঁটি-সাহেবের হাতের খুব সহজে বন্দোবস্ত হয়ে গেল। চারপায়া শ-পাঁচেক পাঠালেই চলবে—এক হাজারের ভাউচার থাকবে, দামও আদায় হবে পুরোপুরি এক হাজারের। এই বাড়তি পাঁচ-শ'র দরুন আধাআধি বখরা।

বিভাস সগর্বে বলে, লড়াইয়ে সাহায্য করছি কিম্বা কি করছি বুঝে দেখুন তা হলে। ওদের নিজের জাতভাইরা অবধি এই দলে। চুপি-চুপি বলছি, শুনে রাখুন—ভয়ানক অব্যবস্থা ওদের, কিচ্ছু গোছগাছ নেই। জাপানিরা জোর কদমে আসছে, উত্তর পশ্চিম দিক থেকেও আশঙ্কা রয়েছে। হিড়িকের মাথায় যত পারেন গুছিয়ে নিন। টলটলায়মান অবস্থা—কে এখন ঠাণ্ডা মাথায় মালপত্র গোণাগুণতি করে নিচ্ছে! লুটের টাকা—কুড়িয়ে নিন, দু-হাতে কুড়োন—

(১০)

মহীনের গ্রামের নাম রায়গ্রাম। বেলেডাঙা স্টেশনে নেমে যেতে হয়। ডিস্ট্রীক্ট-বোর্ডের প্রশস্ত রাস্তা আছে। মাইল তিনেক মাত্র দূর—মানুষজন পায়ে হেঁটে চলে যায় রাস্তাটুকু। সঙ্গে মেয়েছেলে কিম্বা অথর্ব বুড়োমানুষ থাকলে অবশ্য গরুর-গাড়ি করতে হয়। বর্ষাকালে আরও সুবিধা, বাঁওড়ে জল থৈ-থৈ করে, ওদিককার মহিষখোলা গাঙের সঙ্গে বাঁওড় একাকার হয়ে যায়। অবাধে নৌকায় যাতায়াত চলে সেই সময়।

বেলেডাঙা বড় গঞ্জ। বাঁওড়ের ধার দিয়ে সারবন্দি খোড়োঘর আর টিনের চালা—পাকা বাড়ি দু-একটা মধ্যে মধ্যে। পাটের

মরশুমে অনেক টাকার পাট কেনাবেচা হয় এখানে। এ ছাড়া প্রতি শনি-মঙ্গলবারে হাট বসে। হাটে রকমারি জিনিস ওঠে, তার মধ্যে গোহাটার নাম বহুখ্যাত। গরু কিনবার জন্য চাষীরা দূর-দূরন্তর থেকে আসে। ঘোড়া বিক্রির জন্য শীতকালে বেদেরা এসে একমাস দু-মাস টোল ফেলে থাকে হাটখোলার পাশে দূর-বিস্তৃত শূন্য মাঠের উপর।

হাটের অনতিদূরে রেলস্টেশন। জায়গার যেমন খ্যাতি, স্টেশনের চেহারা সে রকমের নয়। টিন দুমড়ে অর্ধবৃত্তাকারে-ছাওয়া স্টেশনের অফিস-ঘর, স্বল্পায়তন প্লাটফরম। রাত্রিবেলা ট্রেন আসবার মুখে গোটা চারেক মিটমিটে কেরোসিনের আলো জ্বেলে দিয়ে আবার ট্রেন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দেওয়া হয়। রেল কোম্পানির অবহেলিত এই স্টেশনে স্টেশন-মাস্টারের মাইনে যৎসামান্য। তা হলেও অন্নদাচরণ পুরকায়স্থ মশায় সাত বছর আছেন এই জায়গায়, নড়বার ইচ্ছে নেই তাঁর এখান থেকে। গোণা মাইনের কি হবে, দিন দিন জেঁকে উঠুক এখানকার শনি-মঙ্গলবারের হাট, রেলগাড়ি চড়ে হাটের ব্যাপারিরা যাতায়াত করুক, পাটের গাঁট প্লাটফরমের উপর আকাশচুম্বি হয়ে অপেক্ষা করুক মালগাড়ির প্রত্যাশায়। কোম্পানির মাইনে হিসাবে মাসিক যা বরাদ্দ আছে, সে ক'টি টাকা গরিব-দুঃখীকে অবহেলায় খয়রাত করতে আটকায় না অন্নদাচরণের।

একবার বছর চারেক আগে কর্মদক্ষতার জন্য মাস্টারমশায়ের প্রমোশান হয়েছিল; বড় স্টেশনে বদলি হলেন তিনি। মাইনেও দশ টাকা বাড়ল। চিঠি এল হেড-অফিস থেকে, মাস্টারমশায় গালে হাত দিয়ে বসলেন। কোন হিতৈষী সুহৃদ উপযাচক হয়ে তাঁর এমন সর্বনাশ করল, তিনি ভেবে পান না। ছুটলেন হেড-অফিসে। সেখানে জানাশোনা বন্ধুবান্ধব অনেকেই প্রোমোশানের খবর জানেন—তাঁরা সন্দেশ খেতে চান। কিন্তু অন্নদাচরণের মুখের দিকে চেয়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন তাঁরা।

ব্যাপার কি ?

প্রোমোশান যাতে মাপ হয়ে যায়, সেই চেষ্টা কর ভাই। সন্দেশ-রসগোল্লা মাংস-পোলাও যা খেতে চাও, ভরপেট খাওয়াব।

অনেক ঘোরাঘুরি ও তদ্বির-তাগাদার পর অবশেষে প্রোমোশান রদ হল। থোক পাঁচ-শ টাকা নাকি দক্ষিণাও দিতে হয়েছিল উপরওয়ালাকে। বেলেডাঙায় ফিরে এসে দু-ধামা বাতাসা দিয়ে অন্নদাচরণ জাঁকিয়ে হরির লুঠ দিলেন।

কিন্তু এবারে জাগ্রত হরিঠাকুর কিম্বা দক্ষিণা-লাভে প্রসন্ন কোন উপরওয়ালার সাধ্য নেই অন্নদাচরণের এই বেলেডাঙার চাকরি বজায় রাখবার। বাসিন্দাদের নোটিশ দিয়েছে, পনের দিনের মধ্যে এ অঞ্চল খালি করে দিতে হবে। মিলিটারি ছাউনি হবে, আর এরোড্রোম তৈরি হবে নাকি প্রশস্ত অনুর্বর ঐ মাঠের মাঝখানে। দেশ-বিদেশের মহাজন এসে গঞ্জে গদি করেছে, কত মাল মজুত, কত বিলেত বাকি—পনের বছরে যে কাজ-কারবার গুটিয়ে তোলা যায় না, পনের দিনের ভিতর তাই সমাধা করতে হবে। হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। জিনিসপত্র অর্ধেক দামে, তাঁর পর যতই দিন সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে—সিকি দামে—তারও কমে বিক্রি হতে লাগল। কিনবার লোক কোথায় ? শেষ অবধি রয়তো অনেক মাল বাঁওড়ের জলেই ঢেলে দিয়ে বিদায় হতে হবে।

স্টেশনে বড় ভিড়। স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো বিদায় হয়ে যাচ্ছে, দলের পর দল যেন শোভাযাত্রা করে স্টেশনে আসছে। কাচ্চাবাচ্চা মেয়েদের কোলে, দুটো-একটা তৈজসপত্র হাতে ঝুলানো, পুরুষদের বোঁচকাবুচকি মাথায়, ছেলেপুলেরা হাত-ধরাধরি করে আসছে—এমনি দৃশ্য অহরহ দেখা যাচ্ছে। সাত-পুরুষের ভিটা ছেড়ে চলেছে, কোথায় যাবে সঠিক জানা নেই। এখন আন্দাজ মতো কিছু পরিমাণ টাকা দিচ্ছে—পরে রেট অনুযায়ী পাইপয়সা অবধি ক্ষতি-

পূরণ দেওয়া হবে সরকারের তরফ থেকে। স্টেশনের লাগোয়া তুলসী মাড়োয়ারির যে পাটের গুদাম ছিল, সেইটে দখল করে সরকারি অফিস হয়েছে, টাকাকড়ি দেওয়া হচ্ছে সেখান থেকে। সুবিধা আছে, জিনিসপত্র বেচে যা পেয়েছে—তার সঙ্গে এই এখানকার পাওনা যোগ দিয়ে একেবারে টিকিট কিনে গাড়ি চেপে বস। গঞ্জের ওদিকে আর পিছন ফিরে তাকাবার কোন আবশ্যক নেই।

বেলা সাড়ে-দশটা থেকে তিনটে অবধি অবিরাম টাকা দেওয়া হচ্ছে, হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে কর্মচারীরা। অফুরন্ত নোটের তাড়া —সাধারণ লোকে সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। ভিতরের একটা ঘরের দিকে যাচ্ছে আর গোছা গোছা নিয়ে আসছে আনকোরা নূতন নোট, সর্ব্বপ্রথম এই মানুষের হাতে পড়ল। এমন ফর্শা যে খরচ করতে মায়া লাগে, ভাঁজ করে পরম যত্নে তুলে রেখে দিতে ইচ্ছে করে।

কেউ বা প্রশ্ন করে: নোট ছাপাবার কল বসিয়েছে নাকি ভিতরের ঘরে? এত দিচ্ছে, তবু শেষ হয় না? যাচ্ছে আর নিয়ে আসছে!

কে-একজন জবাব দিল: তাই। কল বসিয়েছে এখানে হোক কিম্বা আর কোথাও। এত নোট ছাপাচ্ছে যে কাগজে টান পড়ে গেছে, ছেলেপিলে হাতের লেখা লিখবার কাগজ পাচ্ছে না।

অন্নদাচরণ কোয়ার্টারের সামনে নিমতলায় পায়চারি করতে করতে তাকিয়ে দেখেন বহির্মুখী বিপুল এই জনস্রোত। বুকের অন্তঃস্থল অবধি আলোড়িত করে নিশ্বাস পড়ে, এতকাল পরে তাঁকেও বেলভাঙা ছাড়তে হবে এইবার। আর ক'দিন! থেকেই বা মুনাফা কি এখানে? এতদিন ধরে যা দেখে আসছেন, সমস্ত বদল হয়ে গেল। মিলিটারি এসে আড্ডা গাড়বে, ঘর-গৃহস্থালী নেই, মা-বাপ ভাই-বোন কেউ তাদের সঙ্গে নেই, কি করে

মানুষ মারা যায় তারই কায়দা শেখানো হবে এই জায়গায়। মারণাস্ত্রের বৃহৎ বিচিত্র ঘাঁটি তৈরি হবে, এরোপ্লেন এখান থেকে দেশদেশান্তর রওনা হয়ে হাস্যোৎফুল্ল জনপদ চক্ষের পলকে বোমার আগুনে ছাই করে দিয়ে আসবে।

মহীন একদিন বেলেডাঙার অফিসে এল। সঙ্গে বিশুষ্কমুখ স্থানীয় কয়েকটি প্রবীণ বাসিন্দা। নোটিশের মেয়াদ বাড়াতে হবে, মাস ছয়েক সময় চাই অন্তত। লড়াইয়ের প্রয়োজন—তা বলে নিরীহ নিরপরাধ শত শত পরিবারকে এমন আকস্মিক ভাবে পথে তুলে দেওয়া চলবে না। সরকারের দায়িত্ব আছে এদের সম্পর্কেও।

অফিসার মহীনের চেনা। হেসে তিনি বললেন, আপনাদের রায়গ্রাম এরিয়ার বাইরে পড়ে গেছে। আপনার খাদি-কেন্দ্র টিকে গেল। রায়গ্রাম আর আশপাশে চারিয়ে দিন না এদের কতক কতক। এক কাজ করুন, খাদির কাজে লাগিয়ে দিন। কতকটা তবু হিল্লে হবে বেচারাদের।

মহীন অগ্নিদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বলল, খাদির কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। যুদ্ধের নামে বেপরোয়া জবরদস্তি চলবে, আর চুপচাপ আমরা কেবল চরকা কেটে যাব, এই যদি ভেবে থাকেন তো ভুল করছেন মশায়।

রাগ করে সে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। স্টেশনে গিয়ে কলকাতার গাড়ি চেপে বসল।

কত ঘোরাঘুরি সহি-সুপারিশ। নূতন হাফসোল-করা জুতোজোড়ার প্রায় সুখতলা অবধি ক্ষয় হয়ে এল, কিছুমাত্র লাভ হল না। খবরের কাগজের অফিসে ধন্না দিল, কিন্তু এসব ব্যাপার ছাপতে কেউ রাজি নয়। আইনে আটকায়—যুদ্ধ-সম্পর্কীয় ব্যাপারের সমালোচনা চলবে না। আর দায়টাই বা কি, কর্তৃপক্ষের উপর আপাতত ওঁরা খুশি আছেন। কাগজের মাপ ঠিক করে দাম

বেঁধে দেওয়া হয়েছে, প্রতিযোগিতার প্রশ্ন নেই। দরাজ ভাবে সরকারি বিজ্ঞাপন আসছে, ছেপে বেরুতে না বেরুতে সমস্ত কাগজ বিক্রি হয়ে যায়। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার লোক-দেখানো দু-পাঁচ শ' কপি মাত্র ছাপেন, বাকি সাদা কাগজ চতুর্গুণ দামে চোরাবাজারে বিক্রি করে দেন—কাগজ ছেপে বের করার চেয়ে অনেক বেশি লাভ এই কারবারে। মোটের উপর কাগজওয়ালাদের আর্থিক অসুবিধা কোন দিক দিয়ে সরকার ঘটতে দেন নি। অতএব এই সব হাঙ্গামার ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে ওঁরা আখের খোয়াতে যাবেন কি জন্যে?

পুরাণো বন্ধুবান্ধব প্রায় কারও দেখা মিলল না। বেকার বিশেষ কেউ নেই, কোন না কোন কাজে ঢুকে পড়েছে। চন্দ্রা স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে সে তো মহীন জানে। একদিন কর এণ্ড কোম্পানির ক্যাবিনেট মেকার্স-এর দোকানে গিয়ে খোঁজ নিল—দোকান প্রায়ই আজকাল বন্ধ থাকে, মিলিটারি-কনস্ট্রাকসন জোর চলেছে, শশিশেখর অধিকাংশ সময় মফস্বলে থাকেন ঐ সব কাজকর্মের ব্যাপারে

রণক্ষেত্র বাংলাদেশ থেকে দূরে এখনো—কিন্তু রণ-দেবতার আসার সম্ভাবনায় ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন চারিদিকে, চোখের উপর সমস্ত ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে।

বেলেভাঙার মাঠ। চারিপাশের শস্যসমৃদ্ধ গ্রামগুলোর মধ্যে ধূ-ধূ করছে পতিত ডাঙা জমি। মাঠের উত্তর ধার দিয়ে একদা ভৈরব নদ নাকি প্রবাহিত ছিল। ভৈরব এখন অনেক দূরে সরে গেছে—পুরানো খাতের খানিকটা মজা-বাঁওড় হয়ে রয়েছে, বাকি নাবাল অংশে অল্প-সল্প ধানের ফসল হয়।

প্রাচীনেরা বলে থাকেন, গোটা মাঠটাই ভৈরবের গর্ভগত ছিল, মহাদেবীর আক্রোশে এখন নিস্ফল বন্ধ্যা মাঠ হয়ে রয়েছে। গল্প চলিত আছে এই সম্বন্ধে। বেলেডাঙা গ্রামের প্রাচীনতম বাসিন্দা সুবর্ণ-বণিকদের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ি, মহাদেবীর বিগ্রহ সমেত, ভৈরবনদ

গ্রাস করে। মায়ের সেবাইত অর্ধোন্মাদ তান্ত্রিক বামাচরণ চক্রবর্তী, উৎকট হাসি হেসে বলে বেড়াতেন, নিয়ে নিলি বটে কালভৈরব —কিন্তু টের পাবি, সামলাতে পারবি নে ক্ষেপিকে নিয়ে—হেনস্তাটা চেয়ে চেয়ে দেখব আমরা। বামাচরণ দেখে যেতে পারেন নি অবশ্য —তিনি গত হবার অনেক পরে দেখা গেল, তাঁর কথা ফলছে, চর পড়ে ভৈরব সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, নদীগর্ভে বালি জমেছে; গরুর-গাড়ি অবধি জলে নেমে অগভীর জলধারা স্বচ্ছন্দে পার হয়ে চলে যায়। আর ক্রোশ তিনেক দূরের মহিষখোলার খাল কুল ভেঙে উদ্দাম হয়ে উঠছে ক্রমশ। এখন মহিষখোলা আর খাল নয়—নদী। আর এখানকার এই অবস্থা—জলের চিহ্নও নেই কোন দিকে কোথাও, উত্তর ধারের ঐ পচা পাঁক ও পানায় ভরা বাঁওড়টুকু ছাড়া।

চাষ-আবাদ হয় না অতবড় বেলেডাঙার মাঠে—বাঁওড়ের প্রান্তে সামান্য একটু অংশ ছাড়া। মাঝে মাঝে বট ও অশ্বত্থগাছ, কুল ও শেয়াকুলের ঝুপসি জঙ্গল, শিয়ালকাঁটার হলদে হলদে ফুল ফুটে আছে। সম্প্রতি কিছু কিছু খেজুর-চারা লাগানো হচ্ছে। একমাত্র এই চাষটাই সফল হবে, অনুমান করা যাচ্ছে।

অনেক চাষা এ যাবৎ অনেক রকম চেষ্টা করে দেখেছে, কোন-কিছু কাজে আসে নি। খুঁড়তে গেলেই লাঙলের ফলায় চিকচিকে বালি বেরোয়। এ অঞ্চলে দালান-কোঠার কাজে যত বালির আবশ্যক হয়, সমস্ত এখান থেকে যায়। সেজন্য মাঝে মাঝে গর্তমতো হয়ে আছে। এবং লোক চলাচলও কিছু পরিমাণে দেখা যায় ঐ বালি তুলবার প্রয়োজনে।

সম্প্রতি কাঁটাতারে ঘিরে ফেলা হয়েছে বেলেডাঙার মাঠের চারি সীমানা। দেখতে দেখতে কংক্রিটের প্রশস্ত রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। স্টেশন থেকে এক অস্থায়ী রেল-লাইনও নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঐ অবধি। ছাই-রঙের ট্রাক সারবন্দি যাতায়াত করছে। লোহালক্কড়,

পাথরের কুচি, চুন-সুরকি, ইট-কাঠ-সিমেন্টের বস্তায় পাহাড় জমে উঠল। আজ যেখানে খেজুর-বাগান, দিন আষ্টেক পরে দেখ গিয়ে অ্যাসবেসটাসে-ছাওয়া বিশাল বাংলো উঠেছে সেই জায়গায়। ট্রেনে যাবার সময় মানুষ অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। পৌরাণিক ময়দানব একজন ছিল—এখানে পঁচিশ ত্রিশটা কনস্ট্রাকসন কোম্পানি দ্রুত কর্মিষ্ঠতার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে, শত শত ইঞ্জিনিয়ার, হাজার হাজার জোয়ানপুরুষ দিবারাত্রি খাটছে। একদিকে বাঁওড় আছে, আর তিনদিকে কাঁটাতারের বাইরে খাল কেটে ঘিরে ফেলা হয়েছে সমস্ত জায়গাটা। খালের সঙ্গে মহিষখোলার নাকি সংযোগ করে দেওয়া হবে, নূতন-কাটা খাল বারোমাস যাতে জলে ভরতি থাকে। দরকার হলে খালের উপরের পুলগুলো ভেঙে দিয়ে বেলেডাঙা এরোড্রোম স্থলপথে অনধিগম্য করে তোলা যাবে মুহূর্তের মধ্যে। আকাশ-আক্রমণ ঠেকানোর জন্যেও তোড়জোড়ের অন্ত নেই। অশ্বত্থগাছ-বটগাছের তলা থেকে বিমান-ধ্বংসী কামানের দীর্ঘ কালো নল আকাশমুখো উঁকি দিচ্ছে। আর ফাকা জায়গায় এখানে-ওখানে রাখা হয়েছে অনেকগুলো—সেগুলো সত্যিকার কামান নয়, তাল ও নারিকেলের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। ঠাট্টা করে লোকে নাম দিয়েছে 'ভেজিটেবল কামান'। রং করে এমন ভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে যে নিকট থেকেও আসল-নকলে তফাৎ ধরা যায় না। মতলব করেই ফাঁকা জায়গায় বসানো হয়েছে --উপর থেকে বোমা মারে তো মেরে যাক ঐগুলোর উপর, শত্রুর মৃত্যুবর্ষী আয়োজন নষ্ট হোক এমনি ভাবে।

এই দেখা যায়, জন-মজুরেরা খোঁড়াখুঁড়ি করছে এক জায়গায়। তারপরে ভিত দুরমুশ করছে, দেয়াল উঠছে, দেয়ালের উপর দিয়ে তক্তার ছাউনি—নিচে এত বাঁশ ঠেকনো দিয়েছে যে তার ভিতর দিয়ে একটা মানুষের পক্ষেও মাথা গলিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বিশাল পাত্রে সিমেন্ট আর খোয়া মাখা হচ্ছে, ভারে ভারে উপরে নিয়ে

তুলছে সেই মাথা-খোওয়া। অবিরাম কাজ চলেছে, পেট্রোম্যাক্স জেলে রাত্রেও কাজ হয়। হোটেল ও চায়ের দোকান খোলা হয়েছে এক খেজুর-বাগানের ভিতর। মানুষ-জন কাজের ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে খেয়ে আসে। বেলেডাঙা মাঠের শাপমুক্তি ঘটেছে এই যুদ্ধের ব্যাপারে, পোড়া মাঠে জনাকীর্ণ শহর জমে উঠল দেখতে দেখতে।

রায়গ্রাম দৈবাৎ রক্ষা পেয়ে গেছে, যেটা খাল ও কাঁটা-তারের সীমানার বাইরে—ঠিক লাগোয়া। বেলেডাঙার ঘর কুড়িক গিয়ে বসতি করেছে ঐ রায়গ্রামে। কাছাকাছি রইল—বেলেডাঙা যখন ছাড় পাবে, আবার গিয়ে তারা সাতপুরুষের ভিটায় উঠবে। আর আপাতত নূতন খালের এ ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ফেলে। তাদের ছেড়ে-আসা ভূমির উপর অচেনা মানুষের দল এসে কী তাণ্ডব শুরু করেছে!

অতিথি-অভ্যাগতও গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে। যা-হোক কিছু বন্দোবস্ত করতে পারলেই তারা চলে যাবে। খাদি-কেন্দ্র বন্ধ রয়েছে --কলকাতায় যাবার আগে বন্ধ করে গিয়েছে মহীন। সেই বাড়িতে বহু লোক আশ্রয় নিয়ে আছে—এখন আর তিল-ধারণের জায়গা নেই। নূতন যারা আসছে, আশ্রয়ের খোঁজে দূরের গ্রামে যেতে হচ্ছে তাদের। ঘর কেড়ে নেবার যাঁরা মালিক, ঘর কোথায় বাঁধবে --এসমস্ত বলে দেবার দায়িত্ব তাঁদের নয়।

ফিরে এসে মহীম অবাক হয়ে গেল। মাসখানেক কেটেছে ইতিমধ্যে। কলকাতা থেকে এলাহাবাদ গিয়েছিল। বম্বে অবধি ঘুরে আসবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সহকর্মীদের জরুরি চিঠি পেয়ে ফিরতে হল। ঘুরে ঘুরে তারও বিরক্তি ধরে গেছে। স্থানীয় বিপদের নিবারণ অসম্ভব, নিজেদেরই করতে হবে। চিঠি-পত্র লিখে পরামর্শ ও নির্দেশ পাবে বড় জোর—তার বেশি প্রত্যাশা নেই।

বেলেডাঙা স্টেশনে মহীন নামতে পারল না। স্টশেনে গাড়ি থামে এখনো, আগের চেয়ে বেশি সময় থেমে থাকে—কিন্তু ওঠা-নামা করে বিদেশি মানুষ। আর নানা ধরনের জিনিসপত্র, ঘর-ব্যবহারে তার একটিও প্রয়োজনীয় নয়। যুদ্ধ ব্যাপারে যারা লিপ্ত নয়, তাদের এখানে পদার্পণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। স্টেশন থেকে মাঠের ওধারে বুড়ো-হরিতলা নামক সুপ্রাচীন বটগাছটির চূড়া দেখা যাচ্ছে, কিন্তু নামতে হবে গিয়ে আট মাইল দূরে পরবর্তী স্টেশনে। সেখান থেকে পথঘাট নেই—মহিষখোলা নদী বেয়ে উল্টো মুখে অনেক দূর গিয়ে তারপর রাস্তা। ছ-সাত ঘণ্টা লেগে যায় সেই স্টেশন থেকে বাড়ি গিয়ে পৌছতে।

(১১)

শিশির তার মহকুমা-শহরে এসেছে। শহর নিশ্চয়ই। তিন তিনটে পাকা রাস্তা; আলো গোটা দশেক—তবে সেগুলো জ্বালা যাচ্ছে না সম্প্রতি কেরোসিন তেলের অভাবে।

পাড়াটা ভাল। পাশে সরকারি ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল। থানা আর কিছু এগিয়ে। বিশিষ্ট জনেরা একে একে এসে আলাপ-পরিচয় করে গেছেন। পশারওয়ালা উকিল শরৎ সামন্ত মশাই এসেছিলেন একদিন। পিছনে চাকরের হাতে প্রকাণ্ড এক মানকচু আর দুটো ইলিশমাছ। মানকচুটা বললেন ক্ষেতে ফলেছে, ইলিশমাছ পুকুরের কিনা, তা কিছু বললেন না।

সকলের শেষে এলেন সেরেস্তাদার নিবারণ পালিত। লম্বা রোগা মানুষটি—কাঁচা-পাকা দাড়ি, 'হুজুর' ছাড়া কথাই বলেন না, কথায় কথায় হাতজো ড় করেন। শিশিরের লজ্জা করে, আবার কৌতুকও লাগে। এসেছেন তো এসেছেন—উঠবার নাম নেই। রক্ষা এই, সেদিন কোর্ট বন্ধ। ভদ্রলোক তাই নিশ্চিন্তে গল্প করতে পারছেন। একুশ বছর চাকরি হয়েছে, কত হাকিম পার করেছেন

—সবাই খুশি তাঁর উপর, সবাই সাধুবাদ করেছেন। ছেলে ডাক্তারি পাশ করে লড়াইয়ে গিয়েছিল, জাপানিদের হাতে ধরা পড়েছে সিঙ্গাপুরে—তাহার আর তার কোন খবরাখবর পাচ্ছেন না, এই এক বিষম মনোকষ্টে আছেন। সন্তানের মধ্যে আর একটি মেয়ে—কাজল। বিয়ে হয় নি, দিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু দিনকে-দিন যে অবস্থা হয়ে উঠছে, কবে যে চারিদিক ঠাণ্ডা হবে! ঠাণ্ডা হলে আর ছেলেটা ফিরে এলেই কাজলের বিয়ে দেবার বাসনা।

সুদীর্ঘ জীবনের অতীত ও বর্তমান সকল খবর শুনিয়ে শেষ না করে ভদ্রলোক উঠবেন না বোধ হচ্ছে। এক সময়ে একটু অধৈর্য হয়ে শিশির বলল, ওসব যাক। কি কি এখানে দেখবার আছে বলুন দিকি। চন্দ্রাকে নিয়ে দেখে বেড়াই এক একটা ছুটির দিনে। ওর খুব উৎসাহ ঘোরাঘুরির ব্যাপারে।

নিবারণ নড়েচড়ে আবার জেঁকে বসলেন। বলতে লাগলেন, আপনার আগে এখানে ছিলেন লাহিড়ি সাহেব। তিনিও ঐ বলতেন। তাঁর আবার সখের ক্যামেরা ছিল—ছবির অ্যালবাম দেখাতেন আমাদের। দু-বছর ছিলেন, তা একখানাও ছবি নিয়ে যেতে পারেন নি এখান থেকে। এ হল ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর জায়গা হুজুর, এখানে আবার দেখবার জিনিস! চাতরার বিল আছে, দেদার ধানক্ষেত রয়েছে—দেখুনগে যান কত দেখবেন। ক্ষেতে বসে নিড়ানি দিচ্ছে পেট-মোটা পিলে-রোগা চাষাভূষোর দল—উঠে দাঁড়াতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

চন্দ্রা রহস্যভরা চোখে চেয়ে বলে, আছে—আছে একটি দেখবার। আপনি বলছেন না, চেপে যাচ্ছেন। আমি খবর রাখি।

আছে—কি আছে? সেরেস্তাদার একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ওঃ, চণ্ডেশ্বর মন্দিরের কথা বলছেন। কিন্তু মন্দির নয় এখন আর—ইটের স্তূপ। কেউ যায় না। পুরুত ছিল আমাদেরই পাড়ার চক্কোত্তিরা। তারা নির্বংশ। বিছুটি আর কাঁটাঝিটকের জঙ্গল

বিগ্রহকে ঘিরে ফেলেছে, গোখরা সাপ ছা বাচ্চা নিয়ে ঘরকন্না করছে তার ভিতর।

চন্দ্রা বলে, মন্দির-টন্দির দেখতে কি মন আসে এখন? সে বয়সের দেরি আছে, কি বল? বলে হেসে সে শিশিরের দিকে চাইল।

সেরেস্তাদার বললেন, আর এক আছে খালের উপরে নূতন পুল। তা-ও তো শেষ হয় নি, কাজ চলছে। আগে কালভার্ট ছিল, তাতে বিলের জল-নিকাশ হত না। লাহিড়ি সাহেবকে ধরে অনেক লেখালেখির পর এদ্দিনে রেল কোম্পানির টনক নড়েছে।

চন্দ্রা মিটিমিটি হাসছে দেখে মনে মনে একটু গরম হয়েই তিনি বললেন, দেখবার জিনিস আর কিছু নেই, আমি হলপ করে বলছি মা-লক্ষ্মী।

জিনিস নয় সেরেস্তাদার বাবু, মানুষ। হাসি থামিয়ে শান্ত-স্মিত মুখে চন্দ্রা বলল, গঙ্গেশচন্দ্র পাল থাকেন না এখানে? কাগজে পড়েছি, এখানেই তো তাঁর বাড়ি।

বুড়ো সেরেস্তাদার ঘাড় নাড়লেন: গঙ্গেশ—কই গঙ্গেশচন্দ্র বলে তো কেউ···কি করে বলুন তো লোকটা?

আর্মেনিটোলার এক ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়েছিলেন। দু-বছর পরে ধরল তাঁদের। স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে বিচার হল—

না না মা-জননী, ভুল হয়েছে আপনার। সে সব এ জায়গায় নয়। ছা-পোষা মানুষ, শাক-চচ্চড়ি-ভাতখায়—ম্যালেরিয়ায় ভোগে, রিভলভার ছোঁড়াছুঁড়ির তাকত নেই কারো এখানে।

ঘাড় নেড়ে অধীরভাবে চন্দ্রা বলে, আছেন। আমার বাবা ছিলেন সেই ট্রাইবুন্যালের মধ্যে। আমার বাবা রায় বাহাদুর নৃসিংহ হালদার—নাম শুনে থাকবেন। গঙ্গেশ বাবুকে ঠেসে দিয়েছিলেন অবশ্য আট বছর, কিন্তু বাড়িতে আমাদের কাছে কত

যে প্রশংসা করেছেন।

প্রশংসা না করে উপায় থাকে না, যেন জবরদস্তি করে প্রশংসা টেনে বের করে। যে জজ ফাঁসিতে লটকায়, প্রশংসায় তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে সিপাহিরা টেনে হিঁচড়ে কাঠগড়ায় তোলে, তারা পর্যন্ত চুপি-চুপি নিজেদের মধ্যে সগৌরবে এদের কথা বলাবলি করে।

নৃসিংহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন : অনুতপ্ত তুমি ?

বয়স কম, তার উপর যে রকম কষ্ট পেয়েছে—কানে শুনলেই গা শিরশির করে ওঠে। শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে। নৃসিংহ তাই বুঝি কোন একটা অজুহাতে গঙ্গেশের শাস্তি লঘু করে দিতে চান। বললেন, কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে থাক তো বলো—

গঙ্গেশ ঘাড় নেড়ে বলল, হাঁ—

দলের আর দু-জন আসামি কটমট করে তার দিকে তাকাল। গঙ্গেশ বলতে লাগল, বড্ড অনুতাপ হয় সত্যি আমার। আসল সময়টা হঠাৎ কী রকম হল—হাত নড়ে গিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল সাহেবটার কানের পাশ দিয়ে।

আট বছরের জন্য অগত্যা তাকে দিতে হল জেলে ঠেসে।

রিটায়ার করবার পরে তপোবনে পূর্ণবিলুপ্ত হবার পর্যন্ত নৃসিংহ এইসব ধরনের কত গল্প করেছেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে!

চন্দ্রা বলে, গঙ্গেশ বাবুর বাড়ি তো এখানেই। খবরের-কাগজে দেখেছি, আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সেরেস্তাদার ঊর্ধ্বমুখে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

মনে পড়ল না? ভেবে দেখুন, তিন বছর হল জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

তিন বছর—না? হয়েছে। হঠাৎ নিবারণ যেন অকুল-সমুদ্রে কূল দেখতে পেলেন।

হয়েছে, হয়েছে। ঘুলো-গঙ্গুর কথা বলছেন মা-লক্ষ্মী। তা কি করে জানব বলুন যে, খবরের-কাগজে ওর নাম হয়েছে গঙ্গেশচন্দ্র—ঐ লোক এত কাণ্ড করে এসেছে কোনখানে। জেল-ফেরত না জেল-ফেরত—কতই তো জেল থেকে বেরুচ্ছে। কার দায় পড়েছে, কে মুখস্থ করে বসে থাকে বলুন দাগিগুলোর নাম?

চন্দ্রার করুণা হয় আদালতজীবী এই এঁদের উপর। শুধু নথি আর ফাইল, আরজি আর আমলান-খরচা। বাঁ-হাতখানা স্বয়ংক্রিয় নিখুঁত এক যন্ত্রবিশেষ। চেয়ারের হাতার তল দিয়ে পাতাই আছে। সিকি-আধুলি কিছু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেটা মুঠো হয়ে এসে পকেটে ঢোকে। আবার তখনি ফিরে এসে যথাস্থানে প্রসারিত হয়। কী-ই বা খবর রাখেন, এঁদের কাছে কি প্রত্যাশা করা যায় এই ছাড়া?

এরই দিন চারেক পরে। সন্ধ্যার একটু আগে শিশির কোর্ট থেকে ফিরল। গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যেতে বলে ফটকের সামনে নেমে পড়েছে। এইটুকু হেঁটে আসছে। কম্পাউণ্ডে ঢুকে ড্রয়িংরুম অবধি দু-ধারে ফুলবাগান। মালী ফুল জড় করে তোড়া বাঁধছে, আর একটা লোক বিড়ি টানছে তার পাশে উবু হয়ে বসে। শিশিরকে দেখে লোকটা বিড়ি ছুঁড়ে দিয়ে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল। মালী এসে একটা তোড়া দু-হাতে সসম্ভ্রমে এগিয়ে ধরল। একবার দু'বার গন্ধ শুঁকে প্রসন্ন মনে শিশির চলেছে। চন্দ্রাকে তোড়াটা দেবে। কাজকর্মের একটুখানি অবসর এইবার। বেশিক্ষণ নিরিবিলি থাকতে দেবে না অবশ্য—তবু যেটুকু ফাঁক কাটাতে পারে, চন্দ্রার সঙ্গে থাকতে চায়। চায়ের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে রাখাল অন্য কাজে চলে যায়, চা খায় এই সময় দু'টিতে বসে বসে। চন্দ্রার প্রদীপ্ত যৌবন ঝিকমিকিয়ে ওঠে মনোরম অঙ্গ-হিল্লোল, মুখের হাসিতে, বেশভূষায়, চা ঢালবার সময় চুড়ির মৃদু শিঞ্জিনীতে। লাহিড়ি সাহেব নাকি কোর্ট থেকেই সোজা ক্লাবে টেনিস খেলতে যেতেন। শিশির

বেরোয় না।

বারাণ্ডায় উঠে শিশির টের পেল, বিড়িখাওয়া সেই লোকটা তার পিছন পিছন এসেছে?

কি চাই তোমার?

হুজুর আমাকে দেখতে চান, শুনলাম—

তোমাকে? কে তুমি?

আমার নাম—

বিরক্ত দৃষ্টিতে শিশির তাকিয়ে আছে দেখে সে থতমত খেয়ে গেল, তারপর মরীয়া হয়ে যেন বলে ফেলল, আমার নাম শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র পাল—

ফিরে দাঁড়াল শিশির, আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখল। ঝুলে-পড়া ঠোঁটের পাশ দিয়ে কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে এসেছে—পানের ছোপে রাঙা। কিন্তু বাহার আছে লোকটির। গিলে-করা পাঞ্জাবি, চাদর চড়িয়েছে তার উপর। চুল ফাঁপিয়ে এলবার্ট-টেড়ি কাটা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো—ছেঁড়া জুতো, কিন্তু টাটকা খড়ি-মাখানো। মুখেও পাউডার জাতীয় কি মেখে এসেছে, সাদা সাদা গুঁড়ো উড়ছে ছাইয়ের মতো। ঘোর বিনয়ীও বটে—এত ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে যে মুখ দেখা যায় না ভাল মতো।

শিশির বলল, গঙ্গেশচন্দ্র অর্থাৎ—

অর্থ শোনাবার অপেক্ষায় না থেকে লোকটা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি—আমিই। সেরেস্তাদার বাবু বলে দিলেন এসে দেখা করে যেতে।

এই লোকের প্রশংসা নাকি তার শ্বশুরের মুখে ধরে না। নিঃসংশয় হবার জন্য তবু শিশির জিজ্ঞাসা করে, আর্মেনিটোলার কেসে পড়েছিলেন—আপনিই?

ভয়ে ও লজ্জায় কেমন হয়ে পড়ল গঙ্গু। বলে, কাঁচা বয়স তখন হুজুর। যে যেমন বোঝাত, তাতেই নেচে উঠতাম। বলল, ইংরেজ

তাড়াতে হবে—লেগে গেলাম। তার প্রায়শ্চিত্তও হয়েছে। তবু তো রক্ষে, কেউ ঘায়েল হয় নি আমার হাতে, কোন ক্ষতি হয় নি। হাতে-কলমে ঘোরতর কিছু ঘটবার আগেই ধরা পড়ে গেলাম। নয় তো ঝুলিয়ে দিত, বেরিয়ে আর আসতে হত না।

সাড়া পেয়ে চন্দ্রা পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল। শিশির বলে, এই যে—ইনিই হলেন তোমার গঙ্গেশ মহারাজ। মিষ্টিমিঠাই কি খাওয়াবে খাওয়াও। ফুলের মালা দিতে চাও তো বলে পাঠাও মালীকে। বলে সে পোশাক ছাড়তে চলে গেল।

আপনি? চন্দ্রা আশ্চর্য হয়ে তাকাল।

আজ্ঞে। বড্ড কষ্টের মধ্যে আছি। জেল থেকে মার্কা-মারা হয়ে এসেছি, চাকরি-বাকরি কেউ দেয় না। রেলের পুল হচ্ছে, সেখানে লেবার-সুপারভাইজারের কাজ করছি। পঁয়ত্রিশ টাকা করে পাই। কিন্তু সে আর ক'দিন—দু-মাস কি আড়াই মাস বড় জোর। আপনি স্মরণ করেছেন শুনে বড্ড আশা করে এসেছি।

কাতর দৃষ্টি তুলে অসহায়ভাবে সে চন্দ্রার দিকে চাইল। বলেত, সেরেস্তাদারবাবুর কাছে জানতে পারলাম—মহাফেজখানায় একটা কি কাজ খালি আছে। আপনি যদি হুজুরকে একটু বলে-কয়ে দেন—

সত্যি কথাই সেদিন সেরেস্তাদার বলেছিলেন। গঙ্গেশ আর নেই—এই গঙ্গু আছে, নুলো। বাঁ-হাতখানা সন্তর্পণে চাদর-ঢাকা দিয়ে এসেছে।

চন্দ্রা বলে, আপনার ঐ হাত নাকি শুনতে পাই পুলিশে মুচড়ে দিয়েছিল?

এদিক-ওদিক চেয়ে সভয়ে গঙ্গু বলল, সে কি কথা! আমি তো কখনো বলি নি। ওঁরা মোচড়াতে যাবেন কেন? ছাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়, শেষটা কেটে ফেলতে হল।

যাবার সময়—হাত জোর করবার ক্ষমতা নেই, নুলো-গঙ্গু বাঁ-

হাতের উপর ডান হাত এনে যুক্তকরের ভঙ্গিতে বলল, চাকরিটা পাই যেন, দেখবেন।

চন্দ্রার চোখে জল এসে যায়। সেই মানুষ এই হয়েছে! এদেরই ভরসা করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের আয়োজন হচ্ছে। কত বড় দুর্বহ দুঃখের বোঝা বয়ে কতজনের মেরুদণ্ড ভেঙে এমনি ভাবে চুরমার হয়েছে!

(১২)

চন্দ্রা চিঠি লিখছে :

ভাই যূথী, এসো না এই জায়গায়, কয়েকটা দিন বেড়িয়ে যাবে। দু-জনে গল্প করে আর প্রাণখোলা হাসি হেসে বাঁচব। হাকিম সাহেব কোর্টে বেরিয়ে গেলে খবরদারি করবার কেউ থাকে না। এত কম্পাউণ্ডের একেশ্বরী তখন আমি।

জায়গাটা চমৎকার। আসবার আগে ভয়-ভয় করত, এখন সত্যি ভারি ভাল লাগছে। দিন দুই-তিন ইতিমধ্যে বৃষ্টি হয়ে গেল। আমাদের কোয়ার্টারের পিছনে দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠ—ধানকাটার পর এসেছি আমরা। পরিত্যক্ত মাঠ ধু-ধু করত, ক'দিন দেখছি আউশ-ধানের সবুজ অঙ্কুর বেরিয়েছে সেখানে। মাঠের ভিতর দিয়ে সরু রেলপথ চলে গেছে। উনি কোর্ট থেকে ফিরলে, লনে চায়ের টেবিল সাজিয়ে দু-জনে বসি, হুস-হুস করে সেই সময় সাড়ে-পাঁচটার গাড়ি চলে যায়। দেখতে দূর থেকে ভারি মজা লাগে, হাসি পায়—যেন ছোটদের খেলনা-গাড়ি। একটা খাল চলে গেছে ঐ মাঠের ভিতর দিয়ে—একটুখানি এঁকে বেঁকে এসে গেছে যে টিলার উপর আমাদের কোয়ার্টার, ঠিক তার নিচেটায়। ওকে বলি, একটা বোট তৈরি করাও—অবসরমতো বেড়ানো যাবে। বলে, অবসর কোথা—চব্বিশ ঘণ্টার গোলাম যে আমি সরকারের আর জনসাধারণের। মিথ্যে নয় ভাই, একটুও অতিরঞ্জন নেই এর মধ্যে। মহকুমা-হাকিমি

যে কি মহা ব্যাপার এসে চোখে না দেখলে যূথী, ধারণায় আনতে পারবে না। সকাল থেকে কত মানুষের কত ধরণের কাজ ও অকাজ, তার গোণাগুণতি নেই। ও যেন এই ছোট শহরটার সার্বভৌম সম্রাট্ হয়ে বসেছ। অতিমানব না হলে এত রকমারি ক্ষেত্রে এমন দক্ষতা প্রত্যাশা করা যায় না। ঘটি-চুরির বিচার থেকে খেয়া-পারানির রেট ঠিক করে দেওয়া পর্যন্ত। হরি-সভা থেকে সাহিত্য-সভার সভাপতিত্ব করা। ঈদ-অন্নপ্রাশন কোন নেমন্তন্নই বাদ পড়ে না আমাদের।

অনেক ঝুঁকি আমাকেও সামলাতে হয়। সম্প্রতি এখানকার মহিলা-সমিতির প্রেসিডেণ্টে নির্বাচিত হয়েছি। আমার নিজস্ব কোন কৃতিত্বের জন্য নয়—এটা বাঁধাধরা রীতি, মহকুমার স্থাপনা অবধি বরাবর এইরকম হয়ে আসছে। সেদিন সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হল, রাজসিংহাসন গোছের এক উঁচু চেয়ারে আমাকে বসিয়ে আমার ঠাকুরমার বয়সি গিন্নিরা তটস্থ ভাবে পায়ের গোড়ায় এসে বসতে লাগলেন। খালি-হাতে কেউ আসছেন না, মালা বা তোড়া নিয়ে আসছেন। মালার বোঝায় মুখ ঢেকে গেল, দম আটকে আসে। আর একের পর এক উঠে দাঁড়িয়ে এত গুণের ফিরিস্তি শোনাচ্ছেন যে কলকাতার কোন শিক্ষিত প্রতিষ্ঠানে এমনি ঘটলে লজ্জায় যেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতাম কিন্তু হাকিম-গিন্নি হয়ে এবং স্থানের মাহাত্ম্যে আমার এসব অভ্যাস হয়ে আসছে। তাই পাক্কা সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পরম ঔদাস্যে বসে রইলাম, নানা বয়সের অন্তত পনেরটি মহিলা প্রবন্ধে কবিতায় গানে আমার নির্গলিত প্রশংসা দু-কানের ভিতর দিয়ে অবিরাম স্রোতে ঢালতে লাগলেন। বিশ্বাস কর, একটা কথারও আমি প্রতিবাদ করি নি, সঙ্কোচের এতটুকু ছায়া ফোটে নি মুখের উপর। ন্যায্য পাওনা আদায় করে উত্তমর্ণের যেমন কোন রকম কৃতজ্ঞতার কারণ ঘটে না, এসব ক্ষেত্রে তেমনি একটা নিরাসক্তি বজায় রাখি আমার আলাপ-আচরণে। যাঁরা সরকার-ঘেঁসা, এমনি সব অনুষ্ঠানের

খসড়া তৈরি করা থাকে তাঁদের। স্তোত্র লিখিয়ে মুখস্থ করেও রাখেন কেউ কেউ বক্তৃতায় লাগাবার জন্য। বদলি হয়ে যে-কেউ এখানে আসেন, ঐ একই কথা এঁরা শুনিয়ে থাকেন নাম ধাম ইত্যাদি যথোচিত রদবদল করে। এটা চিরাচরিত প্রথা—যতদিন না হাকিম সাহেব রিটায়ার করেছেন, অনুমান করি এই রকম শুনতে হবে নতুন যে যে জায়গায় যাব।

কেমন আস্তে আস্তে সকলের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি, তাই ভাবি। রাগ কোরো না ভাই—তোমারই কাছাকাছি চলে যাচ্ছি। এমন ছিলাম না কোন দিন, কত বিতৃষ্ণা ছিল এই ধরনের জীবনের উপর। অন্তত মুখে আর কাগজে-কলমে সদম্ভে তাই প্রচার করে এসেছি। তবু বিস্মিত হয়ে যাই, কেমন নিরাপত্তিতে এই জীবন মেনে নিচ্ছি। এতে আমার অপরাধ নেই, করবারও কিছু নেই। অন্যথা কিছু করতে গেলে লোকে বলবে পাগল। মুখে কিছু হয়তো আপাতত বলবে না, কিন্তু ব্যঙ্গ ও উপহাসের দৃষ্টিতে তাকাবে। ওর সঙ্গে সেদিন কথাবার্তা হচ্ছিল এই সব। এখন অবস্থাটা যত বিসদৃশ লাগছে, দু'দিন বাদে গা-সহা হয়ে গেলে তেমন আর ঠেকবে না। অনবরত তোষামোদ শুনতে শুনতে নিজেকে ক্রমশ অত্যধিক উঁচু বলে ভাবতে শুরু করব। স্বভাবতই মন হয়ে উঠবে স্পর্শকাতর, সামান্য অনাদর ক্ষিপ্ত করে তুলবে।

এই সব আলোচনা তুমি এলে বিস্তৃতভাবে হতে পারবে। তোমায় নিমন্ত্রণ করছি, রাজত্ব দেখে যাও আমাদের। আর রাজ্যের সম্রাজ্ঞী যিনি, লোকের ভিড়ের মধ্যেও নিয়ত তিনি নিজেকে একা মনে করছেন—এই অবিশ্বাস্য খবরটা গোপনে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি ভাই। আর একটা জবর খবর আছে, মহাবিপ্লবী গঙ্গেশচন্দ্র পালকে সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম। মহাফেজখানার একটা চাকরির দরবারে তিনি এসেছিলেন। বীর গঙ্গেশচন্দ্র ন্যালো-গঙ্গ হয়ে গেছেন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে।

সংগ্রাম

(১)

বৃটিশ-শাসন ও শোষণের অবসান চাই। 'ভারত ছাড়ো'— দেশ জুড়ে এই দাবি। এতে আমাদের ভাল, তোমাদেরও। মিত্রশক্তির এতে যুদ্ধ-জয়ে সাহায্যই হবে। বিদেশি শাসন আমাদের পঙ্গু করে ফেলেছে, আত্মরক্ষায় অক্ষম আজ আমরা। এত বড় বিশ্ব-সংগ্রামের মধ্যে বিশাল ভারতবর্ষ নিষ্কর্মা দর্শক মাত্র।

স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য চীন ও রাশিয়া প্রাণান্তক সংগ্রাম করছে, অবস্থার তবু ক্রমাবনতি ঘটছে। যুদ্ধ ব্যবস্থায় আগাগোড়া গলদ, এ নীতি পালটাও তোমরা। সাম্রাজ্য আজ তোমাদের অভিশাপ হয়ে উঠেছে—এ তোমাদের শক্তি দান করছে না। নিরক্ষেপ বিচারে তোমরা পরপীড়ক, দুর্বলের সর্বস্বাপহারক। বিশ্ব-সমস্যায় ভারতবর্ষ আজ জটিল গ্রন্থি হয়ে উঠেছে। ভারতের মুক্তিতে এশিয়া-আফ্রিকার নিষ্পিষ্ট পদানত সকল জাতি নব উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, পৃথিবীর নূতন রূপ ফুটবে।

অতএব বৃটিশ শক্তি অবিলম্বে ভারত ছেড়ে বিদায় হও যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে তোমাদের সুবুদ্ধির উপর।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলে, তার অপরিমিত সম্পদ ও বিপুল জনশক্তি, পৃথিবীর অন্যায়-বিদূরণে নিয়োগ করবে। সকল পদপিষ্ট জাতি মাথা তুলে বন্ধুরূপে তোমাদের পাশে দিয়ে দাঁড়াবে। শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ তোমাদের কলঙ্কস্বরূপ—কলঙ্কামুক্ত হয়ে উন্নতশীর্ষে দাঁড়াও আজ বিশ্বের ন্যায়-বিচারের সামনে।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেহাই পাবে না এবার। সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্যই তোমাদের এই যুদ্ধ। বিপাকে পড়ে বড় বড় বুলি কপচাচ্ছ, ও-সব ভাঁওতা। দুর্দিন কেটে গেলে আবার নিজমূর্তি ধরবে। পৌনে দু-শ বছরে ভাল করে চিনেছি, জনগণের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই তোমাদের উপর। শুধু মাত্র পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই কোটি কোটি নরনারীকে নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবে যুদ্ধের চেহারা তারা বদলে দেবে এক মুহূর্তে।

কংগ্রেস তাই ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে সুদৃঢ় দাবি জানাচ্ছে, ভারত ছাড়ো তোমরা। শাসক রূপে থাকা চলবে না স্বাধীনতা ঘোষিত হোক, স্বাধীন-ভারতের আতিথ্য হয়তো পাবে তখন বন্ধুভাবে। নূতন বীর্যে উদ্দীপ্ত ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় তা হলে মুক্তি-যুদ্ধের দুঃখ-দাহনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রধান প্রধান দল ও গোষ্ঠীর সহায়তায় অস্থায়ী গবর্নমেন্টের প্রথম কর্তব্য হবে, দেশ রক্ষা করা। অহিংস ও সশস্ত্র শক্তি একত্রিত করে শত্রুর সামনে আমরা অটল পাহাড়ের মতো দাঁড়াব। চাষী ও শ্রমিক সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পাবে, প্রধানত তাদেরই কর্মচেষ্টার উপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। গণপরিষদ গড়া হবে—সেই পরিষদ সকল শ্রেণীর গ্রহণীয় আমাদের সুদীর্ঘ কালের আকাঙ্ক্ষিত এক নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করবে। আমরা চাই, সংযুক্ত-গবর্নমেন্ট—যার অধীনে প্রতিটি অঞ্চল যত অধিক সম্ভব স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পাবে। সংযুক্ত-গবর্নমেন্টের সামান্য ক্ষমতা ছাড়া বাকি সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে আঞ্চলিক গবর্নমেন্ট।

আমরা চাই বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘ—যা প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবে, এক জাতির উপর আর এক জাতির শোষণ ও আক্রমণ-চেষ্টায় বাধা দেবে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করবে, নিখিল-পৃথিবীর সকল সম্পদ অবারিত করে দেবে সর্বমানুষের সুখ ও শান্তিবিধানের জন্য। সৈন্য আর অস্ত্রসজ্জা তখন নিরর্থক হয়ে

উঠবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে। বিশাল একটি বিশ্ব-রক্ষীবাহিনী থাকবে—এই বাহিনী জগতের শান্তি বিঘ্নিত হতে দেবে না। স্বাধীন-ভারতবর্ষ এই বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘে যোগ দিয়ে সাম্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

চীন ও রাশিয়ার আত্মরক্ষা-প্রচেষ্টা কোনক্রমে ব্যাহত না হয়, পশু-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়—এ সম্পর্কে অবহিত আমরা। ভারত স্বাধীন হলে এ বিষয়ে ধারণাতীত সাহায্য হবে।

আমাদের কথা এই পরম সঙ্কট-সময়ে অনেকবার জানিয়েছি তোমাদের। খোলা-মনে কোনো জবাব দাও নি। বরঞ্চ এমন সব উক্তি করেছ যে তোমাদের প্রভুত্বলিপ্সা ও আত্মম্ভরিতা প্রকট হয়ে পড়েছে তার ভিতর থেকে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-গর্বে গর্বিত বিশাল এই জাতির পক্ষে তোমাদের ঔদ্ধত্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বিদায় হও তোমরা। সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়, আর দেশীয় রাজাদের সম্পর্কে দুশ্চিন্তার হেতু নেই। নূতন সূর্য উঠছে—কৃত্রিম বিভেদের কুয়াশা স্বাধীনতার আলোয় মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে।

তোমরাই আমাদের আত্মবিরোধ আর অনৈক্য দূর হতে দিচ্ছ না। তোমাদের উপস্থিতিই জাপানকে ভারত-আক্রমণে উত্তেজনা দিচ্ছে। জাপানকে চাই নে, চাই নে, চাই নে আমরা। জাপানিদের সাহায্য নিয়ে তোমাদের তাড়ানো—ব্যাধির চেয়ে ওষুধই মারাত্মক হবে সে ব্যবস্থায়। তোমরা ভারত ছাড়লে জাপানের সঙ্গে দু-কথায় মিটমাট হয়ে যাবে। আর আমাদের যে নিদারুণ ঘৃণা আছে বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে, তা-ও বিদূরিত হবে সঙ্গে সঙ্গে।

যুদ্ধ-ঘোষণার সময় ভারতের মত নিয়েছিলে কি? হুকুমের তাঁবেদার আমরা—হুকুম করেছ, সর্বসম্পদ অমনি উজাড় করে ঢেলে দিতে বাধ্য হচ্ছি। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে এগুব কি—আমাদের বড় লড়াই যে তোমাদেরই সঙ্গে।

বিশ্ব-মুক্তির জন্যই বিশেষ করে আজ ভারতের মুক্তির প্রয়োজন। পদানত ভারতবর্ষ নিজ স্বার্থ ও মানবতার আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে পরছে না। এই জাতীয় অবমাননার অবিলম্বে অবসান চাইছি। সুদীর্ঘ সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে অশেষ ত্যাগ ও লাঞ্ছনার মূল্যে জাতি অমিত শক্তি অর্জন করেছে, গণ-আন্দোলনের মধ্যে সেই শক্তি প্রকট হবে। নেতৃত্ব-ভার এবারও সেই ত্রিসপ্ততিতম বয়স্ক গান্ধিজীস উপর ···

৮ আগস্ট, ১৯৪২। প্রহর দেড়েক রাত্রে বম্বের গর্জমান সমুদ্রপ্রান্তে দুর্যোগ-মথিত ভারতবর্ষ সংগ্রাম সংকল্প গ্রহণ করল। অহিংসাই এ সংগ্রামের নীতি। এমন সময় আসবে যখন নেতার আদেশ জনগণের কাছে পৌঁছবার উপায় থাকবে না। তখন দেশের প্রতিটি নরনারী হবেন নেতা। পথ-প্রদর্শক হয়ে বন্ধুর পথে তাঁরাই সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। বিশ্রামের অবকাশ নেই, দুর্বার অবিচ্ছিন্ন এবারের এই পথ। পথের শেষ এসে পৌঁছেছে লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে আর তাদের মানসস্বপ্নে অনুরঞ্জিত স্বাধীন সুস্থ স্বচ্ছন্দ ভারতবর্ষে।

প্রত্যুষের আলো ভাল করে ফুটবার আগেই সারা ভারতের কারাগারের দরজা খুলল। একটা মানুষ আর বাইরে রাখা চলবে না—যার উঁচু মাথা নিচু করা যায় না তেতো বা মিষ্টি সরকারি ব বস্থায়।

১৮৫৭—তারপর এই ১৯৪২। হিমালয়ের প্রত্যন্ত থেকে দক্ষিণের নীলাম্বু-বিস্তার অবধি সর্বত্র আগুন লেগেছে। নেতা নেই-সংগঠন নেই, উদ্যোগ-আয়োজন নেই, সুদূর গ্রামান্ত অবধি তবু যেন বিনা তারে খবরাখবর হয়ে গেল। নেতা হলাম তুমি আমি সকলেই। জন-সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে—এ তরঙ্গ রোধ করবে কার সাধ্য ?

(২)

হঠাৎ যেন সব বদলে যাচ্ছে। চারিদিকে রহস্যময় থমথমে ভাব। উদ্বেগে শিশির সারারাত ঘুমুতে পারে না।

চন্দ্রার কষ্ট হচ্ছে শিশিরের মুখ দেখে। প্রবোধ দেয় দূর—কী যে অত ভাবো! এ জায়গায় কিছু হবে না। খবরের-কাগজটাই পড়ে না এখানকার কেউ। গঙ্গেশকে দেখেছ তো—সেই মানুষের ঐ অবস্থা, অন্য সবাই কি রকম বুঝে নাও ওর থেকে।

শিশির বলে, উঁহু, বেয়াড়া গোছের খবর আসছে।

কি ?

আট টাকা করে চালের মন—তার উপর চাল বাইরে চালান হয়ে যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে এই নিয়ে শলাপরামর্শ হচ্ছে নাকি খুব।

চন্দ্রা তার দুর্ভাবনা উড়িয়ে দিতে চায়। হোক গে। নির্বিষ ঢোঁড়া এই চাষাভুষোর দল। আটের জায়গায় আশি হলেও না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, ফণা তুলে কেউ দাঁড়াবে না। তুমি দেখো।

ভরসা দিচ্ছে, কিন্তু চন্দ্রার অন্তর আলোড়িত করে নিশ্বাস পড়ে, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়।

সন্ধ্যার পর সেরেস্তাদার নিবারণ চুপি-চুপি এসে ঐ সম্পর্কে মুলো-গঙ্গুর নামটাও বলে গেলেন। সেকালের দুর্বুদ্ধি আবার বুঝি তার মনে পাক দিয়ে উঠছে। সকালবেলা উঠে শিশির দেখে আর এক কাণ্ড। বাড়ির সামনে চুণকাম-করা ঝকঝকে দেয়ালের উপর কয়লার বড় বড় অক্ষরে লিখে গেছে—'সরকারি গোলাম'।

মতলব কি—বাড়ি চিহ্নিত করে যাচ্ছে, বোমা মারবে নাকি ? আগুন দেবে ?

নিবারণই সব চেয়ে বড় বন্ধু—হয়তো বা একমাত্র বন্ধু এত বড়

জায়গায়টায়। মুখ বেজার করে তিনি বললেন, বলেন কেন—ছ্যাঁচড়া, পরম ছ্যাঁচড়া, হয়ে পড়েছে মানুষজন। আমার বাড়িতেও ইট-পাটকেল মারছে হুজুরের একটু নেকনজরে আছি বলে। পরশু রাতে কাজল তো কেঁদেই অস্থির।

পাশা উলটে গেছে সত্যিই। মানুষের আনাগোনার অন্ত ছিল না, ভিড়ের চোটে শিশির অতিষ্ঠ হয়ে উঠত, চন্দ্রার সঙ্গে একটু নিঝঞ্ঝাটে বসে গল্পগুজব করবে সে সুযোগ দুর্লভ হয়ে উঠছিল দিন দিন—হঠাৎ কি হয়ে গেল, এখন কথা বলবারই একটা মানুষ খুঁজে পায় না। হাকিম বলে খাতির নেই। এই সেদিন শরৎ সামন্ত মশায়ের নাতির অন্নপ্রাশন হল, ভদ্রলোক মুখের কথাটা জানালেন না। মুখোমুখি দেখাও প্রায় হয়ে গিয়েছিল, সামন্তমশায় মুখ ফিরিয়ে সরে পড়লেন। পায়ে হেঁটে বেড়ানো আজকাল এক রকম সে ছেড়েই দিয়েছে—যদি দৈবাৎ বেরোয়, দেখতে পায় চেনা-মানুষরা পাশ কাটিয়ে গলি-ঘুঁজির মধ্যে ঢুকছে। নিতান্ত পথ না পেলে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। অথবা দু-জনে গল্প করতে করতে এমন ভাবে চলে যায়, যেন শিশিরকে দেখতেই পায় নি। একটা নমস্কার করতে হবে, আর 'কেমন আছেন', 'ভাল আছি' গোছের দুটো শিষ্ট কথা বলতে হবে এই আতঙ্কে।

নিবারণ ঘাড় নেড়ে বলেন, ভিতরে 'কিন্তু' আছে হুজুর। ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি—শরৎ সামন্তমশাইকে শাসিয়েছিল, পংক্তি-ভোজনে কেউ বসবে না সরকারি মানুষের সঙ্গে। আমাকে কত ভয় দেখায়, আমি কেয়ার করি নে। লোক না পোক—যা ক্ষমতা থাকে করুক গে—হুজুর খুশি থাকলেই হল।

ভেবে চিন্তে শিশির একদিন কোর্টে যাবার মুখে গঙ্গেশের বাড়ি গিয়ে উঠল।

রমেশ, গঙ্গেশের ছোট ভাই—মাইনর ইস্কুলে মাস্টারি করে। বেলা হয়ে গেছে, খেতে বসছিল—মোটরের হর্ন শুনে মুখ বাড়িয়ে

দেখল। দেখে ছুটতে ছুটতে এল। মাইনর ইস্কুলের প্রেসিডেণ্টও শিশির।

গঙ্গেশ তার সেই পুল তৈরির কাজে যায় নি, নিবিষ্ট হয়ে তাস খেলছিল একা একা। চারজনের তাস ভাগে ভাগে রেখেছে, কত কি হিসাব-পত্র করে ফেলছে এক-একখানা। রমেশ ডাকল : এস. ডি. ও. সাহেব এসেছেন দাদা।

মুখ না তুলে গঙ্গেশ বলে. কোথায় ?

বারান্দায় মোড়া পেতে বসিয়েছি। তাড়াতাড়ি আছে তাঁর।

হুঁ—বলে গঙ্গেশ সমস্ত তাস তুলে আবার ভাঁজতে লাগল।

দেরি কোরো না—বলে রমেশ বাইরে আবার শিশিরের কাছে ছুটল। তার হয়েছে বিষম জ্বালা!

শিশির জিজ্ঞাসা করে ঃ কি বললেন ?

এক্ষুনি আসছেন। বললেন, যত্ন করে বসাও সারকে সিগারেট নেই এ বাড়িতে, গড়গড়া চলবে কি সার।

শিশির ঘাড় নাড়ল। হাতঘড়ি দেখে বলে, ইস, দশটা-সাতান্ন—

এসে যাবেন এইবার। মানে আমার মেয়ের টাইফয়েড চলছে, সমস্ত রাত দাদা তার বিছানায় বসে—দু-চোখ এক করেন নি। এখন বেদানার রস খাওয়াচ্ছেন। মেয়েটা বড্ড নেওটা কিনা ওঁর।

অপ্রতিভ হয়ে শিশির বলে, অসময়ে এসে পড়েছি। বলুন যে একটা কথা বলেই আমি উঠব। কথাটা জরুরি।

ভিতরে গিয়ে রমেশ কাতর হয়ে ডাকে, ও দাদা!

এখন গঙ্গেশ তেল মাখছে। মৃদু হেসে বলে, যাচ্ছি রে ভাই—

তামাক সেজে রমেশ কলকেটা যেই গড়গড়ার মাথায় তুলেছে, ছোঁ মেরে গঙ্গেশ কেড়ে নিল গড়গড়াটা। ভড়ুক-ভড়ুক করে ক'টা টান দিয়ে গড়গড়া হাতে সে বাইরে চলল।

যাক, কথাবার্তা যা থাকে ডেপুটি সাহেব নিরিবিলি বলুন এইবারে—নিশ্চিন্ত হয়ে রমেশ রান্নাঘরে খেতে বসল। খেয়ে-দেয়ে

কাপড়-চোপড় পরে রমেশ ইস্কুলে যাচ্ছে—দেখে, শিশির তেমনি বসে আছে।

কথাবার্তা হয়ে যায় নি সার? দাদা যে এলেন এইদিকে।

শিশির বলে, একজন কাকে দেখলাম বটে, একটা গড়গড়া হাতে চলে গেলেন। গঙ্গেশ বাবুই হয়তো—

সর্বনাশ! দাদা মনে করেছেন, নাটমণ্ডপে এসে বসেছেন আপনি। সেইখানে চলে গেছেন।

শিশির ডাকে: শুনুন—এইটে তাঁকে দিনগে। আর বলুন একটা কথামাত্তোর —মিনিট দুই বড় জোর লাগবে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে রমেশ দ্রুত চলল। কৈফিয়ৎটা নিজের কানেই অদ্ভুত লাগছিল। ডেপুটি সাহেবের খোঁজে গঙ্গেশ নাটমণ্ডপেই যদি, গিয়ে থাকে, আধ-ঘণ্টা ধরে করছে কি সেখানে? আর মণ্ডপ পড়ে মরুক, একটা খোড়োঘরও নেই যে এদিকটায়। একটানা উলুক্ষেত।

উলুক্ষেতের ধারে পুকুর। গিয়ে দেখে, বাঁধানো চাতালের উপর গড়গড়া, কলকের আগুন নিভে গেছে। গঙ্গেশ মহানন্দে সাঁতার কাটছে।

বিরক্ত কণ্ঠে রমেশ বলল, চান করতে করতেই তামাক খাবে নাকি যে গড়গড়া নিয়ে এসেছ?

নইলে গড়গড়া তুই ডেপুটিকে দিতিস। আমার গড়গড়ায় যে-সে তামাক খাবে, আমি পছন্দ করি নে।

মন্দ কাজ করতে আসেন নি উনি। চাকরির দরবার করেছিলে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার নিজে হাতে করে নিয়ে এসেছেন, এই দেখ। আরো কি কথা আছে বলছেন।

ভুস করে ডুব দিল গঙ্গেশ। ডুব-সাঁতার দিয়ে অনেক দূরে গিয়ে ভেসে উঠল।

উলুক্ষেত ভেঙেই রমেশ ইস্কুলের পথে নামল। শিশিরের

মুখোমুখি পড়ে গেলে আবার একটা মিথ্যে বানিয়ে বলবে, তারও কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।

(৩)

সেই রাত্রে এক কাণ্ড। ঘুণাক্ষরে কেউ ভাবে নি, এমনটা হতে পারে। খালের ভিতর থেকে পুলের থাম গেঁথে গেঁথে তোলা হচ্ছে। কাঠ ও বাঁশ ঠেকনো দিয়ে লাইন উঁচু করে রাখা হয়েছে। মিটার-গেজের গাড়ি ওর উপর দিয়ে সামাল হয়ে চলাচল করে। জল আটকাবার জন্য অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বর্ষায় এখন অঞ্চলের সমস্ত জল এসে চাপ দিচ্ছে বাঁধের গায়ে। এপাশে খালের মধ্যে বড় জোর এক-কোমর জল, আর ওদিকে জল জমে বাঁধের কানায় কানায় উঠেছে। জল ক্রমেই বাড়ছে, মাটি ফেলে ফেলে উঁচু বাঁধ রোজই আরও উঁচু করা হচ্ছে।

দিনে যারা কুলির কাজ করে, তাদেরই জনা কয়েক বর্ষারাত্রে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বাঁধের উপর এসেছে। কোদাল পড়ছে অতি সন্তর্পণে। বেশি নয়—হাত দুই গভীর এমনি পাঁচ-সাতটা নালা কাটলেই—ব্যস! তারও দরকার হল না—মাঝামাঝি গোটা দুই মাত্র কাটা হতেই জলের তীব্র বেগ নূতন মাটি ভেঙে বিস্তীর্ণ পথ করে নিল, পুলের কাঠ-বাঁশ ঠেলে ভাসিয়ে বিপর্যয় ঘটাল এক মুহূর্তে। রেলের পাটি আলগা হয়ে নিরালম্ব শূন্যে ঝুলতে লাগল।

রাত্রি তিনটে-সাতাশে একখানা মালগাড়ি যায়। ধান চালান যাচ্ছে বলে এই গাড়ির সঙ্গে ইদানীং বাড়তি ওয়াগন জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। সারা অঞ্চলের মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তাদের মুখের অন্ন সেই সময় চলে যায় দেশ-দেশান্তরে। ড্রাইভার দেখল, দুটো লাল আলো কে দোলাচ্ছে লাইনের উপর। ব্রেক কষে ইঞ্জিন থামাল, লণ্ঠন ফেলে লোকটাও অমনি লাইন থেকে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। পালাতে গিয়ে পা হড়কে জল-কাদায় পড়ে গেল।

মুলো-গঙ্গু। হেরিকেনের কাচে লাল কাগজ এঁটে দিয়েছে। ভাঙা পুলের উপর গাড়ি উলটে মানুষ-জন মারা না পড়ে—সেকালের রিভলভারধারী গঙ্গেশ তাই মুলো বাঁ-হাতের কনুয়ে ঝুলিয়ে নিয়েছে একটা হেরিকেন, আর একটা ডান হাতে। আলো দুলিয়ে দুলিয়ে গাড়ি থামানোর সঙ্কেত জানাচ্ছিল ড্রাইভারকে।

পুলিশ-লাইনে খবর গেল, হৈ-হৈ পড়ে গেল। এ জায়গায় ইতিহাসে এ একটা খণ্ড-প্রলয়ের ব্যাপার। খবর চলে গেল শিশিরের বাংলোয়—স্বদেশিওয়ালারা রেল-লাইন ভেঙে দিয়েছে, ধরা পড়েছে তাদের একটা।

ঘুম ভেঙে উঠে শিশির রওনা হতে যাচ্ছে, পুলিশ-ইনস্পেক্টর অশোক বাবু নিজে চলে এলেন। শুকনো মুখে বললেন, আসামিকে হাসপাতালে আনা হয়েছে।

হাসপাতালে কেন?

অজ্ঞান হয়ে গেছে। পাবলিক বড্ড উত্তেজিত হয়েছিল কিনা।

মুখ কালো করে শিশির বলে, বাড়াবাড়ি করেন আপনারা। আইন-আদালত রয়েছে, শাস্তির ভার আপনারা নেন কেন? আইন দিয়ে কংগ্রেসকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে ভাবছেন, বুঝি আপনারাই বাঁচবেন, আর কংগ্রেস মরে থাকবে চিরকাল?

হাসপাতালে গিয়ে দেখে, আঘাত গুরুতর—গঙ্গেশ অচেতন খোজ তারপর গেল পুলের অবস্থা দেখতে। যতটা শুনেছিল তা নয়—বাঁশ-কাঠগুলোই কেবল খসে গেছে, এক বেলার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে, বিকালের গাড়ি চলতে পারবে বলে মনে হয়। বাঁধ কেটে অবশ্য দস্তুরমতো অন্যায় করেছে এরা, কিন্তু জলের চাপেও তো আলগা মাটির বাঁধ ভেঙে যেতে পারত। বোম্বাই-প্রস্তাবের সঙ্গে এ ঘটনার যোগাযোগ আছে, ভাবতে ইচ্ছা হয় না শিশিরের। দোষ রেল-কোম্পানির—এমন শামুকের গতিতে কাজ চালায় কেন? দোষ গবর্নমেন্টের—চালের দাম বাড়ছে, তবু লড়াইয়ের প্রয়োজনে

অঞ্চলের সমস্ত ধান অজানা দেশে চালান দিচ্ছে। দোষ তো আমেরি সাহেব ও তার দলবলের—কংগ্রেস কোন-কিছু শুরু না করতেই কেন এমন পায়তারা ভাঁজতে গেল, কোটি কোটি মানুষের এত বড় দেশকে এই দুঃসময়ে কোন সাহসে চ্যালেঞ্জ করল ?

সকাল হয়েছে। হাসপাতাল থেকে এসে খবর দিল, গঙ্গেশের জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু বিষম বেয়াড়াপনা করছে, জেলখানার গাড়িতে সে কিছুতে উঠবে না।

শিশির চন্দ্রা দু'জনে চলল। তাদের দেখে তাড়াতাড়ি বেতের চেয়ার এনে দিল হাসপাতালের বারাণ্ডায়। গঙ্গু দাঁড়িয়ে তখন চিৎকার করছে : যেতে হয় হেঁটে যাব। চোর না ডাকাত—কেন আমি ঢুকব কয়েদির গাড়িতে? মারবে? কায়দায় পেয়ে গেছ, ছাড়বে কেন? এতক্ষণ তো দেখলে—খুশি না হয়ে থাক, মারো আবার যতক্ষণ পার।

মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ। পোশাক-আঁটা পুলিশদল মসমস করে বেড়াচ্ছে। গঙ্গুর কণ্ঠস্বর একটু কাঁপে না, মুখের ভাববিকৃতি নেই—যেন ইস্পাতে তৈরি মুখ! কথা নয়—যেন বুলেট বেরিয়ে আসছে ইস্পাতের মুখগহ্বর থেকে। চন্দ্রার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল।

টলছেন—আপনি পড়ে যাবেন। বসুন।

কিন্তু গঙ্গেশ বসল না। লাঠির মতো খাড়া দাঁড়িয়ে রইল।

শিশির জিজ্ঞাসা করে, দলটার সেনাপতি কে ছিল হে?

বুকে থাবা দিয়ে গঙ্গু বলে, আমি—আমি—

তুমি? তবেই হয়েছে! কদর বোঝা গেল তোমাদের রেজিমেণ্টের।

কী করা যাবে! বড়দের কেউ এ জায়গায় নেই।, কাজ তো বন্ধ থাকতে পারে না সে জন্যে!

শিশির বলে, তোমাদে নেতারা কিন্তু এসব পছন্দ করতেন না।

গঙ্গু হেসে বলে, বেশ তো, জেল থেকে ছেড়ে দিন তাঁদের। পছন্দ না করেন, তক্ষুনি তোবা করব সকলে। কী করতেন না করতেন, আপনার কথায় মেনে নিতে পারি না তো!

চন্দ্রা নূতন চোখে দেখছে গঙ্গেশকে, নৃসিংহ শত কণ্ঠে যার কথা বলতেন। পাঁচ পাঁচটা চার্জ সত্ত্বেও আদালতে মাথা নিচু হয়ে যায় নি যার। অন্যায় তার নয়, তারই উপর অন্যায় হচ্ছে—এমনি একটা ভাব চলনে-বলনে। সেই মানুষকে দেখবে বলেই এতকাল লোলুপ হয়ে ছিল। তাদের বাংলোয় গিয়েছিল সেদিন আর কোন লোক—আজ হাসপাতালে এই সর্বপ্রথম গঙ্গেশকে দেখতে পেল ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায়। এরা সেই ক্ষ্যাপার দল—পরাধীনতা কিছুতেই যারা মনের সঙ্গে মানান করে নিতে পারল না। দিব্যি খাচ্ছে ঘুমুচ্ছে, চাকরির জন্য করজোড়ে দরবার করে বেড়াচ্ছে—সাধারণ সময়ের দীনাতিদীন অতি বিনম্র মানুষ। হঠাৎ ঝড় ওঠে এক একটা, ডাক এসে যায়। গায়ের ধূলা ঝেড়ে মেতে ওঠে অমনি, প্রাণ যেন হাতের মুঠোয় করে ছুঁড়ে ফেলতে এগিয়ে ছুটে যায়। পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে চলেছে, ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে—উত্তাল জনপ্রবাহ। জব্দ করা গেল না এদের কিছুতে, বংশ বেড়েই চলেছে। বাইরের চেহারায় বুঝবার জো নেই, মনে মনে সবাই পাগল, সকলে কবি—বন্ধন-মুক্তির স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে।

বিমুগ্ধচোখে চন্দ্রা গঙ্গেশের দিকে চেয়ে আছে। সকালের প্রসন্ন আলোয় রাজাধিরাজকে দেখছে যেন। চাকরির নিয়োগ-চিঠি ছেঁড়া কাগজের সামিল এর কাছে, মহকুমা-হাকিম তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোক। কত লম্বা দেখাচ্ছে তাকে আজ! যে মাথা সেদিন নুয়ে ছিল, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে উঁচু হয়ে উঠেছে সে মাথা। ব্যাণ্ডেজ যেন রাজমুকুট।

(৪)

আরও সঙিন অবস্থা। শিশির এসে যা দেখেছিল, সেই মহকুমা-শহরের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই এখন এই জায়গার।

ক্লাব-ঘরে কেউ আসে না ব্রীজ আর বিলিয়ার্ড খেলতে। পেট্রোম্যাক্সগুলো কালিঝুলি-মাখা অবস্থায় এক কোণে পড়ে আছে। একটা কেরোসিনের টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে বেয়ারা দরজার ওধারে টানা-পাখার দড়িতে হাত রেখে বসে বসে ঝিমোয়। চুপচাপ ইজি-চেয়ারে পড়ে শিশির খানিকক্ষণ হয়তো ডিটেকটিভ নভেলের পাতা উলটায়, তারপর উঠে পড়ে।

বাড়িতেও ভাল লাগে না। চন্দ্রার সঙ্গে খুনসুটি করবার জন্য আগে এমন উসখুস করত—কোর্টে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়া এখন তো অখণ্ড অবসর, তবু ওসব ভালই লাগে না। চন্দ্রাও আলাদা মানুষ হয়ে যাচ্ছে, অহরহ কি বসে ভাবে। অতিরিক্ত গম্ভীর। কাছেই আসে না জরুরি সাংসারিক প্রয়োজন ছাড়া। অতি সংক্ষেপে কথা শেষ করে যেন দায় কাটিয়ে উঠে পড়ে।

একদিন শিশির হাত ধরে ফেলে প্রশ্ন করল, আর কিচ্ছু বলবার নেই তোমার?

আর কি? ভীরু চোখ দুটো তুলে অসহায়ের ভাবে চন্দ্রা তাকায়।

শিখিয়ে দিতে হবে? অনেক কষ্টে মুখে হাসি টেনে এনে শিশির বলে, বলো—প্রাণকান্ত, ভালবাসি। চলবে না—বড্ড সেকেলে?

কণ্ঠ সহসা কাতর হয়ে এল। বলে, আগডুম বাগডুম বলো যা তোমার খুশি। চুপ করে থেকো না। দোহাই—

চন্দ্রার চোখের কোণে জল এসে গেছে। ঝাঁকি দিয়ে শিশির

তার হাত ছেড়ে দিল : যাও, বিদায় হয়ে যাও তুমি—

তারপর উঠে চঞ্চল ভাবে পায়চারি করতে লাগল।

পুরানো চাকর রাখাল, পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি, শিশির যখন জন্মে নি সেই সময় থেকে। রাখালেরও কাজ নেই একেবারে। পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি, সাজানো-গোছানো জিনিসপত্র—একটুকরো কাগজ কি এক কণিকা ধূলো পড়ে ইনে কোথাও। মানুষ আসে না, পড়ো-বাড়ির মতো—যে জিনিসটি যেমন রেখে দেয়, অবিকল তেমনি থাকে দিনের পর দিন। বিরক্ত হয়ে অকারণে সে এখানকার জিনিস ওখানে নিয়ে রাখছে, তোয়ালে দিয়ে ঝাড়ছে এই এ-জায়গায় এই ও-জায়গায়। ট্রে সরাতে গিয়ে শৌখিন পেয়ালা পড়ে কুচি-কুচি হয়ে গেল।

শিশির ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়। রাখাল বেকুব হয় না। বলে, বুড়ো হয়ে গেছি, কাজের শক্তি নেই। ছুটি দাও ভাই, বাড়ি যাই।

ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োচ্ছে, থর-থর করে হাত কাঁপছে।

শিশির বিচলিত হল : চলে যেতে চাচ্ছিস রাখাল-দা ?

অনেকদিন তো হয়ে গেল। চাকরি ছেড়ে দেশে-ঘরে থাকিগে এবার

দুঃখিত স্বরে শিশির বলে, এটা কি ঘর নয় তোর ? দেশে গিয়ে উঠবি কোথায় শুনি ?

আমার বড়দিদি আছেন বিধবা। তিনি বলছেন—

বুঝেছি। বলে শিশির তার সামনে গিয়ে দু-কাঁধে দু-হাত রাখল। হয়েছে কি বল্ ?

রাখাল দস্তুরমতো ভর্ৎসনা শুরু করল এবার। যেমন সে করত ছোটবেলায় শিশির যখন বড্ড দুরন্তপনা করত।

থাকব না আমি, থাকতে পারছি নে। ফটকের ধারে আমার ঘর—রাস্তা দিয়ে তোমার কুচ্ছো করতে করতে চলে যায়. সে সব কানে শোনা যায় না।

বটে!

বাপ তুলে গালিগালাজ করে, আবার খুন করব বলে শাসায়—

শিশির বলে, খবর দিস যখন ঐ সব বলে। পুলিশ ডেকে অ্যারেস্ট করাব।

রাখাল বলে, ঐ তো ক্ষমতার দৌড়। যারা মরতে ভয় পায় না, জেলে আটকে কি করবে তুমি তাদের?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আমি বলি কি—চলো এসব ছেড়েছুড়ে। একবেলা আধপেটা খাব যদি না কুলেয়ে।

চুপ! তাড়া দিয়ে শিশির শেষ করতে দেয় না: মুখের বাড় বড় বেড়েছে—না? নিজের কাজে যা। না পোষায়, থাকিস নে।

ইস্কুলে পড়বার সময় শিশির দাবাখেলা শিখেছিল, একদিন ধরা পড়ে বাপের কানমলা খেয়ে ছেড়ে দেয়। এত কাল পরে সেই খেলা মরীয়া হয়ে সে আরম্ভ করল নিবারণের সঙ্গে। সন্ধ্যার পর শিশিরের ড্রইংরুমে গালিচার উপর ছ'জনে ছক পেতে বসেন, গভীর রাত্রি অবধি খেলা চলে। চন্দ্রা পড়ে পড়ে ঘুমোয়, শিশির তাকে ডাকে না, নিঃশব্দে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের বিছনায় শুয়ে পড়ে। শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে, ঘুম হয় না। অনেক খেটেখুটে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করে তবে চাকরিতে ঢুকল। চাকরি পাওয়ার পর আত্মীয়-পরিজন শতকণ্ঠে সাধুবাদ করেছিলেন। চিরদিনই সে ভাল ছেলে—ছোট্ট বয়স থেকে অজস্র প্রশংসা পেয়ে এসেছে সকলের। আর আজকে এই অবস্থা। অপরাধের তার যেন সীমা নেই। সবাই মুখ ফিরিয়েছে এক এই নিবারণ পালিত ছাড়া। পেনশনের তাঁর বছর ছুই বাকি—ইতিমধ্যে এই অঘটনে সে ভদ্রলোকও কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। দাবা খেলতে খেলতে মনের ছুঃখ শিশিরের কাছে ব্যক্ত করেন। যেন পায়ের নিচেকার মাটি সরে যাচ্ছে—দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ-গবর্নমেণ্ট অবধি হিমসিম খেয়ে

যাচ্ছে এই সব নিরন্ন নিরস্ত্র মানুষগুলোর কাছে। দাবা খেলার সময় ম্লান কেরোসিনের আলোয় মনে হয়—অসমবয়সি দুঃখী দু-জন গালে হাত দিয়ে যেন দাবার চাল নয়—নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবছে।

নানারকম গুজব। দল বেঁধে এসে দখল করবে নাকি এই শহর। নিবারণই ফিসফিস করে খবর দেন। আবার তাচ্ছিল্যের সুরে প্রতিবাদও করেন বোধকরি মনকে আশ্বাস দেবার জন্য। এই যেদিন হবে হুজুর, হাতের তলায় লোম উঠবে—আমি বলে রাখছি। ঘরে বসে দুটো বন্দে-মাতরম্ আওয়াজ ছাড়ে, চেঁচিয়ে পেটের ভাত হজম করে—গবর্নমেণ্ট তাই কানে নিচ্ছে না। তা বলে রাজ্যটা ছেড়ে দিয়ে যাবে সহজে ?

সে নিবারণও আসছেন না আজ দিন চারেক। খেলা না হোক—দুটো খবরাখবর আর ভরসা দেওয়ার মানুষ না হলে বাঁচা যায় কি করে? বলতে গেলে কথার দোসরই নেই আজকাল। নিজেই শিশির খোঁজ নিতে চলল নিবারণের বাড়ি। পদের আভিজাত্য নিয়ে পৃথক হয়ে ঘরের ভিতর থাকবার কি অর্থ আছে, কেউ যখন ডেপুটিগিরিকে সম্মান বলেই আর বিবেচনা করছে না। —চন্দ্রা অবধি না। আর এই উপলক্ষে ঘোরাফেরাও হবে খানিকটা।

নদীর ধারে নিবারণের বাসা।

নিবারণের জ্বর হয়েছে, সেই অবস্থায় বেরিয়ে এসে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন। স্বল্প পরিসর বৈঠকখানায় কোথায় শিশিরকে বসতে দেবেন, ভেবে পান না। আমকাঠের সরু তক্তাপোষ, ছেঁড়া মাদুর, ময়লা তাকিয়া—শিশির তার উপর গড়িয়ে পড়ল। বোধ-করি এই একমাত্র বাড়ি, যেখানে তার সমাদর রয়েছে। সোরগোল করে নিবারণ চা করতে বললেন। শিশির হেসে যত নিরস্ত করবার চেষ্টা করে, ততই অধিক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তিনি। শিশির বলে, নাঃ, কোথাও তো যাই নে, আপনার এখানে এলাম—তা এমন

করলে আর আসব না, বলে দিচ্ছি।

কাজল এল রেকাবিতে বাতাসা, মুগের অঙ্কুর আর দুটো মিষ্টি নিয়ে। চেয়ে দেখে নিবারণ অপ্রসন্ন মুখে বললেন, খানকতক লুচি ভেজে আনতে পারলি নে? কি দরের মানুষ উনি—কত ভাগ্যে এসেছেন—

মুখে রাগ দেখায়, মনে মনে খুশি হচ্ছে শিশির। এখনও এসব বলবার মানুষ আছে তাহলে, এই বিয়াল্লিশ সনের আগস্টের পরেও? কাজলের দিকে ফিরে সে বলল, অসময়ে আমি খাই নে। চা-র কথা বললেন, তাই শুধু নিয়ে আসুন এক কাপ।

লঘু পায়ে মেয়েটি অদৃশ্য হল। মৃদু হাসি তার মুখে। নিবারণ বললেন, কাজলকে 'আপনি' বলছেন কেন হুজুর? কি আর বয়স! আমারই লজ্জা করছে।

এর পর আরও পাঁচ-সাত দিন শিশির এল নিবারণের বাড়ি। নিবারণ অন্নপথ্য করেছেন, কিন্তু রাত্রে যাতায়াতে ঠাণ্ডা লাগানো ঠিক নয়। ম্যালেরিয়া জ্বর—সাবধানে থাকতে হয়, নয় তো আবার জ্বর দেখা দিতে পারে। শেষের দিকে দু-একদিন দাবাখেলা চলল এখানেই। তক্তাপোষে পা ঝুলিয়ে বসে চাল দিতে দিতে হঠাৎ একসময় শিশিরের মনে পড়ে যায়. সেইসব দিনের কথা—যখন খালি পায়ে একহাঁটু ধুলোমাটি মেখে সে ইস্কুলে যেত, এত বড় হয় নি, এমন চাকরিও পায় নি।

যত দেখছে, বড্ড ভাল লাগছে কাজলকে। ভাল মেয়ে, ভারি সুন্দর স্বভাব, চমৎকার মেয়ে। শিশির এলে তটস্থ হয়ে থাকে, কী করে খুশি করবে খুঁজে পায় না। কোর্ট থেকে ফিরবার মুখে নিবারণকে প্রায়ই শিশির বাসায় নামিয়ে দিয়ে যায়। একদিন কি কাজে কোথায় গেছেন নিবারণ, তবু শিশির ঐ পথে ঘুরে আসছে। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে কাজল দুয়োরের ধারে দাঁড়িয়েছে। শিশিরকে বলে, নামবেন না?

তোমার বাবা আসেন নি আজ।

আমরা তো আছি—

গাড়ির দরজায় হাত রেখে সে দাঁড়াল। শিশির নামল।

আচ্ছা, সত্যি বলো। কি ভাব তোমরা আমার সম্বন্ধে?

কাজল জবাব দেয় না, টিপিটিপি হাসে।

ভয় করো না আমায়?

কেন?

আমার নামে অনেক বদনাম শুনেছ। চারিদিকে গণ্ডগোল, আর এ মহকুমাটা আমি টিট করে রেখেছি। লোকে তাই রটিয়ে বেড়াচ্ছে, খয়ের-খাঁ আমি একেবারে—

কাজল বলে, বাবাকেও লোকে ঐ সব বলে।

জবাব শিশিরের মনঃপূত হল না, জোর প্রতিবাদ সে প্রত্যাশা করেছিল। মেয়েটা তার মুখে দিকে চেয়ে কি বুঝল, কে জানে! খোশামুদি সুরে বলে, এত বড় হয়েও এই ভাঙা-বাড়িতে ছেঁড়া-মাদুরে এসে বসেন, ঘৃণা করেন না—

এ প্রশংসাও ঠিক প্রাপ্য নয়, এতদিনের মধ্যে কখনো তো সে আসে নি। নোংরা ঘিঞ্জি এই পূবপাড়ায় পা দেওয়ার কথা স্বপ্নেও সে ভাবতে পারত না। মোটরে তার সান্ধ্য-ভ্রমণ হত—ধূলো লাগবার ভয়ে মোটর থেকে মোটে নামতই না। আজকে ঔদার্য ভরে আমকাঠের তক্তাপোষের উপর গড়িয়ে পড়েছে- কেন আসে এমন করে, বোঝে না কি মেয়েটা? না, জেনেশুনে ভান করছে? কাজলের বুদ্ধিপ্রদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে প্রশংসাও শিশির সহজ মনে নিতে ভরসা পায় না। এমনি হয়ে উঠেছে আজকাল—কেউ তাকে ভাল বলছে, কানে শুনেও বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হয় না।

খানিক গল্পগুজব করে শিশির উঠল।

যাচ্ছি, দরজা বন্ধ কর কাজল।

গাড়িতে গিয়ে বসতে সোফার একখানা খামের চিঠি হাতে দিল।

কে দিয়েছে?

তা তো বলতে পারি নে হুজুর। কোলের উপর ফেলে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি এসে চিঠিটা পড়ল। বেনামি চিঠি। আবার ডাক পড়ল সোফারের।

এখানকার মানুষ তুমি—লোক চিনতে পারলে না?

মুখ দেখতে পাই নি।

নাম বলতে চাও না, তাই বলো। সব তোমরা একদলের। দেখাচ্ছি মজা। রোসো—

খুব খানিকক্ষণ বকাবকি চলল। চন্দ্রা এসে ছায়ান্ধকারে দাঁড়িয়েছে। একটি কথা বলল না—যেমন এসেছিল, নিঃশব্দে তেমনি চলে গেল।

অনেক রাত—শিশিরের ঝিমুনি এসেছে, হাতে বইটা গড়িয়ে পড়েছে। ধড়মড়িয়ে হঠাৎ উঠে বসল।

কে?

স্খলিত কণ্ঠে চন্দ্রা বলে, আমি, আমি—

শিশিরের দিকে কাতর দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। বলে, পালিয়ে যাই চলো। দিনমানে না পার, এমনি কোন রাতে। এভাবে থাকা যায় না, মরে যাব।

শিশির বলে, চাকরি?

ছেড়ে দাও। নয় তো লম্বা ছুটি নাও অনেকদিনের জন্য। আবার সুখী হব আমরা, শান্তি পাব।

কিন্তু—

ঝর-ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে চন্দ্রার গাল বেয়ে। ব্যাকুল কণ্ঠে সে বলতে লাগল, জল-বিছুটি মারছে যেন এখানে। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—মানুষের সঙ্গ না পেয়ে কি করে বাঁচি। মানুষের এত ঘৃণা সহ্য করি কেমন করে?

কিন্তু তা কি করে হয়। জীবন নাটক নয়—নানাদিক দিয়ে অসংখ্য বাঁধনে বাঁধা।

চন্দ্রার অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে দিন দিন। সারাদিনের দুশ্চিন্তা ও অজস্র পরিশ্রমের পর শিশির রাত্রিবেলা ছু-চোখ বুজে একটু সোয়াস্তি পেতে চায়, কিন্তু চন্দ্রাই এক নূতন বিভীষিকা হয়ে উঠেছে ঘরের মধ্যে।

শেষে শিশিরই প্রস্তাব করল, বরানগরে চলে যাও তুমি। বাপের বাড়ি দিনকতক ঘুরে এসো, মন ভাল হয়ে যাবে। নইলে মারা পড়বে।

তুমি?

দেখা যাক। গণ্ডগোলের প্রথম মুখটা অন্তত কাটিয়ে দিয়ে যাই। এখন ছুটিছাটা দেবে না। ছুটি নিলে খারাপ হবে চাকরির পক্ষে।

চন্দ্রা বিশেষ আপত্তি করল না শিশিরকে এই অবস্থার মধ্যে রেখে যেতে। প্রতি মুহূর্ত মরে যাচ্ছিল সে। বরানগরে গেল—যেখানে সে মহকুমা-হাকিমের স্ত্রী নয়, সহজ সাধারণ মানুষ। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামের সঙ্গে দোলায়িত হবার—অন্তত পক্ষে ছুটো সহানুভূতির কথা বলবার অধিকার আছে সেখানে তার। তে-রঙা পতাকা নিয়ে কলেজের মেয়েরা মিছিল করে রাস্তা অতিক্রম করে, তারই সঙ্গে রোদে পুড়ে বৃষ্টির জলে ভিজে খালি পায়ে এক-পা কাদা মেখে সে-ও একদিন লক্ষকোটি মূক মানুষের মর্মকথা শহরের সুস্থ উদাসীন মানুষদের শুনিয়ে বেড়াত—এখন অতদূর না পারুক, রায় বাহাদুরকে লুকিয়ে ছু-একদিন গিয়ে ছু-চোখ ভরে দেখতে পারবে তো আগেকার বন্ধুদের কাজকর্ম, উদ্যোগ-আয়োজন?

(৫)

সোফার আসছে না, শিশিরের কাছে আর চাকরি করবে না সম্ভবত। থানার অশোকবাবু একদিন খবর দিয়ে গেলেন, বাইরের যাদের আসার কথা শোনা যাচ্ছিল--দল বেঁধে তারা আসাতে শুরু করেছে এবার। এক্‌স্ট্রা-ফোর্স চেয়েছিলেন, মঞ্জুর হয় নি। সব জায়গায় একই তো অবস্থা! হাতে যা আছে, তাই নিয়ে তৈরি হতে হবে। আর অশোকবাবু তৈরি আছেনও। একটা বন্দুক তুলে ধরলে যেখানে একশ' মানুষের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, তাদের জন্য বেশি আয়োজনের কি দরকার?

খবর দিয়ে পান চিবাতে চিবাতে হাসি-মুখে অশোকবাবু বেরিয়ে গেলেন এটা দুটো আন্দাজ বেলার কথা। শিশিরের খাস-কামরায় বসে কথাবার্তা হল। ক্রমশ তারপর রকমারি খবর চারিদিকে ছড়াতে লাগল। সন্ধ্যার কাছাকাছি মুখ-আঁধারি হলে সাব-রেজেস্ট্রি অফিসের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিশির নিজের চোখে দেখেও এলো কিছুক্ষণ। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল দিক থেকে খাল পেরিয়ে বিল ঝাঁপিয়ে সদর-রাস্তা বেয়ে জনপ্রবাহ ছুটেছে শহরমুখো, ঢেউয়ের ফেনার মতো মাথার উপর তে-রঙা নিশানের সমারোহ। এলো—এসে পড়েছে এবার। চেয়ে চেয়ে শিশিরের বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। জগদ্দল পাথর চাপা দিয়ে অন্ধকূপে যেন আটকে রাখা হয়েছিল ওদের, পাথর ঠেলে ফেলে বেরিয়েছে, আলোয় এসেছে--কে রুখবে আর এখন? এ ব্যাপার ভাবতেও পারে নি তো এই ক'ঘণ্টা আগে।

হঠাৎ কি হয়ে গেল, সকল চাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে মন ভার শান্তিতে ভরে উঠল। চন্দ্রা গিয়ে পৌঁছানোর খবরটা অনুগ্রহ করে দিয়েছে।

তারপর আর খোঁজখবর নেবার কোন আগ্রহ নেই। চুলোয় যাক —শঙ্কনহীন নির্ভীক সুস্থতার সঙ্গে কর্তব্য করতে আটকাবে না আর এখন।

আর একটা বিশেষ কর্তব্যের কথা মনে পড়ল, গাড়ি নিয়ে চলল নিবারণের বাড়ি। সোফারের অভাবে নিজেই গাড়ি চালিয়ে গেল। চাকরি ছোট হোক—তবু নিবারণ সরকারি চাকুরে। কিন্তু তাঁর চেহারায় শঙ্কা বা উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না, নির্লিপ্ত ভাব। বুড়ো হয়েছেন, কাজকর্ম এড়াতে পারলে বাঁচেন—এই হাঙ্গামায় আপাতত কোর্টে যেতে হবে না বলে বরঞ্চ তিনি উল্লসিত হয়েছেন বোধ হচ্ছে।

দরজা বন্ধ করেন নি সেরেস্তাদার মশায়? কেউ ঢুকে না পড়ে।

কাজলও দরজায় এসেছে, প্রশ্ন করে, কেন?

শিশির বলে, খবর রাখ না? দলে দলে মানুষ আসছে—

সরকারি-পাড়ায় ধাওয়া করেছে আমাদের বাড়ি আসবে তারা কি করতে?

বলে কাজল হেসে উঠল।

উষ্ণকণ্ঠে শিশির বলে, আমরা নিপাত যাব, ধর্ম দেখবে তোমরা বসে বসে?

দুম করে মোটরে ইট এসে পড়ল একখানা। অন্ধকার—কাছেই পুরানো আম-কাঁঠালের বাগান—কোন দিক দিয়ে এল ঠাহর হয় না। নিবারণ ব্যাকুল হয়ে বললেন, সরে পড়ুন হুজুর, পাড়াটা সুবিধের নয়।

পা-দানিতে এক পা আর রাস্তার উপরে এক পা—শিশির কথা বলছিল। চক্ষের পলকে ভিতরে উঠল।

একলা যাবেন না, দাঁড়ান—এগিয়ে দিয়ে আসি—

নিবারণ গিয়ে পাশে বসলেন। ঢিব-ঢাব ইট পড়ছে এদিক-ওদিক থেকে। গাড়ি জোরে চলেছে। নিবারণের প্রতি কৃতজ্ঞতায়

শিশিরের মন ভরে উঠল। তিনিই এখন কেবল তার পাশে। আর আছে রাখাল, ঝগড়াঝাটি করে—কিন্তু শিশিরে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত নড়বে না কিছুতে।

রাখাল গেটে দাঁড়িয়ে। এপথ-ওপথ ঘুরে হর্ন না দিয়ে জনতার সান্নিধ্য এড়াতে প্রায় সারা শহরটা পাক দিতে হয়েছে। রাখাল সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল। গলা খাটো করে বলে, বিষম কাণ্ড—আগুন দিচ্ছে সমস্ত সরকারি বাড়িতে। আর ঐ যে হরদাস শীল নতুন বাসের লাইসেন্সের জন্য এসে প্যান-প্যান করত, সেই শুনলাম টিন টিন পেট্রোল সরবরাহ করছে ওদের।

নিবারণের সামনে এ প্রসঙ্গে বিরক্ত হল শিশির। বলে, নিজের কাজে যা। তোর কাছে কে শুনতে চাচ্ছে এসব?

ড্রইংরুমে দু-জনে নিঃশব্দে বসে। আলোর জোর কমানো, দাবা বের করা হয় নি। মাঝে মাঝে উন্মত্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। দীর্ঘকাল আফিং খাইয়ে খাঁচায় পুরে রাখা বাঘের দল যেন ছাড়া পেয়েছে, রক্তের স্বাদ পেয়েছে, শহরময় তারা তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়।

খানিকক্ষণ পরে নিবারণ বললেন, উঠি এবার।

আসবেন আবার কাল, একা পড়ে আছি।

অনুরোধের চেয়ে অনুনয়ের মতোই শোনাল কথাটা। এমন অস্বাভাবিক কণ্ঠ যে মুখ ফিরিয়ে নিবারণ তাকালেন তার দিকে। শিশির তাড়াতাড়ি অন্য কথা তোলে।

এ অবস্থায় হেঁটে যাওয়া ঠিক হবে না। চলুন—ঐদিক দিয়ে ঘুরিয়ে হাট খোলায় নামিয়ে দিয়ে আসি।

নিবারণ সভয়ে প্রতিবাদ করেন।

আজ্ঞে না। হেঁটেই যাব। আমরা চুনোপুঁটি—আমাদের কে কি বলবে? দিব্যি চলে যাব—আপনাকে কষ্ট করতে হবে না হুজুর।

বারান্দায় শিশির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জনতার চিৎকার আসছে, সেইদিকে নিবারণ ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভয় করবার কিছু নেই ওদের! এই শ্রেণীকে সত্যিই সে চুনোপুঁটির মতো বিবেচনা করে এসেছে, আজকে দলে টেনে বিপদের ভাগ দিতে গেলে ঘাড় পেতে তারা তা নেবে কেন? তার সান্নিধ্যের নাগপাশ এড়িয়েই নিবারণ যেন বেরিয়ে চলে গেলেন।

রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডগোল স্তিমিত হয়ে গেল। রাস্তায় মানুষ নেই, টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার—যেন শ্মশানভূমি। চিতাগ্নির মতো পোস্টঅফিসটা জ্বলছে। কি কাজে কয়েকটা মিলিটারি-ট্রাক এসেছিল। তার দুটোয় আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে, ফটফট শব্দ হচ্ছে, ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেয়ে ফেলেছে সমস্ত আকাশ। ঘণ্টা কয়েক আগে ক্ষিপ্ত জনতা এত সব কাণ্ড করেছে, তাদের চিহ্নমাত্র নেই এখন।

উদ্বেগে স্থির থাকতে পারে না, পায়ে পায়ে এগুচ্ছে শিশির। হাসপাতালের সামনে জামরুল-তলায় গিয়ে দাঁড়াল। কিছু কর্মব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে কেবল এই খানটায়। মফস্বল হাসপাতালে এমনতেই লোকাভাব—ডাক্তার আর দু'জন কম্পাউণ্ডার ছায়ামূর্তির মতো ঘোরাফেরা করছে, অস্পষ্ট গোঙানি উঠছে থেকে থেকে। বাঁধানো চাতালে মুক্ত-আকাশের নিচে দু-তিনটে মড়া—সিমেন্টের উপর দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। অশোকবাবুর কীর্তি! কাজ সেরে তারপর সন্ধ্যাবেলা থেকে কোথায় নাকি তিনি উধাও হয়েছেন, কেউ সন্ধান জানে না।

রাখাল আর সে জেগে আছে। শেষ-রাত্রে দরজায় টোকা। অশোকবাবু। পানাপুকুরের ধারে কচুবনে মাথা গুঁজে বসেছিলেন, এখন সদরে ছুটেছেন। দিনের আলোয় দেখতে পেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

আরও অনেক ভয়ানক খবর দিলেন অশোকবাবু! টেলিগ্রাফের

তার কাটা, খেয়ানৌকা ডুবানো, রাস্তাও কেটে দিয়েছে—আর বড় বড় গাছ কেটে এনে ফেলেছে রাস্তার উপর। আঁট-ঘাট বেঁধে ওরা এসেছে। সকালবেলা দেখা গেল, স্বদেশিরা টহল দিয়ে শান্তি-রক্ষা করে বেড়াচ্ছে শহরে। একটা রাতের মধ্যে কি হয়ে গেছে—পৌনে দু-শ বছরের মধ্যে এমনটা ঘটে নি। ইংরেজের রাজ্য ভারতবর্ষ থেকে এক টুকরো যেন আলাদা করে কেটে নিয়েছে এই মহকুমা অঞ্চলটা। এ সব যারা করেছে, একেবারে সাধারণ পাড়াগাঁয়ের মানুষ তারা—জীবনে হয়তো প্রথম এই পা দিয়েছে পাকা ইটের রাস্তায়। মাথায় উপরে থেকে নির্দেশ দেবার কেউ নেই। দু-পাঁচ জনে শলা-পরামর্শ করে যেমন অভিরুচি করে যাচ্ছে। কড়া শৃঙ্খলা না থাকলেও বেশ একটা নিয়ম দেখা যাচ্ছে এদের বিক্ষিপ্ত কাজকর্মের ভিতর। 'ভারত ছাড়ো'—এই যে বুলি উঠেছে, এটাই মানুষজনের মনে মনে বাতলে দিচ্ছে, কি করতে হবে, আর কি করতে হবে না।

আরও খবর এল, আদালতের নথি-পত্র নাকি টেনে টেনে বের করছে—পোড়াবে। এ অবস্থায় চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকা যায় কেমন করে? কিন্তু দরজা চেপে দাঁড়াল রাখাল। শিশিরের তাড়া খেয়েও নড়ল না। মানুষজন ক্ষেপে আছে কাল গুলি খাওয়ার পর থেকে। রাখাল কিছুতে ওদের মধ্যে যেতে দেবে না।

শিশির বলে: তা হলে তুই যা—দেখে আয় গিয়ে। আর সেরেস্তাদার বাবুর বাড়ি গিয়ে বলে আয়, খবরবাদ নিয়ে অতি-অবশ্য যেন আসেন সন্ধ্যার পর।

ঘণ্টা দুই পরে রাখাল ফিরল। খদ্দরধারীরা এজলাসে বসেছে, আদালতের মাথায় তে-রঙা নিশান। অশোকবাবু, শিশির—এদেরই সব খোঁজাখুঁজি করছে হাতকড়ি পরিয়ে গারদে পাঠাবে বলে। আর দরজা বন্ধ সেরেস্তাদার-বাড়ির। ডাকাডাকি করে সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি।

এত· আতঙ্কের মধ্যে একটু আনন্দ শিশিরের—যেমন যেমন সে বলেছে, নিবারণ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন।

বাজার থেকে রাখাল খালি ঝুড়ি নিয়ে ফিরে এল। সরকারি লোকদের কাছে কেউ জিনিসপত্র বিক্রি করবে না। শিশিরের প্রমোশান হলে তার বন্ধুরা মনে মনে তাকে হিংসা করেছিল নিশ্চয়। আজকে যদি তারা এসে দেখে যায়!

(৬)

বিভাসরঞ্জন যখন-তখন শশিশেখরের বাড়ি আসে। বেলেডাঙায় খুব বড় কন্ট্রাক্ট নিয়ে শশিশেখর ইদানীং সেইখানেই পড়ে আছেন—অভিভাবকহীন তিনটি নারী কলকাতায়। প্রখর কর্তব্যজ্ঞান বিভাসের-কাজকর্মের ক্ষতি করে দীর্ঘক্ষণ বসে সে খুঁটিনাটি খবরাখবর নেয়। ইদানীং ইন্দুমতীকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছে।

মা আছেন?

যূথী বলে, না, মার্কেটে চলে গেলেন এক্ষুণি

একলা?

ট্যাক্সি নিয়ে গেছেন।

একটু থেমে মৃদু হেসে যূথী বলল: না গিয়ে উপায় কি? ভাগ্যবশে সম্মানী অতিথি আসা-যাওয়া করছেন, এই যুদ্ধের বাজারে অভ্যর্থনার উপযুক্ত কিছু মেলে না। নিজে গিয়ে মার্কেট খুঁজে দোকানদারদের জপিয়ে-জাপিয়ে ডবল দাম কবুল করে যদি কিছু বিলাতি বিস্কুট আর অস্ট্রেলিয়ান চীজ বের করে আনতে পারেন।

বিভাস বলে, ঘরের ছেলে আমি, আমার জন্য···কি লজ্জার কথা—ছি-ছি!

যূথী হেসে উঠে বলল: লজ্জায় আসা বন্ধ করবেন না যেন! আমরা নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ব।

বিভাস বিমুগ্ধ চোখে যূথীর দিকে তাকাল। তার মতো বুদ্ধিমান লোকও সঠিক ধরতে পারে না—সবটাই ঠাট্টা, না কিছু আন্তরিকতা আছে যূথীর কথার মধ্যে ?

ঢং ঢং করে ঘড়িতে ন'টা বাজল।

যূথী বলে, আপনার তো বাড়ি ফিরতে হবে এখনি ?

কেন ?

মেয়েরা দেখা করতে যাবে। সাড়ে-ন'টায় আপনি সময় দিয়েছেন।

তুমি জানলে কি করে ?

আমাদের রেখাও যে ঐ দলে। এরই মধ্যে সে ছোটখাট একটু নেতা হয়ে উঠেছে। ইস্কুলের অনেক মেয়ে ঘুরে বেড়ায় তার পিছু-পিছু।

বিভাস বলল : দলটা ভাল নয়। মানা করে দিও রেখাকে। সন্দেহ হয়, চারিদিকের এই আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওদের।

যূথী প্রশ্ন করে : আন্দোলনের বিরুদ্ধে আপনি ?

স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বিভাস আমতা-আমতা করে : কংগ্রেস তো করছে না এসব। কংগ্রেস সিল-মোহর দিয়ে দিলে ব্যক্তিগত মতামত যা-ই হোক—বাধ্য হয়ে ঢোক গিলতে হত আমাদের।

উষ্ণকণ্ঠে যূথী বলল, তার আগেই যে কংগ্রেসিদের জেলে পুরে ফেলল। কিন্তু আপত্তিই যদি আছে, ওদের টাকা দিতে রাজি হলেন কেন ?

গরম-গরম বুলি ছাড়তে লাগল যে বাড়ি চড়াও হয়ে ! তার পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম, অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া কোন ক্রমে উচিত হবে না—ওরা দেশময় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। তাই সরে এসে বসেছি তোমাদের এখানে।

আচ্ছা, বসে থাকুন। মা এখনই এসে যাবেন। আমি ঘুরে আসি একটু।

বলে যূথী সেই আধময়লা কাপড়-পরা অবস্থায় বেরিয়ে যায়।

চললে কোথা ?

মেয়েগুলোর কাছে। বেচারিরা আপনার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে বড় আশা করে যাচ্ছে, আমাকেও টানাটানি করছিল। মানা করে আসি ওদের।

বিভাস আশ্চর্য হয়ে বলে: তুমি ঐ দলের ? তুমিও যেতে নাকি ?

সে কথায় আর দরকার কি ? আপনি তো পছন্দ করেন না। আপনি বিশ্বাস করেন না এ পথ।

মুহূর্তে বিভাসের সুর বদলে গেল।

তোমাদের যখন এত বিশ্বাস, ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে দেখতে হবে আর একবার. যাচ্ছি আমি, কথা দিয়েছি—দিইগে কিছু টাকা।

চলে গেল বিভাস। যূথী হাসতে হাসতে বেতের চেয়ারে গড়িয়ে পড়ল। সে-ই পরামর্শ দিয়েছিল, ছাত্র-ছাত্রীরা চটে থাকলে রাজনৈতিক পথ সুগম হবে না—এই রকম বলে বিভাসকে ভয় দেখাত। এই নেতৃত্বকামীদের দুর্বলতা কোথায় সে জানে।

বিকালবেলা বিভাসের কোন কাজ থাকে না, এই সময়টা সে আসতে পারে—আর যূথী যেন নিয়ম করে নিয়েছে কোনক্রমেই বিকেলে বাড়ি থাকবে না। অনেক কষ্টে অবশেষে আবিষ্কার হয়েছে, যূথী গঙ্গার ধারে যায়। অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চি আছে, বিভাস সেখানে গিয়ে বসে পড়ল।

জলের কিনারে ঘাসের উপর বসে যূথী ছবির স্কেচ করছিল। একটা কুকুর শুয়ে লেজ নাড়ছিল খানিকটা দূরে। পড়ন্ত গঙ্গার জল ঝলকিত। রোদ পড়েছে যূথীরও মুখে। যূথীকে ডাকল না, কাজে বাধা দিল না তার—আলস্যে বেঞ্চির উপর বিভাস গড়িয়ে পড়ল।

আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, অঙ্কনরত যূথীকে নতুনমূর্তিতে দেখতে পাচ্ছে সে যেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ছবির কাজ শেষ করে যূথী দাঁড়াল। কোন দিকে না চেয়ে হন-হন করে চলেছে। আর যা ভেবেছে—মানব-চরিত্র যেন যূথীর নখদর্পণে—পিছনে পদশব্দ।

বিভাস ডাকছে, শোন—দাঁড়াও একটুখানি—।

এতক্ষণ যেন দেখতে পায় নি এমনিভাবে যূথী বলল: আপনি এদিকে! ওঃ, মোজাজোড়া? একটু সর্দি হয়েছে, মা'র জেদে পরে আসতে হয়েছে। এসেই খুলে রেখে দিয়েছিলাম—।

হাসি চেপে বলে: পায়ের মোজা, কত ধুলোবালি—ডান হাতে করে আনলেন কেন?

এ রকম সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসায় বিভাসের মতো মানুষও ঘাবড়ে গেল। না-না করে বলল, তাতে কি হয়েছে?

হয়েছে বই কি! বলতে গিয়ে প্রগল্‌ভ যূথী সামলে নিল। হাসল একটু। বলতে যাচ্ছিল, হাতে করে না এনে মাথায় করে আনবেন ভেবেছিলাম। কিন্তু বলল না। বলা যায় না এসব। বিশ্রী শোনাবে।

তারপর বলল, কষ্ট করে মোজা বয়ে আনলেন—আচ্ছা, এইটে নিন—এই যে পেন্সিল-স্কেচটা করলাম এতক্ষণ ধরে। আমার প্রীতি-উপহার।

পরম পুলকিত হয়ে বিভাস বলল: আমিও সু-খবর দিই একটা। তোমাদের বাড়ির পাশে রাসবাগানের ঐ জায়গাটা আজকেই বায়না করে ফেললাম কর মশায়ের নামে। গাছপালা কেটে ফেলে সদর-রাস্তার উপর বাড়ি হবে তোমাদের।

স্কেচটা সে নিরীক্ষণ করে দেখছে।

কিসের ছবি এটা?

কিসের বলে মনে হয়? অশ্বত্থগাছের? বাড়ির? পাহাড়ের?

উঁহু, কোন জন্তু-জানোয়ার হবে।

আপনার—। বলে হাসতে হাসতে যূথী এগিয়ে চলল। বিভাস অবাক হয়ে দেখছে, দেখছে তার চেহারা এইরকম নাকি? নিতান্ত আনাড়ি মেয়েটা—ছবি আঁকার ক-খ শেখে নি এখনো, কিন্তু অহঙ্কার দেখ! আবার মনে হয়, তার চেহারার কিছু কিছু আদল আছে যেন ছবিটার মধ্যে। আর আছে যে কুকুরটা শুয়ে ছিল—সেটারও। আশ্চর্য কৌশলে দুটো জীবের ছবি একত্র মিলিয়ে দিয়েছে। মানে কি এর? তার মতো সর্বমান্য ব্যক্তিকে পায়ের কাছে পড়ে থাকা এক কুকুর বলতে চায় নাকি? বিষম ডেঁপো তো!

(৭)

বেণী দুলিয়ে লাফাতে লাফাতে রেখা ঘরে ঢুকল

কে এসেছেন দেখ দিদি।

কে?

চেয়ে দেখে যূথী অবাক হল। চন্দ্রা। কিন্তু একি চেহারা তার? শিশিরের সঙ্গে সেই এসেছিল—সে রাজ্যেশ্বরী-বেশ নেই। রুক্ষ চুলের বোঝা, চোখের কোণে কালি পড়েছে। বিষম ঝড় বয়ে গেছে যেন জীবনের উপর দিয়ে।

কবে এসেছ? কি হয়েছে ভাই? হাকিম সাহেবের খবর কি?

চন্দ্রা বলে, খবর ভাল। দোর্দণ্ডপ্রতাপে তিনি প্রজা-শাসন করছেন।

রেখা বলল, চন্দ্রা-দি ছাত্রী-সমিতিতে এসেছিলেন। আমি সেখান থেকে ধরে নিয়ে এলাম।

চন্দ্রা বলে, একটা দরবার নিয়ে এলাম ভাই তোমাদের কাছে।

কথার ধরনে যূথী আশ্চর্য হয়ে গেছে। বলে, সে সব পরে হবে। আমার ঘরে বসবে চলো যাই—

বারাণ্ডার পাশে চাটাই-ঘেরা ছোট্ট কামরা। যেতে যেতে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে রেখা বলে, বাবা বসতেন, এখন ওটা তো খালি পড়ে থাকে—ছাত্রী-সমিতির কাজকর্ম করব ওখানে। জুতমতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। মাকে বলে রাজি করিয়ে দিতে হবে দিদি। সে তুমি পারবে।

চন্দ্রা বলে, জায়গা যদিই বা পাওয়া যায় এত কাছাকাছি এমন চমৎকার জায়গা কোনখানে মিলবে না। কাকাবাবু বাড়ি থাকেন না সে জন্যে আরও চমৎকার হয়েছে।

রেখা অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, দিতেই হবে দিদি। চন্দ্রা-দি'কে কথা দিয়ে এসেছি। তুমি তো আমাদেরই দলের।

ভয়ের ভাণ করে যূথী বলে : সর্বনাশ—বলিস কি! কোন দল-বেদলের মধ্যে থাকি নে আমি।

বটে? রেখা রহস্য-ভরা চোখে তার দিকে তাকায়, মুখ টিপে হাসে।

যূথী বলে : রাজনীতি করে বেড়ানো আজকাল তোদের ফ্যাসান হয়েছে। আমার ওসব ধাতে সয় না। দেশের মানুষ এক-আধজন নয়, কোটি কোটি। তাদের দুঃখ আছে। তাদের ভেতরে দুঃখী-গুলোকে বাছাই করে নিয়ে সেই দুঃখ ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বিসর্জন দিয়ে কেন আমি বাউণ্ডুলেপনা করতে যাব?

রেখা বলে, ফাঁকি দিয়ে ভোলাতে পারবে না। তোমার এ ঘর কবে সার্চ হয়ে গেছে খবর রাখ?

স্যুটকেশ ছিল খাটের নিচে। হড়-হড় করে টেনে রেখা বের করল। বলে : আমার ফরসা শাড়ি ছিল না, তোমার একখানা পরে বেরুব—তাই খুঁজছিলাম। শাড়ি খুঁজতে আজব জিনিস বেরিয়ে পড়ল। রাজনীতি করো না, তবে এসব কেন তোমার বাক্সে—খদ্দরের শাড়ি, ছাত্রী-সমিতির রশিদ-বই?

এই রে! দশচক্রে দেশসেবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছি। বাঁচাও চন্দ্রা, বলে দাও কার এ সমস্ত।

যূথী উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল। বলে: তাই তো বলি—হরিজনের পুরানো ফাইল আমার টেবিলের উপর এসে জমে কি করে, ছাপানো আর সাইক্লোস্টাইলকরা এত খবরাখবর? অর্থাৎ দিদির সম্বন্ধে ভরসা বেড়ে গেছে বোনটির। কিন্তু পেরে উঠবি নে। এত সব জমকালো শাড়ি আর স্নো-পাউডার-রুজ ভেদ করে আগুন পৌঁছতে পারে কি অন্তর অবধি? তোদের ভয়েই তো এই রকম সর্বাঙ্গ মুড়েসুড়ে মুখে প্রলেপ মেখে ঘুরে বেড়াই।

জমকালো শাড়ি আর স্নো-পাউডার-রুজ—বলেই মনে মনে চমকে গেল যূথী। মহীন বলেছিল ঠিক এই কয়টি কথা—একটা গেঁয়ো তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষ তার রুচি অনুযায়ী কি বলে গিয়েছিল একদিন, সেটা মনের অবচেতনায় রয়ে গেছে এখনো।

চন্দ্রা বলে, নির্মল ঘোষও যদ্দিন ধরা পড়েন নি, শুনেছি বিলেতি স্যুট পরে হ্যাভানা সিগার ফুঁকে চোখে ধুলো দিয়ে বেড়িয়েছেন গুষ্টিসুদ্ধ পুলিশের।

ব্লাউজের ভিতর থেকে কতকগুলো কি কাগজপত্র বের করে চন্দ্রা স্যুটকেশের মধ্যে শাড়ির নিচে রেখে দিল। স্যুটকেশ বন্ধ করে যথাস্থানে সরিয়ে দিল তারপর।

যূথী জিজ্ঞাসা করে, কি?

বোমা রিভলভার নয়, দেখলেই তো। আর তাতেও আপত্তি নেই, সেবারে বলেছিলে।

কিন্তু বোমার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সাংঘাতিক হল কাগজ। আজকাল নানারকম কাগজ হাতে পড়ছে কি না! বাংলা ভাষার এত জোর আছে জানতাম না আগে। লাগসই বিশেষণগুলো যেন বোমা এক একটা। ইংরেজ যে এসব পড়তে জানে না, তা হলে একটা দিনও আর এদেশে পড়ে থাকতে চাইত না এই গালিগালাজ খেয়ে।

খানিক পরে রেখা উঠে গেল। তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে

চন্দ্রা যূথীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কত কথা বলাবলি করল। যূথী বলে, শান্তির নীড়ের বর্ণনা করে চিঠি লিখেছিলে, কতবার লোভ হয়েছে—গিয়ে একবার নিজের চোখে দেখে আসি।

ম্লান মুখে চন্দ্রা বলে, সে নীড়ে আগুন ধরে গেছে। আগুন আজ দেশের সব জায়গায়।

এখানে এসেও চন্দ্রা শান্তি পাচ্ছে না। তার ভাবগতিক দেখে নৃসিংহর সন্দেহ হয়েছে বোধ হয়। আজই দুপুরে চন্দ্রাকে নিজের ঘরে ডেকে শিশির ও তার সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, আদালতের জেরার সামিল অনেকটা। বাপের বাড়ি সে থাকতে পারবে না আর বেশি দিন। বন্ধুদের ও-বাড়ি যেতে মানা করে দিয়েছে, ছাত্রী-সমিতির কাগজপত্র বা কোন নিদর্শন রাখবে না আর ওখানে। সকল সমস্যা মিটত, শিশিরকে যদি সঙ্গে পেত—সে যেমনটি চায় সেইভাবে পেত তাকে। এত কাল ধরে যে আদর্শ মনের ভিতর সযত্নে পালন করে এসেছে, এক কথায় কি করে তা বিসর্জন দেবে—বিশেষ আজকের এই সংঘর্ষের মধ্যে, যখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ হাসিমুখে প্রাণ দিতে এগিয়ে চলেছে?

শিশিরকে চন্দ্রা চিঠি লিখছে—

চলে এসো তুমি দাসত্বের তকমা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে! মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করবে তখন। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুক আশায় উদ্বেগে স্পন্দিত হচ্ছে, তোমার বুকও সেই ছন্দে নেচে উঠুক; সকলের সঙ্গে এক হয়ে দাঁড়াও তুমি। দেশ-বিদেশের যে সব বিপ্লব-কথা পড়ে আসছি, চোখের সামনে তেমনি, ঝড় উঠেছে—চোখ মেলে দেখ। এই পরম দিনের ইতিহাসে ভাবীকালের সন্ততিদের সামনে তোমার নামটা কলঙ্কিত অক্ষরে থাকবে, এ আমি চাই নে, কিছুতেই চাই নে। তোমার অফিসের ফাইল, মুষ্টিমেয় কর্মচারী

ও মোসাহেবদের স্তব-গুঞ্জনের বন্দিত্ব উন্মোচন করে বেরিয়ে এসো মুক্তির উদার প্রান্তরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় চিরদিন প্রথম হয়ে মর্যাদা পেয়ে এসেছ, আজকে জাতীয় পরম পরীক্ষার দিনে প্রথম সারিতে লাঞ্ছনার মুকুট পরে এসে দাঁড়াও। আমায় তুমি এত ভালবাসো – আজ আমি আকুল আগ্রহে ডাকছি, এসো— চলে এসো তুমি—

আবার এক চিঠি ক'দিন পরে—

কাজের শেষে ক্লান্ত শয্যায় শুয়ে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। এই পরমক্ষণ হেলায় যেতে দেওয়া হবে না। ১৮৫৭ অব্দে স্বাধীনতার জন্যে যে আলোড়ন জেগেছিল, তারই প্রবলতম রূপান্তর—মুষ্টিমেয়র মানস-স্বপ্ন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে এবার। এত বিদ্যা, ও বুদ্ধির অধিকারী হয়ে এই সোজা জিনিসটা বুঝতে পারছ না কেন, লাঠি চালিয়ে, বন্দুক মেরে গণ-সংগ্রাম ঠেকানো যায় না। পৃথিবীর কোন শক্তি পেরেছে ? বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পড় নি ? গবর্নমেণ্ট দাঁড়িয়ে থাকে সর্বসাধারণের ভালবাসা ও ভয়ের ভিত্তির উপর। আজকের এই গবর্নমেণ্টকে কেউ ভালবাসে না; আর লোকের মনে ভয় জাগানোর শক্তিও ইংরেজ হারিয়ে ফেলেছে পরাজয়ের পর পরাজয়ে। ইংরেজের এখন উদ্দেশ্য হয়েছে, ন্যায়-অন্যায় বাছবিচার না করে যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত কোন রকমে গণ-প্রতিরোধ ঠেকিয়ে রাখা। যুদ্ধান্তে তারপর ঠাণ্ডা মাথায় আর এক দফা দরাদরি এবং নূতনতর কলাকৌশল খাটিয়ে দেখবে। তুমি কেন এর নিমিত্তের ভাগী হতে যাবে ? এসো, আমরা ইতিহাসের মানুষ হই, নূতন ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে স্থান করে নিই। ভবিষ্যতের স্বাধীন, সুখী নরনারীর সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে, দেশদ্রোহী বলে সকলে আঙুল দেখাবে তোমার দিকে—এই কল্পনা আমাকে পাগল

করে তুলছে। পথ তাকিয়ে আছি—তুমি এসো, ঝাঁপ দিয়ে পড়ো—

(৮)

খবরের কাগজের সন্ধানে যূথী এঘর-ওঘর করছিল। কামরায় উঁকি দিয়ে দেখল, চন্দ্রা এসে গেছে। ছাত্রী-সমিতির কাজ জোর চলেছে, অনুমান হচ্ছে। রেখা আর চন্দ্রা চাপা গলায় কি কথাবার্তা বলছিল, যূথীকে দেখে থেমে গেল।

রেখা বলে, কাগজ তো চাই সকালবেলা—কিন্তু কি লিখছে, পড়ে থাক দিদি?

পড়ি বড় অক্ষরে যেগুলো থাকে সামনের পাতায়।

চন্দ্রা বলল, কাগজ বন্ধ। সরকারি কড়াকড়ির প্রতিবাদে কাগজ আপাতত বের করবে না ঠিক করেছে।

যূথী বলে, মুশকিল হল—সকালের চা বিস্বাদ লাগবে। আমি বিস্কুট-রুটি খাই নে, চায়ের অনুপান হল খবরের কাগজ।

চন্দ্রার দিকে চেয়ে বলল, তোমাদের 'সংগ্রাম' পড়ে মোটেই নেশা জমে না। টাটকা নির্ভেজাল রুদ্ররস—এতটুকু গেঁজে ওঠে নি।

'সংগ্রাম' আমাদের?

হেসে উঠে যূথী বলে, ছাত্রী-সমিতির। বেনামি হলেও বুঝতে পারি। কিন্তু ঐ যা বললাম, পেট-রোগার দেশের মানুষ—অত নির্জলা সত্য সহ্য হয় না, লাইন আষ্টেক পড়েই ভাঁজ করে চাপা দিয়ে রাখি।

রেখা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিতে চায়।

কাগজ না থাকা মানে জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়া। সত্যি, কারাগারে বন্দী হয়ে থাকবার অবস্থা হয়েছে আজকাল। বড্ড খারাপ লাগে।

যূথী বলে, লাগবারই কথা। কারণ কাগজে যা পড়ি সে সব তো খবর নয়—মনের সান্ত্বনা।

মানে ?

ঘরে বসেও বানানো যেতে পারে। নিজে বানালে মনের তৃপ্তি হয় না—এই যা।

চন্দ্রা হাসতে লাগল। রেখা বলে, এই যে এত লড়াইয়ের খবর—কিছুই সত্যি নয়, বলতে চাও ?

লড়াইয়ে সত্যকেই তো বধ করতে হয় সকালের আগে। আচ্ছা, এই একটা ব্যাপারের হিসাব করে দেখ না। ক'বছর চলল লড়াই ?

আঙুলের কর গুণে যূথী হিসাব করতে লাগল, ইংরেজ যুদ্ধ-ঘোষণা করল উনচল্লিশ সনের তেশরা সেপ্টেম্বর ; আজ বারোই সেপ্টেম্বর। তা হলে দাঁড়াল তিন বছর নয় দিন। রোজই শত্রুপক্ষের হতাহতের হিসাব বেরুচ্ছে। যোগ দিয়ে দেখ, একটা অখণ্ড মানুষও নেই আর বিপক্ষ দলে।

রেখা হেসে টিপ্পনি কাটে, তা-ই বা কেন—সবসাকুল্যে শত্রুর যে জনসংখ্যা, তার বেশি মারা পড়েছে, হিসাব করে দেখ।

যূথী বলে, ঐ তো মজার। আর 'সংগ্রাম' পড়ে মনে হয়, কাগজ নয়—আস্ত একখানা পাটীগণিত। পাঁচ আর তিনে আট—তোমাদের 'সংগ্রামের' হিসাবে পাঁচ আর তিনে বারো কক্ষণো হবার উপায় নেই।

তারপর চন্দ্রার দিকে চেয়ে বলে, আজকের নতুন কি কি খবর বল ভাই। নতুন কাপি আনলে ?

রেখা বিস্ময়ের ভান করে বলে, কাপি—কিসের কাপি ?

যা তুই ষ্টেন্সিল-কাগজে নকল করিস দুপুরবেলা দরজা এঁটে দিয়ে, আর রাত-দুপুরে চুপি-চুপি উঠে বসে।

রেখা বলে, যাও—বয়ে গেছে আমার।

তবে? ও-সময়ে ঘুম ভেঙে উঠে মেয়েরা যা লেখে সে বয়স তোর হয় নি। আর সে রকম মেয়ে তুই নোস বলেই তো জানি।

বাজে কথা বোলো না দিদি—বলে লঘু হাতে রেখা কিল মারল যূথীর পিঠে।

মারিস কেন? মাকে ডেকে এক্ষুণি তাঁর সামনে ছাত্রা-সমিতির ঘর সার্চ করব কিন্তু বলে দিচ্ছি।

নিম্নকণ্ঠে রেখা বলল, যা বললে বললে। খবরদার দিদি—মার কানে গেলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘরের বার করে দেবেন এখনি।

ভাবনা কি! আর এক দল ওৎ পেতে আছে, হাতে শিকলি পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে পাকা ঘরে তুলবে। পথে পড়ে থাকবি নে।

চন্দ্রা বলল, সে কথা সত্যি, প্রেমপত্র লিখে মার্জনা আছে, এসবে নেই। বাপ-মা থেকে সরকারি লাটবেলাট অবধি মনে মনে চায়, দেশের ছেলে-মেয়ে ঐ প্রেমপত্র লিখে লিখেই বেড়াক। তা হলে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে।

তারপর বলে, লেখো ভাই না 'সংগ্রামে'। এত সুন্দর লেখো তুমি! আমার জরুরি কাজে ডাক পড়েছে, দূরে—অনেক দূরে চলে যেতে হবে হয়তো। বসে বসে লিখবার সময় নেই।

যূথী শিউরে ওঠে। রক্ষে কর—খাই দাই, ঘুমুই, দিব্যি আছি। জান তো, দেশের দুঃখ আমার মনে দাগ কাটে না।

চন্দ্রা বলে, মনের গরজ নেই—শুধু কলম চালিয়ে যাও এই কয়েকটা দিন। খেও, ঘুমিও, ফাঁকে ফাঁকে আমাদের খবরগুলো একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দিও। তাতেই চলবে।

অনেক বলাবলির পর যূথী রাজি হল।

সত্যি-মিথ্যে জানি নে কিন্তু, হরদম গাল-গল্প চালিয়ে যাব। পাগলা-গারদে পাগলদের না পাঠিয়ে তাদের নাচিয়ে দেখে মজা পাই।—সেই মজার খাতিরেই ভার নিচ্ছি আমি।

'সংগ্রাম' মাসে দু-বার বেরোয়। নূতন সংখ্যার জন্য যূথী লেখা তৈরি করছে।

মনের নয়—শুধু মাত্র কলমের লেখা। চন্দ্রা তার বেশি চায় নি, যূথীও নিছক খবর সাজিয়ে দেবে—এই মতলব নিয়ে বসেছে। কিন্তু খবরের মধ্যে মানুষ উঁকি দেয় যে! হাজার হাজার মুমুক্ষু মানুষ—জীবনের চাঞ্চল্যে একদা যারা দোলায়িত ছিল। অলক্ষ্যে তারা যেন ঘিরে এসে দাঁড়ায়, কথা বলে, মান-অভিমান করে। মরে গিয়েও মরে নি বলে ভারত-রক্ষা আইন জগদ্দল পাষাণ চাপা দিয়ে মারতে যাচ্ছে। বে-আইনি 'সংগ্রামের' পাতায় বেরিয়ে এসে তারা নিশ্বাস ফেলতে চায়, পরিচয় রেখে যেতে চায়। প্রতিদিনের জীবনে অতি-সাধারণ নম্র নগণ্য মানুষ বিয়াল্লিশের আগস্টের পশ্চাৎ-পটে অকস্মাৎ ভাবী ইতিহাসের মহানায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে! চোখে দেখে নি বলেই যূথীর কাছে তারা দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন, অতি নিখুঁত—পূর্ণায়ত।

মা, মা আমাদের! যূথী সামলাতে পারে না নিজেকে, উপুড় হয়ে প্রণাম করে বসবে নাকি লেখা ঐ কাগজখানার উপর!

বিধবা গোলগাল মুখ, ধবধবে থান কাপড়-পরা—তিনি চলেছেন সকলের আগে। পতাকা উড়ছে, দৃঢ়-পায়ে এগুচ্ছে মিছিলের নরনারী—উন্নত-শির। মাটি কাঁপছে পায়ের দাপে।

এক হাতে শঙ্খ, আর এক হাতে পতাকা—মা চলেছেন। উদ্যত আছে বন্দুক-বেয়নেট-রিভালবার। হুঁসিয়ার!

বোঁ-ও করে গুলি লাগল ডানহাতের কনুইয়ে। শঙ্খ মাটিতে পড়ে চুরমার হল। একটু বিকৃতি দেখল না কেউ মায়ের মুখের উপর, এক পা-ও তিনি থমকে দাঁড়ালেন না। বাঁ-হাত গেছে—ডানহাত রয়েছে এখনো; ডানহাতের পতাকা প্রসন্ন বাতাসে উড়ছে।

কিন্তু গুলির ভাণ্ডার ফুরোয় নি—এবার ডানহাতে। কাঁপছে পতাকা—পড়ে যায় বুঝি! আর একটু···সামনে···লক্ষ্য ঐ কয়েক পা দূরে মাত্র। গুলি ছুটল কপাল নিরিখ করে। পাকা হাতের টিপ—ফসকায় না! ধূলোয় মা মুখ থুবড়ে পড়লেন। তিয়াত্তর বছরের অস্থিসার আঙুলগুলো বজ্র-মুষ্টিতে পতাকা ধরে আছে। নিষ্প্রাণ—কিন্তু মুষ্টি শিথিল হল না। অজ পাড়াগাঁয়ের-চাষীঘরের বিধবা—ধূলো থেকে উঠে শাশ্বত কালের দরজায় এসে তিনি দাঁড়ালেন অনন্ত-মহিমায়। গান্ধী বুড়ি—মাথা নোয়াও সকলে!

*　　　　*　　　　*

চন্দ্রা এসেছে। এসে একটা স্লিপ টেনে নিয়ে পড়ল। পড়তে পড়তে মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

যূথী বলে, হচ্ছে?

ঠোঁট উলটে চন্দ্রা বলল, খবরের কাগজের খবর হচ্ছে না এ কিন্তু—

সগর্বে যূথী বলে, শিল্পীর আঁকা ছবি হচ্ছে। কিম্বা কাশ্মীরি মিহিন জামিয়ার। দশ মিনিটে সম্পাদকীয় দেড়গজি মূশল বানানো—আর যার হোক, আমার ক্ষমতায় আসে না।

চন্দ্রা বলে, কিন্তু দামি কাগজও এ তোমার নয়! বিচলিত হয়ে পড়েছ তুমি, শিল্পীর নিরাসক্ত দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে। ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছ, কূলে দাঁড়িয়ে দেখবার ধৈর্য নেই। তাই না হয়েছে সাহিত্য, না হল সংবাদ। খবরের কাগজের মতো এ সমস্তও ক্ষণজীবী। খবরের কাগজের পরমায়ু ছ-ঘণ্টা, এর না হয় ছ-বছর। এসব ভাবালুতা মহাকাল ছুঁড়ে ফেলবে পা দিয়ে।

রেখা বলে উঠল, মন সামলে রাখতে পারো না দিদি। মনে তোমার ছোঁয়াচ লেগে গেছে এরই মধ্যে।

যূথী স্নিগ্ধ হাসি হাসল ওদের দিক চেয়ে, জবাব দিল না। তারপর স্বপ্নময় দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাল। রাসবাগানের

বিশাল আমগাছটা কালো ছায়াপুঞ্জের মধ্যে ঝিমোচ্ছে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মহাকাল করে করুক অবহেলা, লেখাটা পড়তে পড়তে এদের দু-জনের চোখের ঔজ্জ্বল্য সে লক্ষ্য করেছে। নূতন কালের দীপ্তশ্রী মেয়ে—এদের মনের আগুন আরও প্রদীপ্ত হোক। দূর-কালের জন্য বিশাল সৃষ্টি আর যখনই হোক, প্রাণান্তক সংগ্রাম-কালের মধ্যে সম্ভব নয় কখনো।

কড়া রোদ আজ সকালবেলা থেকে। দুপুরের পর একপশলা বৃষ্টি হয়ে চারিদিক ঠাণ্ডা হল। রেখার হাতের লেখা ছাপার অক্ষরের চেয়েও ভাল। চেয়ারের উপর উবু হয়ে বসে সে তীক্ষ্মমুখ পেন্সিল দিয়ে সযত্নে লিখে যাচ্ছে স্টেন্সিল-কাগজের উপর। চারিদিক নিঃশব্দ। হাই উঠছে যূথীর, চোখে ঘুমের আবেশ। একসময়ে চোখ বুজে খাতাটি রাখল পাশবালিশের উপর। ঘুমুবে না, ঘটনাগুলো পর পর ভেবে নিচ্ছে। না, সে ঘুমুবে না—ঐ চিপগুলো শেষ হয়ে গেলেই তো রেখা আবার কাপির জন্য তাগিদ দেবে। ঘুমুলে চলবে না এখন···

*   *   *

ফিসফিস করে কথা বলছে কারা। অনেকগুলো কণ্ঠ, আর এত আস্তে বলছে যে বোঝা যায় না। কাচের চুড়ির আওয়াজ। যূথী যেন প্রশ্ন করে : কে তোমরা ভাই?

একটি কণ্ঠ স্পষ্ট হল খানিকটা। বলে, নাম শুনে কি হবে? একটা কথা বলো তো ভাই, এর পর আমায় কি ঘরে নেবে? কী দোষ আমার? গ্রামসুদ্ধ মানুষ পারল না—দিনদুপুরে চোখের উপর স্বামীকে টেনে-হিঁচড়ে কোথায় নিয়ে গেল—আচ্ছা, বেঁচে আছেন তিনি, না ঘর পোড়ানোর মতো তাঁকেও পুড়িয়ে মেরেছে? আমি তো বিছানায় পড়ে সেই থেকে—

চোখ তুলে দৃষ্টির সামনে যূথী যেন দেখতে পাচ্ছে, বিশীর্ণদেহ বউটি রক্তস্রোতে ভাসছে। একটি ভ্রূণ পড়ে পাশে।

আরও দেখতে পাচ্ছে সে অনতিদূরে। গ্রামের মিছিল শহরের সঙ্কীর্ণ উঠানের ধারে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ ভিতরে ও বাইরে। হাত বাড়িয়ে একজন কে টলছে—প্রসারিত করতলে দু'টি পয়সা। পয়সা নয়—বুকের রক্তে-চোঁয়ানো দু'টি মাণিক। মৃত্যুপথিক শেষ কামনা জানাল—তার সম্বল এই পয়সা দুটো দেশের কাজে যায় যেন। এ পয়সা খরচ করা হবে না, মিউজিয়ামে রেখে দেব আমরা। আগামী কালে স্বাধীন-ভারতের নরনারীরা দেখবে ঘুরে ঘুরে।

*　　　*　　　*

···দেখ, বস্তার চাল ঢেলে নিয়ে কি করো তোমরা সেই বস্তাটা? একপাশে রেখে দাও, হয়তো বা ঠেলে ফেল পা দিয়ে। খালি বস্তার চেয়েও বেহাল অবস্থা হয়েছিল আমার। গয়না-পত্র কেড়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল পুকুরের জলে···

*　　　*　　　*

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ঐ কে রে?

ফুটফুটে ছেলে, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, হাতের দুটো আঙুল মুখের ভিতর, কত অভিমান তার কান্নায়!

কেঁদো না খোকা—

ছোট্ট এক ভাই মরে গিয়েছিল যূথীর—বছর দুয়েকও পোরে নি সে সময়। থাকলে আজ সাত-আট বছরের এমনিটাই হত। মরবার সময় গলার ঘড়ঘড়ানি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, জল গড়িয়ে পড়ছিল চোখের কোণে। পৃথিবীতে এত বাতাস—আর একটুখানি বাতাসের জন্য বার বার হাঁ করছিল অবোধ অসহায়

শিশু। স্বপ্নের মধ্যে সেই খোকা যূথীর কাছে এসে যেন দাঁড়িয়েছে দীর্ঘ বছর ছয়েক পরে।

এসো ভাইটি আমার—

না—

আরও সে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

এসো। 'আবার খাবো' সন্দেশ খেতে দেব তোমায়। যত বার দেব, বলবে—আবার দাও। এমনি খাসা সে সন্দেশ। এসো—

খাব কি করে? দেখ, দেখ তো—

কান্নায় ভেঙে পড়ল খোকা। গলায় লাল রুমাল জড়ানো। রুমাল খুলে সে দেখাল।

ওঃ! শিউরে উঠতে হয় দেখে। গলা দিয়ে রক্তের ধারা বইছে, গলা ছেঁদা করে গুলি বেরিয়ে গেছে।

খোকা বলে, আমি কত চেঁচিয়েছিলাম—শুনতে পাও নি? ঘরে কি খিল এঁটে বসেছিলে তোমরা সব?

জরুরি আইনে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা যে আমাদের! ছোট জেলের বাইরে আবার এক বড় জেল বানিয়ে আটকে রেখেছে গোটা দেশের সমস্ত মানুষ। কানে শুনে থাকলেও মুখ বুজে আছি। বুকের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে আগুনের।

খোকা বলতে লাগল, চেঁচামেচি শুনে রাস্তায় গিয়েছিলাম সবাই ইট মারছে দেখলাম ট্রামগাড়িতে। আমিও মারলাম একটা। এই এতটুকু—বড় ইট আমি কি তুলতে পারি? সত্যি, দোষের বলে আমি বুঝতে পারি নি—সবাই মারছে, আমিও মেরেছিলাম। আর অমনি খটাখট আওয়াজ করে তেড়ে এল।

কে?

ফিরে দেখেছি নাকি? কাঁদতে কাঁদতে আমাদের গলিতে ঢুকলাম। রোয়াকে উঠেছি। দরজায় ঘা দিচ্ছি, ও মাগো—বলে ডাকছি মাকে। ফট-ফট আওয়াজ হল, গলা আমার ফাঁক হয়ে

গেল। পড়ে গেলাম। গলার এ ছেঁদা জুড়বে কি কোনদিন?···

*   *   *

পরের দিন সকালে যূথী আবার কলম নিয়ে বসেছে। সারারাত স্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্নের জড়িমা সে ঘোচাতে চায় না। ঘুম ভেঙেই লিখতে আরম্ভ করেছে, নেশা পেয়ে গেছে লেখার মধ্যে···

বলতে পারেন, স্বর্ণর বিয়েটা হয়ে গেছে কিনা? বড্ড উদ্বেগের মধ্যে আছি।

স্বর্ণ কে?

আমার বোন স্বর্ণলতা। বোন বলে জাঁক করছি নে—সবাই বলত, নামটা তার পক্ষে বেমানান নয়। তবু বিয়ে হয় না, পাড়ার লোকে ভাংচি দেয়। পাড়ার লোক মানে বিজয় আর তার বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ হবে। সন্দেহ করে একদিন আচ্ছা করে পিটুনি দিয়েছিলাম বিজয়কে। কী চোখে দেখেছিল স্বর্ণকে, তক্কে তক্কে থাকত, কোন সম্বন্ধ নিয়ে এলে বেনামি চিঠি পাঠাত। অথবা আড়ালে-আবডালে পাত্রপক্ষের কারও সাক্ষাৎ পেলে মুখে বলত, মেয়ের শ্বেতি আছে মশায় হাঁটুর উপর দিকটায়। পাড়ার ছেলে আমরা এতটুকু বয়স থেকে দেখে আসছি।

শেষাশেষি স্বর্ণও দূর-দূর করত তাকে দেখলে। বাড়ির ভিতরে মা দিদি এঁদের কাছেই শুনেছি। এরই ফলে কিনা বলতে পারি নে—বিজয় একেবারে গ্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশ। জুত হয়ে গেল, বিয়ে সাব্যস্ত করতে তারপর আর একটা মাসও লাগল না। খুব বড়ঘর—তারানাথ দত্ত মশায়ের মেজ ছেলের সঙ্গে। মনের স্ফূর্তিতে তোমাদের কলকাতার শহরে এলাম বিয়ের বাজার করতে। কিছু কিছু কিনেছিও। তারপর গণ্ডগোল। কিন্তু গণ্ডগোল বলে থামবার উপায় তো নেই—দিন এগিয়ে আসছে, ময়রাকে বায়না দেওয়া হয়

নি তখনো, বাড়ি গিয়ে বন্দোবস্ত করতে হবে। মেস থেকে সকাল সকাল খেয়ে সবে কলেজ স্ট্রীটে পড়েছি···

ফুটফুটে এক বিয়ের কনে। আইবুড়ভাত হয়ে গেছে, লাল-পেড়ে নূতন কাপড় পরা, তাতে হলুদের দাগ। কচি-কচি মুখ—বছর ষোল বয়স হবে, সকালবেলার রোদ পড়ে মুখখানা সোনার মতো ঝিকমিক করছে।

ভিড়ের মাঝখানে ঢুকে পড়ো স্বর্ণলতা। শিগগির। বিয়ে আর ক'টা দিন পরে, এত সামনে এগিয়ে দাঁড়ায় ?

কড়া গলায় হুমকি আসে : খাড়া হও—এটা সরকারি অফিস।

ষোল বছরের মেয়ে ছুটে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

আমাদেরই সরকার। জাতির সেবক তোমরা—বিদেশির গোলাম নও। সরো, আপিসের ছাতে নিশান উড়াব।

মানা করছি। ভবিষ্যৎ ভেবে দেখ।

এক ঝাপটা বাতাস এল—পত-পত করে উড়ল পতাকা। লক্ষ লক্ষ মানুষের কত আকাঙ্ক্ষা কত স্বপ্ন আর কত শোণিতে রঙিন পতাকা আমাদের !

ড্রুম—ফট !

পড়ে গেল স্বর্ণলতা। নিশ্বাস নিতে পারছে না, বাঁ-হাতে মাটি হাতড়াচ্ছে। ডানহাতও কাঁপছে থর-থর করে। পতাকা মাটিতে পড়ে গেল, মুঠোর মধ্যে ধরা আছে তবু। এদিক-ওদিক অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

জনতা ভেদ করে ছুটতে ছুটতে এল এক যুবা। পতাকা লুফে নিল তার হাত থেকে।

এই যে আমি—

আয়ত চোখে স্বর্ণলতা একবার তাকাল। তারপর চোখ বুজে এল। ড্রুম, ড্রুম !

বিজয়ও পড়ে গেল তার পাশটিতে। স্বর্ণলতার রাগ মিটে

গেছে। মরা মুখে কখনো হাসি দেখেছ? দেখ ঐ চেয়ে····

এ কী হল। এক থেকে আর এক হাতে চলেছে সেই বিশাল পতাকা। কত গুলি করল নিরস্ত্র মানুষের উপর! গতি নিরুদ্ধ হয় না—হাউয়ের মতো তীর-গতিতে ছুটে আসছে। আর পিছনে সংখ্যাতীত ছোট ছোট পতাকা উড়ন্ত প্রজাপতির মতো যেন অভিনন্দন জানাচ্ছে বৃহৎ পতাকাটিকে। সহসা ও কি! কনেস্টবল আঙুল তুলে দারোগাকে দেখায়। গণ্ডগোলের মধ্যে কে কখন কি ভাবে ছাতে উঠে পতাকা বেঁধে দিয়ে এসেছে। যেখানে বন্দুক ধরে দাঁড়িয়ে—ঠিক তার উপর, একেবারে মাথার উপরে পতাকা উড়ছে। ধাঁধাঁ লেগে যায়, থানাটাই যেন এক স্বদেশি দুর্গ। হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে দারোগার। রাগে দিশা না পেয়ে বন্দুক ছুঁড়ল সে পতাকা তাক করে। উড়তে উড়তে পতাকা যেন বিদ্রূপ করে বন্দুক আর বন্দুকধারীদের দিকে।

দারোগা গর্জন করে ওঠে: পাঁচ-পাঁচ জন তোমরা গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছ নাকি? তলে তলে তোমরাও নিশ্চয় স্বদেশি দলে।

কনেস্টবলরা বিনাবাক্যে উর্দি-চাপড়াস খুলে রেখে দিল।

যাও কোথায়? অত সহজে ছাড় পাওয়া যায় না। অ্যারেস্ট করা হল তোমাদের।

সে বরঞ্চ পরে দেখবেন স্যার আপনি কোন পথ ধরবেন, এখন তাই ভাবুন। থানা ঘিরে ফেলেছে।

(৯)

ছাইরঙের ট্রাক একের পর এক সারবন্দি আসছে—ইংরেজ সরকার মরে নি, তার নির্ভুল অকাট্য প্রমাণ। সাদা আর কালো সৈন্য শিশিরের মহকুমা-শহর ছেয়ে ফেলল. বুটের দাপে অলিগলি কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। চৈত্রমাসে শিমূলবনে ফল-ফাটার মতো লুইস-

গানের আওয়াজ। শহর যারা দখল করতে এসেছিল, কে কোথায় ছিটকে যাচ্ছে। বেড়াজাল ফেলার মতো টেনে-হিঁচড়ে বের করছে তাদের।

পূর্ব-পাড়ার ভিতর পালিয়ে আছে নাকি বড় একটা দল।

এক-একটা রাস্তা ধরে বাড়ির পর বাড়ি খানাতল্লাস হচ্ছে। খবর ঠিকই—অনেকগুলোকে পাওয়া গেল। ক্ষেপে গেছে যেন শিশির। দুপুর গড়িয়ে গেছে, নাওয়া-খাওয়া হয় নি, কপালের শিরা দপ-দপ-করছে, চোখ লাল। তার গাড়িতে ইটের বৃষ্টি হয়েছিল এই রাস্তায়। অকথ্য গালিগালাজ করে বেনামি চিঠি দিয়েছিল। বজ্জাতগুলোকে সিধে না করে সোয়াস্তি নেই। সেই শেষরাত্রি থেকে অবিশ্রাম ছুটোছুটি করছে সার্চ-পার্টির সঙ্গে। আর এর পরের অধ্যায়ও সাব্যস্ত করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। সরকারি ক্ষতি কি পরিমাণ হয়েছে, তার হিসাব করা হচ্ছে। দুনো অন্তত উশুল করবে পাইকারি-জরিমানা করে—বিশেষ করে এই পাড়াটার উপর।

নিবারণের বাড়ির সামনে এসে সে প্রসন্ন হল। দরজা বন্ধ। পাড়াময় এত সোরগোল, জানলার একটা কপাট খুলে দেখবার পর্যন্ত কৌতূহল নেই।

একজন মনে করিয়ে দিল: এটা বাদ থেকে গেল স্যার—

দরকার হবে না। আমার নিজের লোক। ও-দিকটা শেষ করতে লাগো তোমরা—আমি আসছি।

ঘা দিল দরজায়। সাড়া নেই। শিকল ধরে জোরে নাড়া দিল। ডাকতে লাগল: আমি গো আমি। ভয় নেই, স্বদেশি-টদেশি নই আমি।

সন্দেহ জাগে, বাড়ি ছেড়ে এরা চলে গেছে নাকি কোথাও?

অনেক ডাকাডাকির পর জানলা খুলে গেল। নিবারণ।

শিশির বলে, জল-তেষ্টা পেয়ে গেছে সেরেস্তাদার বাবু। দোর খুলুন।

হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে নিবারণ বললেন, আজ্ঞে—

শিশির হেসে উঠল। বলে, সব ঠাণ্ডা—কোন ভয় নেই। বড্ড কষ্ট হয়েছে, একটুখানি জিরিয়ে যাব। কই, কি হল?

অবশেষে নিবারণ দরজা খুললেন। মনমরা ভাব।

কি ব্যাপার বলুন তো?

সরু পথটুকু অতিক্রম করে বৈঠকখানায় পা দিয়ে শিশির শিউরে উঠল। যে তক্তাপোষে এসে সে গড়িয়ে পড়ত, দেখে—আষ্টেপিষ্টে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটা মানুষ তার উপর। মেজেতেও দু-জন—পা ফেলবার জায়গা নেই। খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে দেখা গেল, সেখানেও ঐ অবস্থা। বাড়ি যেন হাসপাতাল। তার সরকারি পোশাক দেখে রোগিরা বিচলিত—ক্ষমতা থাকলে বোধকরি ছুটে পালিয়ে যেত।

কাজল বাটিতে করে বার্লি আনছিল এদের কারও জন্যে। তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। যেন ভূত দেখেছে, এমনি আতঙ্কিত চেহারা।

হুঁ—বলে ক্ষুব্ধ আক্রোশে শিশির একবার নিবারণের দিকে আর একবার কাজলের দিকে তাকাল।

কাজল সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। গর্বিত হাস্যে সহসা বলে উঠল, আমার দাদার খবর পাওয়া গেছে, শুনেছেন? সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ দলে মিশেছেন। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই হবে বলে তাঁদের ট্রেনিং হচ্ছে সেখানে।

পা টলছে, শিশির দাঁড়াতে পারছে না। বসে পড়ল তক্তাপোষে আহত মানুষটার পাশে। মিনিট কয়েক গেল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাজলের দিকে চেয়ে বলে, যাচ্ছি কাজল, দরজা বন্ধ কর।

কয়েক পা গিয়ে পিছনে তাকায়। কবাট সে-ই ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়েছিল, এতক্ষণে নিশ্চয় ওরা খিল এঁটে দিয়েছে। হাসিমুখে কোনদিন ওরা আর দরজা খুলে দেবে না।

বাড়ি ফিরে এসে শিশির চন্দ্রার চিঠি পেল :

একাই চললাম, তুমি এলে না। এ চিঠি যখন পাবে, তখন আমি বরানগরের বাড়ি থেকে অনেক—অনেক দূরে চলে গেছি। এই বাংলারই প্রত্যন্তে মণিপুরের একটা অঞ্চল পুরোপুরি স্বাধীনতা পেয়েছে—সেই তীর্থভূমিতে চলেছি আমি। যার জন্য ক্ষুদিরাম-কানাইলাল থেকে চট্টগ্রামের সূর্য সেন অবধি হাসিমুখে ফাঁসিকাঠ চুম্বন করেছেন। তাঁদের স্বপ্ন মঞ্জরিত হল এতকাল পরে। জানি এ ক্ষণিকের, বৃটিশের অস্ত্র তীক্ষ্ণধার এখনো—মৌসুমি ফুলের মতো এ স্বাধীনতা স্বল্পস্থায়ী। আসমুদ্র হিমালয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার আনন্দ-দিন এ জীবনে চোখে দেখব কিনা জানি না—আমি চললাম পৌনে দু-শ বছরের কালরাত্রির পটে ক্ষণ-বিদ্যুতের ঝিকিমিকি দু-চোখ ভরে দেখে নিতে।

শুধু দেখা নয়, কাজ আছে আমার। নেতাজির গবর্নমেণ্ট থেকে জরুরি ডাক এসেছে। কাজ সকলেরই, কিন্তু আজকের অসম-সংগ্রামে আহ্বান ঠিক ঠিক সকলের কানে পৌছানো যাচ্ছে না। যদি কোনদিন শুনতে পাও, বুলেটে আহত হয়ে মারা গেছি, সেদিন কিন্তু আর রাগ করে থেকো না। দেশব্যাপ্ত রাজসূয় নিমন্ত্রণে তোমার চন্দ্রা যোগ না দিয়ে পারল না।

পুনশ্চ করে লিখেছে :

কাল রাত্রে দস্তুরমতো ঝগড়া হল বাবার সঙ্গে। জীবনে তিনি আমার মুখদর্শন করবেন না বলেছেন। স্বপ্নেও কি ভেবেছেন, তাঁর মুখের কথাই ঘটতে যাচ্ছে সত্যি সত্যি? আমারও অসুস্থ মন—অনেক অশোভন কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এঁরা ভাববেন, রাগ করে আমি তোমার কাছে চলে গিয়েছি। কিম্বা তোমার দেশের বাড়িতে।

তোমার প্রতি আমার কর্তব্যচ্যুতি হল, এর জন্য দায়ী কালসন্ধি। চিরাচরিত নিয়ম-নীতি দ্রুত বিবর্তিত হয়ে নব জীবন-প্রণালীর

অভ্যুদয় হচ্ছে। আমাদের ছোট্ট নীড় ভেসে গেল সেই আবর্তে। সেই বিপুল প্রবাহের খড়-কুটো আমরা—দুঃখ এই, দু-জনে একসঙ্গে ভাসতে পারলাম না।

চিঠি পড়ে শিশির স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিকক্ষণ পরে রাখালকে ডাকল : রাখাল, তুই দেশে যেতে চাচ্ছিলি—

হ্যাঁ। দাও না ছুটি, ঘুরে আসি মাসখানেকের মতো।

যা। সন্ধ্যের গাড়িতে চলে যা আজকে।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর, রাগের কোন লক্ষণ নেই। রাখাল মনের আনন্দে বাক্স গোছাতে গেল। পাখনা থাকলে এই মুহূর্তে উড়ে চলে যেত, সন্ধ্যার গাড়ির জন্য অতক্ষণ অপেক্ষা করে থাকত না—এই তার মনের অবস্থা।

শিশির তাকিয়ে দেখছে। স্নান করল না, খেল না। ফাইলের গাদা নামিয়ে নিয়ে বসে গেল, সরকারি ক্ষতির হিসাবটা এখনই শেষ করে ফেলবে। ভরা-পিস্তল তার পাশে। আসুক না, কে আসবে তার সামনে শত্রুতা সাধতে। ফাইল আর পিস্তল—দুটো জিনিসই যথেষ্ট জীবনের পক্ষে, মানুষের কোন প্রয়োজন নেই।

(১০)

পরেশ ডাক্তার রোগি দেখে একটা কুড়িতে বাসায় ফিরেছেন। খেতে বসেছেন ঠিক একটা-ছাব্বিশে। কাপড়চোপড় ছাড়া, স্নান করা—সমস্ত এই ছ-মিনিটের মধ্যে। একদিনের ব্যাপার নয়—এটা নিত্য-নৈমিত্তিক।

ডাক্তার-দা!

নিশম্ভু চোখে ভাল দেখে না, কিন্তু শব্দভেদী কান—একটা সূঁচ

পড়লেও বোধকরি শুনতে পায়। পিছনের গলি দিয়ে সুড়ুৎ করে সে রাস্তায় এল।

বাড়ি নেই।

ডাকছে বঙ্কিম। এই আড্ডায় মাঝে মাঝে আসে, নিশম্ভু খুব চেনে তাকে।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বঙ্কিম বলে, এইবারে এসে যাবেন---আর কতক্ষণ! ডিস্পেনসারি খুলে দাও, বসি।

নিশম্ভু বলল, চাবি ডাক্তার নিয়ে গেছেন, আমার কাছে নেই।

বলে সে আর দাঁড়াল না ফিরে এসে পরেশকে বলে, এইখানেই আঁচিয়ে ফেল বাবু, নর্দমায় যেতে হবে না। কল্‌কেয় আগুন দিয়ে দিচ্ছি—স্থির হয়ে শোও গিয়ে একটুখানি। যা ঘোরাঘুরি করছ, তুমি মারা যাবে।

পরেশ ডাক্তার হেসে তার দিকে চেয়ে বললেন, শুয়ে পড়লে এক্ষুনি দোর ভাঙাভাঙি শুরু করবে, ঠেকাতে পারবি তাদের? আর ঘরের মধ্যে আঁচাবারই বা কী দরকার হয়ে পড়ল?

যথারীতি চৌবাচ্চার ধারে পরেশ আঁচাতে গেলেন তাই নয়—দাঁত খুঁটবার খড়কে আনতে গেলেন রাস্তায় পাশে নিমের চারা আছে সেইখানে। বঙ্কিমকে দেখতে পেলেন।

তুমি? কলকাতায় ফিরলে কবে ভায়া?

বঙ্কিম বলে, আসা-যাওয়া তো হরদম চলছে। চলবে এখন এই রকম। শুনুন, জরুরি দরকার আপনার সঙ্গে।

তা রোদের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন?

উপায় কি? সাত-রাজার-ধন মাণিক আছে আপনার ভাঙা আলমারিতে। তাই ডিস্পেনসারির চাবি সঙ্গে নিয়ে বেরুচ্ছেন আজকাল।

আমি?

নিশম্ভুকে ডেকে বললেন, হাঁরে চাবি নাকি আমার কাছে?

গম্ভীর মুখে নিশম্ভু কোমর থেকে চাবি বের করে দিল।

পরেশ রাগ করে বললেন, মিথ্যে কথা বলে ভদ্রলোককে পথে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন?

নিশম্ভুও সমান তেজে জবাব দেয়: মনে থাকে না। কী করব, বুড়োমানুষ—সকল কথা মনে থাকে না সব সময়। তারপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষে বঙ্কিমের দিকে চেয়ে বলল, দাঁড় করিয়ে রাখলাম কোথায়, দিব্যি তো আয়েশে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন ভদ্রলোক।

ডিস্পেনসারি-ঘরে গেলেন দু-জনে।

পরেশ বললেন, পরশু দেশে চলে যাচ্ছি। তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে—দেখা হয়ে গেল।

বঙ্কিম বলে, বসলে হবে না ডাক্তার-দা, আমার সঙ্গে যেতে হবে এক জায়গায়।

এক্ষুনি?

দেয়ালের গায়ে হুকে গেঞ্জি ও কোট টাঙিয়ে রেখেছেন। সেই দিকে চেয়ে পরেশ বললেন, কদ্দূর বল তো? অনেকের আসবার কথা, তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বসতে হবে আবার। দেশে যাচ্ছি কিনা—তার আগে অনেকগুলো জরুরি কেসের ওষুধপত্র বাতলে দিয়ে যেতে হবে। কদ্দূর তোমার সে জায়গা?

বঙ্কিম বলে, দূর এমন-কিছু নয়—মধু মিস্ত্রির গলি। রিক্সা করে নিয়ে যাচ্ছি না হয়।

বঙ্কিমের কৃপণ-স্বভাব সর্বজনবিদিত। পরেশ হেসে বললেন, খাতির করে রিক্সা করতে হবে না। পায়ে হেঁটে গেলে লোকে চিনবে পরেশ ডাক্তারকে।

বঙ্কিম বলল, বাড়ির কর্তা বেলা না পড়তে বেরিয়ে যান। শিগগির উঠুন তা হলে ডাক্তার-দা।

বেশ!

কোট কাঁধে চাপিয়ে ধূলি-ধূসর স্যাণ্ডেলে পা ঢুকিয়ে ডাক্তার

বেরিয়ে পড়লেন।

বঙ্কিম বলে, জামাটা গায়ে দিন ডাক্তার-দা, বিশেষ এক জায়গা কিনা!

খানিক গিয়ে পরেশ বললেন, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে এলাম না—রোগটা কি বল তো ভায়া?

ডাক্তারের কানে বঙ্কিম চুপি-চুপি বলল, প্রেমরোগ।

মিটি-মিটি হাসতে হাসতে আবার বলল, রোগি এই আপনার সঙ্গেই যাচ্ছে।

পরেশ সবিস্ময়ে এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কি রোগের চিকিচ্ছে হবে? ডিস্পেনসারিতে বসেই তো ভাল ভাল টোটকা বলে দিতে পারতাম।

বলে পরেশ উদ্দাম হাসি হেসে উঠলেন।

বঙ্কিম বলে, চন্দ্রা এই বিয়ের প্রস্তাব আনে। মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। মানে, মেয়ে অবশ্য আমি দেখেছি—কিন্তু গদিয়ান হয়ে বসে কাছাকাছি ভাল করে দেখতে পারি নি তো, সেইটে আজ হবে। আপনি দেখবেন—পছন্দ নিশ্চয়ই হবে। বাবাকে বলে-কয়ে কাজটা যাতে হয় সেই রকম করতে হবে ডাক্তার-দা। চন্দ্রা নেই, আপনিও চলে যাচ্ছেন—যাবার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করে ঠিকঠাক করে দিয়ে যাবেন।

পরেশের বিষম উৎসাহ। বলেন, ইস আগে বলতে হয়! ভাল খাওয়ায় এসব শুভকর্মের ব্যাপারে। মিষ্টি-মিঠাইয়ের জায়গা হবে কোথায়? আগে জানলে ভরপেট এমন করে নিশঙ্কুর ডাল-ভাত ঠেসে আসতাম না।

শঙ্খধ্বনি! এত শঙ্খ বাজে কেন? চারিদিক তোলপাড় করে তুলেছে। যূথী ছুটল—সরু গলি ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়ল। শবযাত্রা

চলেছে। লোক বেশি নয়—বেশি ভিড় যাতে না জমে, সেজন্য ঘুর-পথে এই জনবিরল অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে। আজকাল রোজই প্রায় যাচ্ছে এই রকম দুটো-একটা দল। রাস্তার দু-পাশে একটি প্রাণীও বোধকরি ঘরের ভিতরে নেই। বউ-মেয়েরা উলু দিচ্ছে, খই আর ফুল ছড়াচ্ছে, মায়েরা চোখ মুছছেন আর শঙ্খ বাজাচ্ছেন। মৃত্যু নিয়ে মহোৎসব পড়ে গেছে। এ মৃত্যু প্রলুব্ধ করে তোলে। যাদের বয়স কম আর রক্ত চঞ্চল, ঘরে পড়ে থাকা দায় হয়ে পড়েছে তাদের পক্ষে।

তারপর ফিরে আসছে যূথী উন্মনা হয়ে। আর একটা মৃত্যুর কথা কে যেন আজ বলছিল—টেলিফোন-কোম্পানির একজন মারা পড়েছে রাস্তার তার মেরামত করতে গিয়ে। মানুষটার রক্তাক্ত দেহ যূথী যেন চোখের উপর দেখছে। অসাড় ওষ্ঠ দু'টি কেঁপে উঠল, অতি মৃদু কণ্ঠে যেন সে দুঃখ করছে: আমার কথা 'সংগ্রামে' লিখবে না তো তোমরা। কেনই বা লিখবে? অদৃষ্ট আমার দেখ—মরাটা একেবারে বৃথা হয়ে গেল। দেশের কাজে মরেছি, কেউ বলবে না। অথচ কাজ করতে করতে মরলাম তো ঐ সময়ে আর দশজনের সঙ্গে। মই বেয়ে লোহার পোস্টে উঠেছিলাম। অফিসে থেকে হুকুম দিল: যাও। না এসে উপায় কি বলো? বেরুবার সময় পা ঠকঠক করছিল, ডামাডোলের মধ্যে এগুতে মন চাচ্ছিল না। আবার ভাবলাম: সরকারি মানুষ আমি—কত টমিগান ব্রেনগান পাহারা দিয়ে থাকবে আমি যখন কাজ করব। কে কি করতে পারে আমার? একচক্ষু হরিণের মতো একটা দিক থেকেই আশঙ্কা করেছিলাম আমি—স্বপ্নেও কি জানি, আমাদের টমিগান উদ্যত হবে আমার দিকেই? আইন শুনেছি, পায়ের দিকে গুলি করতে হয়—আমার অদৃষ্টে বুকে এসে লাগল, খোঁড়া পায়ে বেঁচে থেকে যে সরকারি পেন্সন ভোগ করব, সে উপায় রইল না। বলতে পার, কত টাকা খেসারত পাঠিয়েছে আমার বাড়িতে? দলের মানুষ নই—সে

খবর রাখতে যাবে কেন তোমরা, কে তা নিয়ে হৈ-চৈ করতে যাচ্ছে। আমার মড়া নিয়ে যাবার সময় শঙ্খ বাজায় নি, ফুল ছড়ায় নি, তোমাদের কোন সভায় আমার নাম উঠবে না কোনদিন--সেই সব বিবেচনা করে খেসারত বেশি পাওনা হয় কিনা বলো ?

রাসবাগানের পাঁচিল এক পাশে খানিকটা ভেঙে পড়েছে। পাঁচিল টপকে রেখা টিপি-টিপি আসছে।

রেখার ভাব দেখে যূথী আশ্চর্য হল : ও পথে যে ?

সন্ধান পেয়ে গেছে দিদি। মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখে সুড়ুৎ করে আমি বাগানে ঢুকে পড়লাম।

যূথী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, কে ?

রেখা বলে, কুটুম্ব—দু দু-জন। ওর একটাকে ভাল করে চিনি—চশমা-পরা ফর্শামতো যেটি। একজনে চিনিয়ে দিয়েছিল। চিনে রাখতে হয়, দায়ে-বেদায়ে দরকারে লাগে। আমার কাছে দাও দিকি কি আছে তোমার মালপত্তোর। আমার যা ছিল, কাল সরিয়ে দিয়েছি। কই, শিগগির--

কাগজপত্র শাড়ির নিচে নিয়ে রেখা যেমন এসেছিল, নিঃশব্দে তেমনি ভাঙা-পাঁচিল পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু পরেই বাইরের দরজায় কড়া নড়ে। ইন্দুমতী ঘুমুচ্ছেন। অনবরত কড়া নাড়ছে। কেউ সাড়াশব্দ দেয় না।

ঝি গিয়ে অবশেষে দরজা খুলল।

শশিশেখর বাবু আছেন ?

না।

পরেশ ডাক্তারের দিকে চেয়ে কৈফিয়তের ভাবে বঙ্কিম বলে, রোজই তো এই সময় থাকেন জানি। দুটো থেকে তিনটে অবধি থাকেন, তাই তো জানি।

যূথী মনে মনে হাসে। উঃ, কত খোঁজখবর নিয়ে কত আশা

করে এসেছ! আজকে তা বলে সুবিধে করতে পারছ না কোন রকমে।

ঝি বলল, বাবু মফস্বলে গেছেন, আজকাল প্রায়ই গিয়ে থাকেন। মা আছেন, কি দরকার বলুন। কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

পরেশ বললেন, আচ্ছা, মাকে গিয়ে বলো, পাত্রী দেখতে এসেছি আমরা। ছেলের বন্ধু এই ইনি, আর আমি পরেশচন্দ্র মজুমদার—মেডিক্যাল প্রাকটিশনার।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের দরজা খুলে যূথী এলো।

কি বলছিলেন আপনারা?

বঙ্কিমের দিকে চেয়েই যূথী প্রশ্ন করল। বঙ্কিম ঘেমে উঠেছে।

না—জরুরি কিছু নয়। আর এক সময় না-হয় আসব।

আসবেন বই কি! যখন আসা শুরু করেছেন, ছাড়বেন কি সহজে?

চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। বলে, মেয়ে দেখার অজুহাতে আসবেন না আর। নতুন আর-কিছু মুখে নিয়ে আসবেন।

বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে পরেশ ডাক্তার বললেন, কেন, মেয়ে দেখায় দোষটা কি হল?

মেয়ে বিয়ে করবে না আপাতত। অন্তত যাকে তাকে তো নয়ই।

বলে নাটকীয় ভাবে যূথী ঘরে ঢুকে পড়ল।

পরেশ ডাক্তার বললেন, রায় বাহাদুরের ছেলে, যে-সে পাত্র হল?

ততক্ষণে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে যূথী। বঙ্কিম আর পরেশ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। ঘরের ভিতর থেকে যূথী হুকুম করছে, বালতিতে গোবর গুলে আনতে পারিস রে সতুর মা?

গোবর এখন কোথায় পাই দিদি?

না-হয় খানিকটা চুণ আর আলকাতরা?

খিল-খিল করে সে হাসছে, শুনতে পাওয়া গেল।

পরেশ ডাক্তার বঙ্কিমের হাত ধরে টান দিলেন: গতিক সুবিধের নয় ভায়া। সরে পড়া যাক।

সরু গলিটা পার হয়ে এসে পরেশ বললেন, পাত্রী তা হলে ওই ?

অপমানে বঙ্কিমের মুখ কালো হয়ে আছে। চলতে পারছে না, টলে পড়ে যায় যেন! কিন্তু পরেশ নির্বিকার, হা-হা করে হাসছেন। এত বয়স অবধি পৃথিবীর বহু-বিচিত্র রূপ উপলব্ধি করেছেন, আজকেও তিনি যেন এক নতুন প্রহসনের নির্লিপ্ত দর্শক।

বঙ্কিমের দিকে চেয়ে ডাক্তারের হাসি থেমে গেল।

হল কি ভায়া, মন খারাপ করবার কি আছে ? পৃথিবীতে পাত্রী এই একটামাত্র নয়। দেখ না—দু-মাসের মধ্যে এমন বউ এনে দিচ্ছি, যার পায়ের ধারে এ মেয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

বঙ্কিম বলে, আমাদের আগা-পাস্তলা চাবুক মেরে গেল ডাক্তার-দা—

কটা রঙের দেমাকে। তুমিও মেরো চাবুক—বউভাতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেও। এর আছে বাইরের রূপ, সে মেয়ের ভিতর-বার দু'দিকেই। নীলগঞ্জে গিয়েই খবরাখবর নিয়ে আমি রায়বাহাদুরকে চিঠি দেব।

(১১)

পরেশ ডাক্তার কথা রেখেছেন, নীলগঞ্জ গিয়ে ক'দিন পরেই নৃসিংহকে চিঠি দিলেন। আরও খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি, পাত্রীপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। রায়বাহাদুর যেমনটি চান, ঠিক তেমনি। দাদামশায়-দিদিমা পাত্রীকে কলকাতায় পাঠাতে রাজি নন, আত্মসম্মানে বাধে তাঁদের। অতএব হয় রায়বাহাদুর নিজে এসে কথাবার্তা পাকা করে যান, নয় তো অবিলম্বে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন এখানে। যদি পরেশের বাড়ি তিনি পায়ের ধুলো দেন, এত বড় সৌভাগ্য সত্যি সত্যি যদি ঘটে—তা হলে তাঁকে আর কিছু ভাবতে হবে না, পরেশই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

নৃসিংহরও পছন্দ নয়, পাত্রীপক্ষ শীতলাঠাকরুনের মতো মেয়ে-কাঁধে দশ দুয়ারে দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াবে। শেষটা চন্দ্রার ব্যবহারে তাঁর মনে আরও বিষম দাগা লেগেছে। সংসারে কারও উপর নির্ভর করতে তিনি রাজি নন। ভেবে চিন্তে নিজেই রওনা হয়ে পড়লেন, পাত্রীর মা-দিদিমা দাদামশায় জ্ঞাত-গোষ্ঠি ঘর-বাড়ি-গ্রাম নিজের চোখে দেখবেন, কুল-শীল আচার-ব্যবহারের খোঁজ নেবেন। অন্য কাউকে দিয়ে এ সব হবে না। শরীর ক্রমে অপটু হয়ে পড়ছে, সব ছেলেমেয়ের যা-হোক স্থিতি হয়েছে, এই শেষ দায়িত্ব--বঙ্কিমের বিয়ে দেওয়া! বঙ্কিমের চেয়ে নিজের ভবিষ্যৎ আয়েশ-আরাম বেশি নির্ভর করছে এই বিয়ের উপর। পরেশ ডাক্তারকে দেখে আসছেন অনেক দিন, তাঁর উপর আস্থা আছে। ডাক্তার লিখেছেন—তাঁর ওখানে গিয়ে একবার পৌঁছতে পারলে কোন রকম আর অসুবিধা হবে না।

নীলগঞ্জে রেল-স্টেশন আছে। স্টেশনের উপরেই ডাক্তারের বাড়ি। বাড়ি ছোট—খান পাঁচেক মাত্র ঘর। এখন সমস্তটাই হাসপাতাল।

পরেশের মুখে সবিস্তারে শুনে আরো চমৎকৃত হলেন রায়-বাহাদুর। বাজে ভাঁওতা দেবার মানুষ পরেশ ডাক্তার নন। পাত্রী দেখতে তো ভালই—গৃহস্থালী-কাজকর্ম জানে, আর অতি-নরম তরিবৎ। নির্ভুল উচ্চারণে গীতা পড়তে পারে। দিদিমার সে আমলে শিক্ষিতা বলে নাম ছিল, তিনি নিজে যত্ন করে নাতনীকে বাংলা-সংস্কৃত শিখিয়েছেন।

রায়বাহাদুর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, কদ্দূর এখান থেকে ওঁদের গ্রাম?

নৌকোয় যাবেন, ঘণ্টা চারেক লাগতে পারে। আমারও যাবার ইচ্ছে, কিন্তু তিন-চারটে দিন দেরি করতে হবে তা হলে। একটা টাইফয়েড আর একটা ডবল-নিউমোনিয়ার রোগির এখন-তখন অবস্থা। তাদের একটা গতি না হওয়া পর্যন্ত এক-পা নড়তে দেবে

না এখানকার মানুষ।

আবার বললেন, কিছু দরকার নেই—স্বচ্ছন্দে আপনি একা চলে যান। চেনা-মাঝির নৌকো ঠিক করে দিচ্ছি, কোনরকম অসুবিধা হবে না। আর সে যা বাড়ি, যেমন অমায়িক বাড়ির মানুষজন—দেখে তাজ্জব হয়ে যাবেন।

বিকালবেলা রায়বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র দত্তর বাড়ি পৌঁছলেন। সাবেকি দোতলা বাড়ি। বৈঠকখানাটা খুব বড়, ঘর নয়—মাঠ বললেই চলে। শ্রীশচন্দ্রের ছেলে বিনয় জন কয়েকের সঙ্গে চাপা-গলায় কি আলোচনা করছিল, রায়বাহাদুর গিয়ে পরেশের চিঠিখানা হাতে দিতে তটস্থ হয়ে উঠল—কি করবে, কোথায় নিয়ে তাঁকে বসাবে ভেবে পায় না।

হাত-পা ধুয়ে তারপর রায়বাহাদুর ফরাশে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে বসলেন। আলাপ-পরিচয় হচ্ছে। বিনয় বাড়ি থাকে না—পুলিশ এ অঞ্চলে ইদানীং বড্ড বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে, সেই সম্পর্কে আসতে হয়েছে। পরশু দিন এসেছে—কাজকর্ম মাটি হয়ে যাচ্ছে, যাবার জন্য সে ছটফট করছে। ক্রোশ পাঁচেক দূরে এদের মৌজা আছে, চাষবাস নিয়ে সে থাকে সেই জায়গায়। ছ-খানা লাঙ্গল। গরু-ছাগল হাঁস-মুরগি পোষা হয়। এক মন দেড় মন দুধ পাওয়া যায় প্রতিদিন। মাখন তুলে নিয়ে সেই দুধ গঞ্জে চালান যায়। ধান ছাড়া তরিতরকারির ক্ষেতও আছে। তার ভাগনে অর্থাৎ পাত্রীর বড়ভাই অনেক যোগাড়যন্তর করে ও-বছর বম্বে থেকে একরকম লম্বা-আঁশ তুলোর বীজ আনিয়ে দিয়েছে। এই তুলোর চাষটা ঠিক ঠিক যদি লেগে যায়, খাওয়া তো চলছেই—পরাটাও ষোলআনা ক্ষেত থেকে আদায় হয়ে যাবে।

রায়বাহাদুর প্রশ্ন করেন, কি করে তোমার সেই ভাগনে?

বিনয় হেসে বলল, কী করবে! কখনো আশ্রমের পাণ্ডাগিরি করে, কখনো গলাবাজি করে বেড়ায় এগাঁয়ে-সেগাঁয়ে, কখনো বা জেলে যায়।

তুলনায় রায়বাহাদুরের বঙ্কিমের কথা মনে পড়ে। গর্বিত কণ্ঠে বলেন, পড়াশুনো করলে না কেন তোমরা? না তুমি, না তোমার ভাগনে। অথচ শুনেছি সে-আমলে শিক্ষিত পরিবার বলে নাম ছিল দত্ত-বাড়ির। মেয়েরা অবধি ভাল লেখাপড়া জানতেন।

বিনয় বলল, ভাগনেটা চেষ্টা করেছিল অনেক দিন। কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করে শেষে বাড়ি এসে বসল। মিছে আর শহরে পড়ে থেকে লাভই বা কি বলুন? পাশ করলেও চাকরিবাকরি হবে না তো আমাদের!

কেন হবে না? ধরো, যদি দেয়ই কেউ জুটিয়ে? যুদ্ধের বাজারে খুব আজকাল চাকরি মিলছে।

বিনয় বলে, পোষাবে না। পেরে উঠব না আমরা। চাকরির হাল যা শোনা যায়—সকালবেলা উঠে ছুটো ভাত নাকে-মুখে গুঁজে বেরুতে হয়। বাবা রে বাবা! মানুষ বলে তো মনে হয় না চাকরেগুলোকে। পাড়াগেঁয়ে মানুষ আমরা—ভেবে পাই নে, সমস্তটা দিন কেমন করে ওরা একটা ঘরের মধ্যে থাকে।

যাই হোক—নৃসিংহ খুশি হয়েছেন। দত্তমশায় উপরের ঘর থেকে নামেন না—নামবার ক্ষমতাই নেই তাঁর। সৌদামিনীই আসল কর্তা এ বাড়ির। আলাপে-আচরণে মেয়েলোকের পক্ষে এমন সঙ্কোচহীনতা আশা করা যায় না এই অজ পাড়াগাঁয়ে। দেখে নৃসিংহ বিস্মিত হলেন। বাসন্তীকেও ছু-একবার দেখা গেল। বয়স যা, যে তুলনায় অতি ছেলেমানুষ দেখায়। পাত্রী যে এরই গর্ভজাত সন্তান, না বলে দিলে কেউ ধরতে পারে না। ঐ মেয়েরও উপর আর এক ভাই রয়েছে! বিষাদের ছায়া বাসন্তীর শান্ত মুখখানার উপর। রায়বাহাদুর সৌদামিনীর মুখে কিছু কিছু শুনলেনও তার

দুঃখের কাহিনী। কষ্ট হয় তার মুখের দিকে চাইলে।

তারপর রায়বাহাদুর সৌদামিনীকে তাগিদ দিলেন: মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে আসুন তবে এইবার—বেলাবেলি দেখে নিই। ভোরের ভাঁটায় রওনা হব। মাঝিদের সঙ্গে ডাক্তার সেই রকম বলে-কয়ে দিয়েছে।

মেয়ে এসেছে। সত্যি চমৎকার। যূথীর সঙ্গে চন্দ্রা প্রস্তাব এনেছিল, কোথায় লাগে এর তুলনায়! রং ফর্শা নয়, তবু রায়-বাহাদুর বিমুগ্ধচিত্তে ভাবছেন, এই তো—আসল রূপসী একেই বলে, বাংলা দেশের পরিপাটি রূপটি ফুটে উঠেছে এ মেয়ের চেহারায়, গায়ের রঙে, আচরণের স্নিগ্ধতায়। বড় বেশি লাজুক। এসে দাঁড়িয়েছে, যেন রক্ত ছলকে পড়েছে মুখের উপর।

বসো মা, বসো এই জায়গায়।

বসলে নৃসিংহ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ভয় হচ্ছিল, পড়ে যায় বুঝি-বা লজ্জার ভারে!

তারপর ক্রমশ কথাবার্তা সহজ হয়ে এল।

কি নাম তোমার মা?

কম্পিত কণ্ঠে মেয়েটি জবাব দিল: কুমারী বনলতা দেবী।

বুড়ো রায়বাহাদুরের একটা কবিত্বগন্ধী কথা মনে এসে গেল হঠাৎ। বনলতা নয়, বনকুসুম। এই দূর গ্রামে অজানা জঙ্গল-রাজ্যে সুন্দর ফুল ফুটেছে একটা। অনেক ভাগ্যে তিনি সন্ধান পেয়ে গেছেন।

এ ফুল তাঁর বাগানের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে জাঁক করে দেখাবেন সকলকে। অহঙ্কারী বউমাকে বলবেন, অত যে জৌলস দেখাও, রূপের গরব কর—ও গরব তোমাদের নয়, বিলাতি পারফিউমারদের। যারা আজব দেখিয়ে দিচ্ছে—ষাট বছর বয়সকে ষোল বছরে নামিয়ে আনে, কাল-জামের উপর কাঁচা-সোনার কষ ধরিয়ে দেয়। বনলতাকে বাড়িতে নিয়ে ওসব ছাইভস্ম মাখতে দেবেন না কোন

দিন। পরবে শুধু সিঁদূরের কোটা আর আলতা।

হাঁটো দিকি মা-জননী আমার। হেঁটে যাও ঐ দেয়াল অবধি, আমি দেখি একটু।

সৌদামিনী বলল, যাও দিদি, যাও—বলছেন উনি যখন।

ধীরে ধীরে বনলতা হাঁটতে লাগল। নৃসিংহ প্রসন্ন চোখে দেখছেন, দৃষ্টি ফেরাতে পারেন না। সহসা সচকিত হয়ে বলেন, থাক—থাক, হয়েছে। পা কাঁপছে তোমার, পড়ে যাবে। খুব রাগ হচ্ছে নিশ্চয় বুড়ো-ছেলের পরে, এত কষ্ট দিচ্ছে! বোসো।

ধরে বসিয়ে দিয়ে বললেন, কষ্ট দিলাম কেন জানো? হাঁটতে পার কিনা পরখ করবার জন্য নয়। কেমন আস্তে আস্তে হাঁটছিলে তুলতুলে পা দু-খানি ফেলে ফেলে—পদ্মের পাঁপড়ির উপর আলগোছে যেন পা ফেলে চলেছেন লক্ষ্মীঠাকরুন! ঐ শোভা দেখবার জন্য তোমায় কষ্ট দিলাম। তা আদেখলে সত্যি আমি বটে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে অহরহই দেখতে পাব, তবু সবুর সইল না।

ব্যস্ত হয়ে বিনয়কে বললেন, পাঁজি আছে? একটা পাঁজি নিয়ে এসো তো ভাই, দিনটা কেমন দেখা যাক।

পাঁজি দেখে বললেন, দিব্যি হয়েছে। ত্রয়োদশী তিথি—সর্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী, মহেন্দ্রযোগ। পাকা দেখে তবে আমি নড়ব এখান থেকে।

সৌদামিনী সবিস্ময়ে বললেন, এখনই?

শুভস্য শীঘ্রম্! কখন কি বাগড়া আসে, বলা যায় না তো!

সৌদামিনী ইতস্তত করতে লাগলেন: নাতিটা বাড়ি নেই, বোনের বিয়ের সম্বন্ধ—সে কিছু জানতে পারল না। শেষকালে যদি ধরুন—

হো-হো করে হেসে উঠে রায়বাহাদুর বললেন, ঘর-বর তার যদি অপছন্দ হয় আপনারা পাকা দেখবেন না, ফেরত পাঠিয়ে দেবেন আমার আশীর্বাদের আংটি। এমন তো কত হচ্ছে। বুড়োমানুষ

অপটু শরীর—আবার করে আসতে পারি না পারি, ভাল দিনক্ষণ পাওয়া গেছে, সেইজন্য আপনাদের অনুমতি চাচ্ছি। আপনারা খোঁজ-খবর নেবেন এর পর। আপত্তি উঠবার কারণ নেই নিশ্চিত জানি বলেই এত জেদ করছি। বঙ্কিম আমার অতি ভাল ছেলে, এম. এ. পাশ করেছে, ভাল চাকরি করছে। রাজযোটক হবে এ সম্বন্ধে হলে।

নিজের সুপুষ্ট আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে হাসতে হাসতে রায়বাহাদুর বললেন, মায়ের এ প্রায় চুড়ির মতো হবে। কি করব, তৈরি হয়ে আসি নি তো! আংটি ভেঙে পরে ছোট করে গড়িয়ে দেবো। কিন্তু জিনিসটা ভাল—আসল কমল-হীরে আছে।

(১২)

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। বনলতা আবার এলো রায় বাহাদুরের আহ্নিকের জিনিসপত্র নিয়ে। পরিপাটি করে আসন পেতে কোশাকুশি সাজিয়ে দিয়ে গেল। ঝণ্টু মাহিন্দার ওদিকে বারান্দায় জল ছিটোচ্ছে, জলখাবারের জায়গা হবে।

আহ্নিক সেরে বেরিয়ে এসে রায়বাহাদুর অবাক হলেন। বিনয়কে বললেন, কি হে, এতগুলো জায়গা—বাড়িতে ভোজ লাগিয়েছ নাকি?

বিনয় হেসে বলে, বাইরের কেউ নেই। সবাই নিজেরা আমরা।

এত ছেলে—সবাই এ বাড়ির?

বিনয় ঘাড় নেড়ে সায় দিল: হাঁ। নানান ধরনের কাজকর্মে বাড়িরই বলতে হবে!

বাসন্তী আর বনলতা জলখাবারের থালা বয়ে বয়ে আনছে, সৌদামিনী আসনের সামনে সাজিয়ে দিচ্ছেন। নৃসিংহ বললেন, উঃ—এতগুলো ছেলে খাওয়াচ্ছেন এই বাজারে!

শেষ করতে দেন না সৌদামিনী: না না, ও কথা বলবেন না।

কে কাকে খেতে দেয়! ওদের ভাত ওরা খাচ্ছে। আমরা অনেক ভাগ্য করে এসেছি, তাই আমাদের বাড়িতে বসে খায়। এ বাড়ির কর্তাও এক সময়ে অন্যের বাড়ি খেয়ে আঠারো টাকার ইস্কুল-মাস্টারি করেছেন।

নৃসিংহ অপ্রতিভ হয়ে বললেন, তা বলছি না। বড্ড দরের বাজার কিনা—

সৌদামিনী বললেন, দর হয়েছে শুনতে পাই বটে। চাষা মানুষ আমরা—সবই ক্ষেতের জিনিস, কিনতে হয় না তো বিশেষ-কিছু। ক্ষেতের ফলন মারা না গেলেই হল।

বেশ লাগছে এই সচ্ছল শান্ত পরিবারটিকে। অনেক বয়স হল রায়বাহাদুরের- চাকরির ও সংসারের অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়েছে তাঁকে, এখনো শেষ নেই। আজকে মনে হচ্ছে, অনেক কালের পর স্নিগ্ধ-ছায়া এক বটতলায় এসে জিরোচ্ছেন এই একটা দিন। বাবুগিরি নেই, অর্থার্জনের ভয়াল প্রতিযোগিতা নেই এদের এই সংসারে। একহাঁটু কাদা ভেঙে মাঠে মাঠে চাষ দেখে বেড়ায়—ছেলেটা তাই আবার জাঁক করে বলছে রায়বাহাদুরের মতো বিশিষ্ট অভ্যাগতের কাছে। বাড়ির আর একটা শক্ত সমর্থ ছেলে বিনা কাজে আড্ডা দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তাতে এরা প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। নিজের ছেলেবয়সের কথা মনে পড়ল। এমনি একটা গ্রাম থেকে এসেছিলেন তিনিও। খুব ভোরবেলা, বৃষ্টি হচ্ছিল। ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যে পাঁচ ক্রোশ পথ এসে স্টিমার ধরেছিলেন। স্টিমার আসতে বড় দেরি করেছিল, ওদিককার স্টিমার নিজেদের মরজি-মাফিক চলাচল করে। দোকান থেকে মুড়ি আর কদমা কিনে খেয়েছিলেন, একটু তেল চেয়ে নিয়ে মাথায় ঘষে স্নান করেছিলেন নদীর জলে। সেই গ্রাম এখন আছে কি নেই—কে জানে! দীর্ঘ জীবনের এতদিন একেবারে ভুলে বসে আছেন।

অনেকটা রাত হয়েছে। ঝণ্টু বিছানা করে দিতে এল। সে

এ বাড়ির চাকর কি মনিব, বোঝা কঠিন।

নৃসিংহ বললেন, সব তো হল, খাওয়াদাওয়ার দেরি কত বল দিকি? শরীর ভাল নয়—ঠিক সাড়ে-আটটায় খাওয়া আমার অভ্যাস। খেয়ে-দেয়ে ঘণ্টাখানেক পায়চারি করি, তারপর শুতে যাই।

ঝণ্টু বলে, আজকে দেরি হবে বাবু। পাঁঠা খোঁজাখুঁজি করে আনতে দেরি হয়ে গেল। খাসি-পাঁঠা পাওয়া ভারি দুষ্কর হয়েছে, সমস্ত মিলিটারির লোক নিয়ে যাচ্ছে। মাংস হচ্ছে, আরও ভাল-মন্দ দু-দশ খানা তরকারি হচ্ছে—দেরি একটু হবেই

ভাল তরকারি হচ্ছে, মন্দও হচ্ছে? বটে, বটে!

নৃসিংহের খুব ক্ষিধে পেয়েছে, তবু আয়োজনের বৃত্তান্ত শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। এই বয়সে এবং শরীরের অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও খাওয়ার নিমন্ত্রণ তিনি বাদ দেন না কোথাও। চাকরিতে থাকবার সময়ে সুনাম এমন রটনা হয়েছিল যে, কারও কোন কাজ বাগাবার গরজ হলে বড় বড় গলদা-চিংড়ি অথবা ভেটকি-মাছ ভেট নিয়ে এসে দেখা করত তাঁর সঙ্গে। আয়তনে মাছ যত বড়, কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকত তত বেশি।

উল্লাসে আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসতে হাসতে নৃসিংহ বললেন, কি কি রান্না হচ্ছে, আঁচ দাও দিকি ঝণ্ট। বুড়োমানুষ, সব তো খাবার জো নেই—আগেভাগে বিবেচনা করতে হয়, কোনটা খাব আর কোনটা বাদ দেব। ছানা তো খুব সুবিধা এদিকে—মিষ্টি-মিঠাই ক'দফা হচ্ছে?

তা চার-পাঁচ রকম হবে বই কি বাবু। সন্দেশ আছে, ক্ষীরমোহন, অমৃতি—

বটে!

আর হল না, বনলতা এসে পড়ল সেই সময়। মশারি আর তাকিয়া-বালিশ নিয়ে এসেছে। বলে, মশারি খাটাতে হবে।

ঝণ্টু চোখ বড় বড় করে বলে, দত্ত-বাড়িতে মশারি?

দিদিমা পাঠিয়ে দিলেন। যা মশা হয়েছে, ছেঁকে ধরবে আর একটু পরে। তোমার তুষ-ঘুঁটের সাজালে মানাবে না। মামার নয় —শুধু এঁর বিছানায় তুমি খাটিয়ে দাও।

পাশাপাশি দুই তক্তাপোষে বিছানা হয়েছে। বিনয়ও বৈঠকখানা-ঘরে শোবে। বাড়িতে লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে সম্প্রতি—অনেকে আশ্রয় নিয়েছে, মেয়েরাও আছেন। বিনয় বাড়ি এলে বাইরের ঘরে তার শোয়ার ব্যবস্থা। নৃসিংহ অবাক হয়ে বলেন, বিনয়ের মশারি দিলে না ঝণ্টু ?

বাড়ির লোকে মশারিতে শোবে কী করে ? বাইরের ছেলে কত এসে রয়েছে—সকলের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তো বাড়ির লোক ! এ বাজারে এত মশারি কোথায় পাওয়া যাবে ? সকলকেই তাই মশার কামড় খেতে হয় একসঙ্গে পড়ে পড়ে।

এমন সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল, যা রায়বাহাদুরের জীবনে বিভীষিকা হয়ে আছে। যতদিন বেঁচে থাকবেন, ভুলতে পারবেন না।

বাইরে একবার টর্চের আলো জ্বলে উঠল উঠানটাকে প্রদীপ্ত করে। প্রশ্ন এল : মহীন বাবু আছেন ? বাড়ি আসেন নি তিনি এখনো ?

বনলতা নৃসিংহর পাশে বসে ছিল, মৃদুকণ্ঠে নৃসিংহ কত কি বলছিলেন তার সঙ্গে। বলছিলেন, সবাই খাতির করে মা, উঁচু আসন দেয় দেশের মধ্যে। তবু কিন্তু তোমার বড় দুঃখী ছেলে এই বুড়ো রায়বাহাদুর। বউমা'রা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, মেয়েটা অবাধ্য। আমার দিকে চেয়ে দেখবার মানুষ নেই। তাই তো পাগল হয়ে মনের মতো মা খুঁজে বেড়াচ্ছি এদেশ-সেদেশ।

বনলতা লজ্জারক্ত মুখ নিচু করে আঙুলে আঁচলের প্রান্ত জড়াচ্ছিল, কথা শুনে বড় কষ্ট হচ্ছিল তার।

মহীন বাবু এসেছেন নাকি শুনলাম ?

হঠাৎ কি হল, প্রশ্ন শুনে উঠে দাঁড়াল বনলতা। ফুলের মধ্য

থেকে সাপ বেরিয়ে এল যেন। সুতীব্র কণ্ঠে জবাব দেয় : না, দাদা আসেন নি এখনও।

কখন আসবেন বলতে পারেন ?

বলতে বলতে প্রশ্নকর্তা ঘরে এসে ঢুকল।

ধ্বক করে চোখ দুটো অগ্নি-জ্বালায় জ্বলে উঠল সেই মেঘের মতো ভীরু পরমশান্ত মেয়েটার। বাইরের দিকে এক হাত প্রসারিত করে সে কঠোর কণ্ঠে বলে, বেরোন— বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

অপ্রতিভ হয়ে লোকটি বলল, আমায় বলছেন ?

তল্লাসি-পরোয়ানা আছে ? নেই তো কার হুকুমে ঢুকেছেন আমাদের ঘরে ?

ভদ্রলোক আসবে ভদ্রলোকের বাড়ি—

কে ভদ্রলোক ? আপনি ? বেরিয়ে যান।

নৃসিংহ চিনলেন লোকটিকে। এক সময়ে তাঁর অনেক ফাইফরমাস খেটেছে, রায়বাহাদুরই তদ্বির-তাগাদা করে বহুকাল আগে তাকে পুলিশে ঢুকিয়ে দেন।

আরে রমাপতি তুমি—

স্যার ? রমাপতি রায়বাহাদুরের দিকে তাকাল। চমকে সে দু-পা পিছিয়ে সসম্ভ্রমে নমস্কার করল।

স্যার এদিকে এসেছেন, কিছু জানি নে। খবর পাই নি তো!

সে বেরিয়ে গেল। দু-জন কনেস্টবল বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তারাও চলে গেল রমাপতির পিছু পিছু।

তারপর এক কাণ্ড। নৃসিংহের আহ্নিক-সজ্জার মধ্যে শঙ্খ ছিল। বনলতা তুলে শঙ্খে ফুঁ দিল।

ফুঁয়ে গাল ফুলে উঠেছে। চোখে অগ্নিদৃষ্টি।

নৃসিংহ বলেন, হল কি ? শোন মা, শোন—

ছুটে তখন সে উঠানে নেমে গেছে। প্রাণপণে শঙ্খ বাজাচ্ছে,

উঠানের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিকে ছুটোছুটি করছে। পাড়াগাঁয়ের নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রি থরথর করে কাঁপছে যেন শঙ্খের আওয়াজে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ও কি! দোতলা থেকেও বেজে উঠল দু-তিনটে শঙ্খ। তারপর এবাড়ি ওবাড়ি—সকল বাড়ির লোক বাজাতে লাগল। মহিষখোলা কাছেই, জোয়ারের বেগে পাল খাটিয়ে নানা ধরনের নৌকা চলেছে। নৌকায় নৌকায় বাজাচ্ছে শঙ্খ। বেলেডাঙার বাঁওড়ের মধ্যে মাছ ধরবার জন্যে জেলেরা টোঙ বেঁধে আছে, সেখান থেকে শঙ্খ বাজে। শঙ্খধ্বনি চলে যায় ভিন্ন গ্রামে, সেখানে আবার বাজাচ্ছে ঘরে ঘরে। সে-গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। দূর-দূরান্তরে চলল আওয়াজ। থামে না, একটানা চলেছে। অন্ধকারে ছায়ার মতো মানুষগুলো দ্রুত ঘোরাফেরা করছে, সমস্ত অঞ্চলের মানুষ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে দম ধরে শঙ্খ বাজাচ্ছে।

অনেকক্ষণ—প্রায় আধঘণ্টা পরে থামল শঙ্খধ্বনি। চারিদিক নিঃশব্দ হল ক্রমে। শ্রান্ত বনলতা শঙ্খ রাখবার জন্য আবার এলো বৈঠকখানা ঘরে।

নৃসিংহ বললেন, ব্যাপার কি বলো তো?

তিনি একা একা বসে রয়েছেন এতক্ষণ। বুকের মধ্যে গুরগুর করছে, ভয় হয়েছে মনে মনে। বনলতার হাত ধরতে গেলেন: শোন মা—

এক ঝটকায় বনলতা হাত ছাড়িয়ে নিল। আংটিটা আঁচলে বাঁধা, এতক্ষণে খেয়াল হল। খুলে সেটা ছুঁড়ে দিল নৃসিংহের দিকে। খাটের নিচে আংটি গড়িয়ে পড়ল। যেন তাকাতেও ঘৃণা লাগছে—এমনি ভাবে মুখ ফিরিয়ে বনলতা বেরিয়ে গেল। বেকুব হয়ে রায়-বাহাদুর বসে রইলেন।

আশ্চর্য! বিনয়ের আর দেখা নেই, সৌদামিনীও অদৃশ্য। হঠাৎ বাড়িখানা এবং সমস্ত গ্রামটিই নিঃসাড় হয়ে গেছে।

অবশেষে ঝণ্টু এলো।

এ কি কাণ্ড ঝণ্টু? কিছু বুঝতে পারছি না তো!

সে-ও যেন কালা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কথা বলল না। নিজের মনে বিছানা তুলতে লাগল।

বিনয়ের বিছানা নিয়ে যাচ্ছ?

এবারে ঝণ্টু সংক্ষিপ্ত জবাব দিল: এ ঘরে শোবে না।

আমি একাই তা হলে? তা যেন হল, কিন্তু রাত হয়ে গেছে—খাবার নিয়ে আসছ কখন?

ঝণ্টু তখন এ খাটের মশারির দড়িও খুলছে, একটু আগে যা টাঙিয়ে গিয়েছিল।

নৃসিংহ বললেন, আমার বিছানাও নিয়ে চললে, শোন হে শোন, শোব কোথায়?

চলে যেতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন: মতলব কি তোমাদের? শোন, শোনই না গো। খুলে বলো বাবা, এরকম শঙ্খ বাজানো কেন, আর বাড়ির সবাই এমন অভদ্রতা কেন করছেন আমার সঙ্গে?

বাড়ির ওদের জিজ্ঞাসা করুন গে। গোলাম-নফর আমি—কী জানি, আর কি জবাব দেবো আপনাকে!

নৃসিংহ বললেন, জল তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল দিতে পারবে তো?

ঝণ্টু বলল, জলের অভাব কি বাবু! পুকুর-ঘাটে জল রয়েছে, বর্ষাকালে খানাখন্দ সব জলে ভরতি।

সে চলে গেল। চাকরটা পর্যন্ত অপমান করে গেল এই রকম। রাগে রাগে গায়ে জামা চড়িয়ে নৃসিংহ ঘর থেকে বেরুলেন। তিলার্ধ আর নয় এ বাড়িতে। এই নির্বান্ধব গ্রামে একা এসে তিনি ভুল করেছেন, উচিত হয় নি পাগলা ডাক্তারের কথার উপর নির্ভর করে এই অবস্থায় এমন ভাবে আসা।

উঠান পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। পা এগুতে চায় না। আকাশ মেঘে ভরা, নিরন্ধ্র আঁধার। জল জমেছে রাস্তার উপর। তবু জোর করে এক রকম পায়ের আন্দাজেই নদীর ঘাটে পৌছলেন। তাঁর সে নৌকা ঘাটে নেই তো! জোয়ারের সময় হয়তো আর কোথায় নিয়ে বেঁধেছে, কিম্বা শঙ্খধ্বনির আতঙ্কে নৌকা ভাসিয়ে সরে পড়েছে মাঝি। শূন্য ঘাটে দাঁড়িয়ে অনেক ডাকাডাকি করলেন। ব্যাঙ ডাকছে, বিষম গুমট, বৃষ্টি হবে রাত্রে আবার। কী করা যায়, পায়ে পায়ে আবার ফিরে এলেন দত্ত-বাড়ি।

আরও অনেকক্ষণ কেটেছে—ঘণ্টা তিন-চার হবে। হেরিকেনটা কালি-ঝুলিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। রায়বাহাদুর বারাণ্ডায় জল-চৌকির উপর বসে অপমানের জ্বালায় গজর-গজর করছেন। ঘুমোন নি—ঘুমোবেন বা কোথায়? এক একবার ঝিমুনি আসছে, খুঁটি ঠেস দিয়ে চোখ বোজেন, আবার চমকে সজাগ হয়ে ওঠেন তখনি। সমস্ত রাত নিরম্বু উপবাসী থেকে, মশার কামড় খেয়ে চোখ লাল করে, যখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে, রায়বাহাদুর বেরিয়ে পড়লেন। খোঁজ করে করে অনেক কষ্টে থানায় এসে উঠলেন।

শোন রমাপতি, ওদের ঠাণ্ডা করে দিতে হবে। যেমন করে পারো।

চেষ্টার কসুর হচ্ছে না স্যার। মহীন রায়ের নামে হুলিয়া আছে। আরও অনেকের নামে। শেয়াল-কুকুরের মতো এগাঁয়ে-ওগাঁয়ে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়—মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সব এককাট্টা। ক'টাকে ঠাণ্ডা করা যায় বলুন। কালকে অত শঙ্খ বাজালে, মানে বুঝেছেন! সঙ্কেত। তাড়া খেয়ে ভলাণ্টিয়াররা গাঁয়ের অন্ধিসন্ধিতে ঢুকেছে, শঙ্খ বাজিয়ে তাদেরা সামাল করে দিল।

নৃসিংহ দুঃখিত স্বরে বলতে লাগলেন, কিন্তু আমি কি করেছি? সাতেও নেই পাঁচেও নেই—ছেলের জন্য পাত্রী পছন্দ করতে

এসেছিলাম—আমার উপর আক্রোশ কেন? দারোগা হয়ে তুমি ঐ যে নমস্কার করলে, খাতির দেখালে—সেইটেই অপরাধ হল আমার?

রমাপতি বলল, ঘরপোড়া গরু কিনা! মানে, আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে—আমরা আজকাল তেমন নড়ে বসি নে। নইলে এত ছেলে কি আর এদ্দিন পালিয়ে থাকতে পারে! দেশের জন্যে করছে ওরা, আর দেশটা তো আমাদেরও—কি বলেন স্যার? তবে বাইরে থেকে হুড়ো আসে মধ্যে মধ্যে—চাকরি বজায় রাখতে সেই সময়টা খুব চাড় দেখাতে হয়। তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গ্রামে গিয়ে পড়ি। তার পরে—বুঝতেই পারছেন, নমুনাও নিজের চোখে দেখে এসেছেন। আপনাকে ওরা সেই রকম এক হুড়ো বলে সন্দেহ করেছে, আর কি!

রমাপতি উপবাসী রায়বাহাদুরের আহারের জোগাড়ে গেল। রায়বাহাদুর আপন মনে ফুলতে লাগলেন।

(১৩)

ইন্দুমতীর নামে টেলিগ্রাম এলো, ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়েছে বেলেডাঙায়, নূতন-তৈরি মিলিটারি ছাউনি পুড়ে গেছে। তারপর ভবভূতি শিকদার আরও বিস্তারিত খবর নিয়ে এলো, দৈব দুর্ঘটনা নয় —স্বদেশিরা টিন টিন পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। মাটির নিচে পেট্রোল জমা ছিল। এই গোপন জায়গার সন্ধান বড়কর্তাদের ক'জন ছাড়া আর বিশেষ কেউ জানত না—কর-শিকদার ইঞ্জিনিয়ার্স এত কাজকর্ম করেছে ব্যারাকের ভিতর, তারাও বিন্দুবিসর্গ জানত না। কিন্তু স্বদেশিদের চোখ সকল জায়গায়, ওদের চর সর্বত্র ঘাঁটি পেতে আছে। ব্রেন-গান নিয়ে দিবারাত্রি পাহারা দিচ্ছে, তারই মাঝখান থেকে পেট্রোল সরিয়েছে। পাহারাদের মধ্যেই হয়তো

লোক ছিল ওদের—এই ধুন্ধুমার লড়াইয়ের মধ্যে কার কখন কি মতলব আসছে, ঠিক করে বলবার উপায় নেই। পেট্রোল হয়তো মিলিটারি লোকরাই চালান করে দিয়ে তারপর রিজার্ভারের অবশিষ্ট পেট্রোলের মধ্যে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে দিয়েছে—ব্যস! কী ভয়াবহ দৃশ্য, চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। সেই বেড়া-আগুনের মধ্যে শশিশেখর আটক পড়ে গিয়েছিলেন, পিতৃপুরুষের পুণ্যে রক্ষা পেয়েছেন। বাঁচিয়ে দিয়েছে একজন—

ইন্দুমতী মেয়েদের নিয়ে পাগল হয়ে বিভাসের বাড়ি ছুটে এলেন ভবভূতির নিজের মুখে সমস্ত কথা শুনবার জন্যে।

ভবভূতি বলে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। কর মশায়ের গায়ে আঁচটুকুও লাগে নি, আশ্চর্য ভাবে তিনি বেঁচে গেছেন। বাঁচিয়েছে দলের বড় পাণ্ডা মহীন রায়। তার সঙ্গে আগে থেকে চেনাশোনা ছিল।

যূথী স্তম্ভিত হয়ে যায়: মহীন বাবু? বিষম অহিংস মানুষ যে তিনি।

ভবভূতি বলল, গোলমালের সময় হিংসুক আর অহিংসুকে তো তফাৎ দেখলাম না, সব শেয়ালের এক রা। কিম্বা হয়তো ঐ দলের বলেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে বের করে এনেছে কর মশায়কে। ঐ করতে গিয়েই আরও জানাজানি হয়ে পড়ল। নইলে স্বচ্ছন্দে সে সরে পড়তে পারত, নাম প্রকাশ পেত না। পুলিশ ধরতে পারি নি এখনো, তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ধরে বার তিনেক ফাঁসি দিতে পারলে তবে বোধহয় তাদের রাগ মেটে।

ইন্দুমতী বললেন, তুমি একলা এলে—ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন? এসব শুনে মনের অবস্থা কি হয়, বুঝে দেখ দিকি।

ভবভূতি বলে, অনেক করে বললাম, কিছুতে এলেন না। এলে যা-কিছু আছে তা-ও থাকবে না বললেন। তাঁরও মনের অবস্থা ভাবুন। দু-লাখ আড়াই লাখ টাকার কাজ বরবাদ হল। ফোঁশ-ফোঁশ

করে নিশ্বাস ফেলেন, আহা-হা—করে ওঠেন মাঝে মাঝে।

বিভাস বলে, হুঁ—বরবাদ হলেই হল! আমি আছি তবে কি করতে? কর মশায় মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছেন। দোষ যখন আমাদের নয়, পাইপয়সা অবধি আদায় করে তবে ছাড়ব।

যূথী বলল, চলো মা, আমরা গিয়ে বাবাকে টেনেটুনে নিয়ে আসি। এ অবস্থায় একা একা ওখানে পড়ে থাকলে তিনি বাঁচবেন না।

ইন্দুমতী বিভাসকে বললেন, তুমি বাবা আমাদের সঙ্গে চলো। চারিদিকে অকূল-পাথার দেখছেন—তুমি গেলে হয়তো বল-ভরসা পাবেন।

বিভাস ঘাড় নাড়ে: তাই তো, আমার যাওয়া হয়ে উঠবে কি! আমার বিস্তর কাজ এদিকে—

যূথী বলে, ওঁকে কেন বলছ মা, ওঁর যাওয়ার উপায় নেই। তা হলে কর-শিকদারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো বেরিয়ে পড়বে। নেতৃত্বে ফাটল ধরে যাবে।

বিভাস আমতা-আমতা করে: ঠিক তা নয়। আপনাদেরও যেতে মানা করি। কি করতে যাবেন? খুব ধরপাকড় হচ্ছে, নতুন লোক নামতে দেখলে পুলিশে গোলমাল করতে পারে। বরঞ্চ ভবভূতির কাছে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমি একখানা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি কর মশায়কে।

যূথী বলে, বলেন কি! লেখা-জোখার মধ্যে কক্ষনো যাবেন না। চিঠি বেহাত হয়েও তো যেতে পারে। শত্রুর অভাব নেই—ধরুন কেউ যদি সেই চিঠি খবরের-কাগজে বের করে দেয়।

ফিরে আসবার পথে যূথী বলে, দেখলে তোমার বিভাসরঞ্জনকে? এরই সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জন্য তুমি পাগল হয়ে উঠেছ মা।

ইন্দুমতীও আজ বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু যূথীর কাছে সে ভাব

প্রকাশ হতে দিতে চান না। বললেন, পাত্র হিসাবে অযোগ্য কিসে? লেখাপড়া জানে, নাম-যশ টাকাপয়সা আছে, বুদ্ধিমান—

বড় বেশি বুদ্ধি। নেতাগিরি করেন, কিন্তু জেল থেকে বরাবর পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছেন। তোমার মেয়ের জীবন থেকেও একদিন অমনি পিছলে পড়বেন না, কে বলতে পারে!

তাই হল, ভবভূতির সঙ্গেই বেলেডাঙায় গেলেন ওঁরা। শশিশেখর যে অবস্থায় থাকুন, তাঁকে নিয়ে চলে আসবেন। ভবভূতি একাই আপাতত ওখানকার কাজকর্ম দেখবে, নয় তো চুলোয় যাকগে কারবার পত্তোর। দুর্ভাবনায় পাগল হয়ে মানুষটাকে তিলে তিলে মারা যেতে দেওয়া যায় না তো! রেখা কলকাতায় রইল। ছাত্রী-সমিতির সম্পর্কে তার নাম পুলিশের খাতায় আছে। ধরপাকড় চলেছে—তাকে নিয়ে গেলে নতুন কি ফ্যাসাদ বাধে, ঠিক কি!

(১৪)

দু-দিন আজ বিষম বাদলা নেমেছে। বিকালে ঐ ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যেই তিনটে-সাতাশের লোকালে পরেশ ডাক্তার বেরিয়েছিলেন রোগি দেখতে। ফিরছেন এখন। দেশে এসেও বরানগরের অবস্থা। ভেবেছিলেন শুধু হাসপাতাল নিয়ে থাকবেন, লোকের সাধ্যসাধনায় তা ঘটে ওঠে না।

রাতের গাড়িতে ফিরতে হবে, তাই যাবার সময় বেডিং অর্থাৎ সতরঞ্চি ও দেশি কম্বলে জড়ানো বালিশটা স্টেশনে রেখে গেছেন। টিকিটবাবুটি বিশেষ চেনা পরেশের। হাসপাতালে রেখে এঁর কার্বঙ্কল অপারেশন করে দিয়েছিলেন। ডাক্তারকে খাতির করে তিনি অফিস-ঘরে বসালেন। বললেন, এ গাড়িতে যাচ্ছেন কেন ডাক্তারবাবু? পৌঁছতে ধরুন—

তিনটে তো বাজবেই। তা-ও পথে যদি আপনাদের রেলগাড়ি

দয়া করে কোথাও ঘুমিয়ে না পড়ে।

টিকিট বাবু বললেন, তাই তো বলছি—শুয়ে থাকুন এখন স্টেশনে। ওয়েটিংরুমের তালা খুলিয়ে দিচ্ছি। সকালবেলা থ্রী-আপে চলে যাবেন।

হবার জো নেই মশায়। তা হলে কি এই ভোগ ভুগতে আসি?

দশ টাকার একখানা নোট বের করে দিলেন পরেশ। বলেন, টিকিট দিন। শেষ রাত্তির থেকে রোগির ভিড় লাগে। কুইনিনের অভাবে কম্পাউণ্ডার শুধু পানা-পুকুরের জল রঙ করে দাগ কেটে চালাচ্ছে, তাই শেষ করে উঠতে দুপুর গড়িয়ে যায়।

টিকিট আর বাদ বাকি পয়সা হিসাব করে দিলেন টিকিটবাবু।

পরেশ জিজ্ঞাসা করেন, থার্ডক্লাসের দিলেন নাকি?

নয় তো আট টাকা সাড়ে বারো আনা ফেরত দিলাম কেমন করে? গুণে নিন।

কিন্তু বলছিলাম কি—ভোর থেকেই স্তেথেসকোপ ঠুকে কসরৎ চালাতে হবে, আমার শুয়ে যাবার দরকার। থার্ডক্লাসে হয়ে উঠবে কি সেটা?

টিকিটবাবু বললেন, তোফা নাক ডাকতে ডাকতে যাবেন—আমি বলছি। সেভেনটিন-ডাউন গেল, সেভেন-আপ গেল—খাঁ-খাঁ করছে, কাকস্য পরিবেদনা। এমন অভদ্রায় কুকুর-বেরাল ঘর থেকে বেরোয় না—

কিন্তু ডাক্তার বেরোয়। আর ডাক্তার ডেকে আনতে যারা যায়।

তা যা বলেছেন।

টিকিটবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, বুদ্ধি বাতলে দিই ডাক্তারবাবু। থার্ডক্লাসে জায়গা না পান, যে ক্লাসে পারেন উঠে পড়বেন—পরোয়া করবেন না। চেকার ধরে ফেললে হাতে কিছু গুঁজে দেবেন, না ধরলে তো কথাই নেই। যদি বলেন, পজিসন থাকে না—এ দুর্যোগে কে দেখতে যাচ্ছে যে

আমাদের ডাক্তারবাবু থার্ডক্লাসে যাচ্ছেন ! আর দেখেই যদি, স্রেফ বলে দেবেন পি. সি. রায় মশায়ও এই লাইনে কতবার গেছেন থার্ডক্লাসে। তাঁর তুলনায় আমারা ধরুনগে কীটস্য কীট। কি বলেন।

গাড়ি এলো। ফাঁকা সত্যি। টর্চ ছিল পরেশের সঙ্গে, অসুবিধা হল না। একটা কামরায় তিনি উঠে পড়লেন। বাইরে থেকে মনে হয়েছিল, জনপ্রাণী নেই। সেটা ঠিক নয় অবশ্য, তবে সজাগ অবস্থায় কেউ নেই। অত বড় কামরায় সাকুল্যে জন পাঁচেক—সবাই বেঞ্চির উপর পড়ে ঘুমুচ্ছে। মরে ঘুমুচ্ছে যেন। টর্চের আলো পরেশ গায়ের উপর দিয়ে চালিয়ে গেলেন, কেউ নড়ল না একটুখানি।

জায়গা যথেষ্ট আছে। একেবারে কোণের দিককার বেঞ্চিতে সতরঞ্চি পেতে ওষুধের ব্যাগটা শিয়রের কাছে রেখে দিলেন যাক, নিরিবিলি থাকা যাবে। কেউ হঠাৎ বুঝতে পারে না, এ জায়গাটুকুতেও বেঞ্চি দিয়েছে। কিন্তু বেঞ্চি না হোক, বাঙ্ক যে আছে--সেটা টের পেয়েছে। পরেশের ঠিক উপরে বাঙ্কটার উপর জিনিসপত্র গাদি দিয়ে রেখে গেছে কে-একজন।

বরানগরের পরেশ ডাক্তার—পনের মিনিটে নাওয়া-খাওয়া সেরে তখনই আবার ডাক্তারখানায় বসতে হয়—সময়ের অপব্যয় তাঁর ধাতে সয় না। বালিশটা মাথায় গুঁজে সতরঞ্জির উপর তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লেন। শীত-শীত করছিল, কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। ঘুম যেন ডাক্তারের সাধনা করে আয়ত্ত করা---যেখানে যে অবস্থায় হোক, শুধু গড়িয়ে পড়বার অপেক্ষা।

বৃষ্টি জোরে এল আবার। কড়-কড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাড়ি চুপচাপ দাঁড়িয়ে. কখন নড়বে গাড়িই জানে।

পরেশের অবশ্য তাড়া নেই সেজন্য, নীলগঞ্জ স্টেশনে ভোরের আগে পৌঁছলেই হল। বরঞ্চ যত দেরি হবে, ততই ভাল তাঁর পক্ষে। রাত্রে গিয়ে নিশম্ভুকে ডাকাডাকি করে তুলে তারপরে আবার ঘুমোবার সুবিধা হবে বলে তো মনে হয় না। নিশ্চিন্ত আলস্যে পরেশ চোখ বুজলেন।

স্বপ্ন দেখছেন, মনে হচ্ছে। তাই—স্বপ্নেই ঘটে থাকে এ রকমটা। চুড়ির মৃদু আওয়াজ, শাড়ির খসখসানি। শাড়ির খানিকটা মোলায়েম আবরণ পরেশের মুখ ঢেকে গিয়েছে, স্নিগ্ধ সুমিষ্ট গন্ধে চেতনা আচ্ছন্ন হয়েছে। একটি মেয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। ব্যাঙ্কের বিছানা ও বস্তাগুলোর মালিক তা হলে এই মেয়েটি! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী সব নাড়ানাড়ি করছে, মৃদুকণ্ঠে বার কয়েক কি যেন বলল আপন মনে। স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝে পরেশ তখন দোল খাচ্ছেন, শোনার বা ভাল করে চোখ মেলে দেখার অবস্থা নেই। এটা ঠিক, সুপুষ্ট গোঁফ-ওয়ালা আধ-বুড়ো ডাক্তার নিচে শুয়ে পড়ে আছেন, মেয়েটা টের পায় নি। ইলেকট্রিক আলোর বালব পাওয়া যায় না—এমনি নানা অজুহাতে নূতন ব্যবস্থায় গাড়িতে আলো দেওয়া বন্ধ হয়েছে। অন্ধকার, আর তার উপর কালো কম্বল জড়িয়ে যে ভাবে পরেশ পড়ে আছেন, চোখের যত জোর থাকুক—ঠাহর করা সোজা নয়। ক্রমশ ডাক্তার সজাগ হলেন. কিন্তু অদ্ভুত অবস্থা—নিশ্বাসটাও নিতে হচ্ছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। মেয়েটা বুঝতে পারলে বড় অপ্রতিভ হয়ে যাবে। সে লজ্জা যেন পরেশেরই।

বাঁচলেন অবশেষে—চলে যাচ্ছে। দম ধরে কুম্ভক করে থাকা কতক্ষণ পোষায়! শাড়ির আঁচল, গহনার ঝিনিঝিনি—সকল উপসর্গ নিয়ে অন্ধকার-বর্তিনী নেমে গেল।

গাড়ি জংশন-স্টেশনে এসেছে, 'চা গরম—' হাঁক শুনে ঘুমের

মধ্যেই পরেশ বুঝতে পারছেন। ইঞ্জিন জল নেবে, আধঘণ্টা গাড়ি থাকে এখানে। শীত ধরেছে, মন্দ হয় না এককাপ্ চা পেলে। মাটির গ্লাসে কটু বিস্বাদ যে তরল বস্তু ফিরি করছে, তা নয়। প্লাটফরমের উপরেই রেস্তরাঁ—পরেশ হামেশাই এ পথে যাতায়াত করেন, সমস্ত জানাশোনা। পাকা-দাড়ি ফোকলা-দাঁত এক বয় আছে, কাপ পিছু দু-পয়সা বেশি ধরে দিলে সে চমৎকার চা বানিয়ে দেয়।

শেডের নিচে লম্বা টেবিল। কাচের জারে কেক-বিস্কুট, দড়িতে টাঙানো মর্তমান-কলা। বড় একটা তোলা-উনুন পিছন দিকে, উনুনের উপর ডেগচিতে টগবগ করে জল ফুটছে, গরম জল হাতা কেটে কেটে ঢালছে চায়ের কেটলিতে। আর পাশে বড় একটা প্লেটে করে চপ-কাটলেট সাজিয়ে রেখেছে, উনুনের আঁচে গরম থাকছে ওগুলো। এই হল জংশন-স্টেশনের সুবিখ্যাত রেস্তরাঁ। খদ্দেরের বসবার জন্য সামনে ক'খানা টিনের চেয়ার আছে। ভিড়ের চোটে আজ অবধি কোনদিন কিন্তু পরেশ চেয়ারে বসতে পারেন নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে চলে গেছেন। আজকে দুর্যোগের দরুন ভাগ্য সুপ্রসন্ন, দিব্যি লাটসাহেবি মেজাজে টববাক্সের উপর পা ছড়িয়ে বসে ঢোঁকে ঢোঁকে তিনি চা খাচ্ছেন। এক কাপ শেষ করে আর এক কাপের ফরমাশ করেছেন, এমন সময়—

বঙ্কিম যে। তুমি কোত্থেকে এখানে?

হাতে টিফিন-কেরিয়ার, ছুটতে ছুটতে বঙ্কিম এল। বলে, বলেন কেন ডাক্তার-দা, ডিউটিতে আছি।

বুড়ো বয়টার দিকে টিফিন-কেরিয়ার এগিয়ে ধরে বলল, এদিকে—আমার এটা ভরতি করে দাও দিকি। যা তোমাদের ভাল আছে, সব রকম দাও দুটো-চারটে করে। কুইক!

পরেশ আশ্চর্য হলেন, বঙ্কিমের মতো কৃপণ মানুষ রেস্তরাঁয়

এসে ঢালা হুকুম ছাড়ছে। ভাবছেন, ঘুমিয়ে নেই তো তিনি এখনো!

ব্যাপার কি হে?

বঙ্কিম বলে, এই ট্রেনে চলেছেন? আসুন, আসুন দাদা। ক্ষিধে পেয়েছে কিনা বড্ড!

নোট দিয়েছে, তার বাকি পয়সা ফেরত নিতে সবুর সয় না—এমন ব্যস্ত। হাত ধরেছে পরেশ ডাক্তারের, আর এক হাতে টিফিন-কেরিয়ার। ছুটছে। বলে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ডাক্তার-দা। খাবার কেনার কথা বলছিল তার মায়ের কাছে। আমার সামনে যখন বলল, আমারই কিনে দিলে ভাল দেখায়। কি বলেন?

ডাক্তার হতভম্বের মতো তাকাচ্ছেন দেখে বলল, সেই মেয়ে, যূথিকা কর—মনে পড়ছে না?

পরেশের মনে পড়ল। যে মেয়ে বিস্মৃত হয়ে যাবার বস্তু নয়। রাগ করে বললেন, বাপের ভাগ্যি সেদিন গোবর-জল মাথায় ঢালে নি। এখনো তার পিছন ছাড়ো নি—আশ্চর্য মানুষ!

বঙ্কিম হেসে বলে, বড্ড রেগে আছেন দাদা, কিন্তু সে যূথী আর নেই। আসুন না, দেখবেন আজ আলাপ করে। এই গাড়িতে ওরা কলকাতা ফিরছে। দেখা হল, তারপর সে-ই এখন যেন লেপটে রয়েছে আমার গায়ে। সেই ব্যাপারের পর খুব অনুতপ্ত হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। আমাকে ওদের গাড়িতে নিয়ে তুলেছে। ডিউটিতে আছি, কিন্তু গল্প···গল্প··গল্প! সব স্টেশনে নেমে দেখাও আর হয়ে উঠছে না।

পরম দুঃখে বলতে লাগল, ভাদ্রমাস পড়ে গেল—নয় তো মন-মেজাজ যা দেখছি, আর কোন অসুবিধা ছিল না। শুধু রাজি নয়—মনে হচ্ছে, বিষম রাজি সে এখন। হলে কি হবে—অঘ্রাণ অবধি চুপচাপ থাকা ছাড়া উপায় নেই। আপনাকে পেয়ে ভাল হল ডাক্তার-দা। দেখে যান, ভাল করে আলাপ-পরিচয় করে যান।

বাবাকে বলতে হবে।

সেই যূথী বদলে কি রকমটা হয়েছে, দেখবার কৌতূহল কিছু আছেই—তার উপর বঙ্কিম পরেশের হাত ধরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছে, হাত এড়ানোর উপায় নেই। যূথীর সম্পর্কে ডাক্তারকে সে রাগ করে থাকতে দেবে না, মিটমাট করে দেবেই।

বৃষ্টি ধরে গেছে, মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না উঠেছে। রিজার্ভ করা একটা সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেন্টের সামনে দেখা গেল যূথী অধীর ভাবে পায়চারি করছে। বঙ্কিম দেখিয়ে দেয়: ঐ—

পরেশকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে: এঁকে চিনতে পারেন যূথিকা দেবী?

যূথী চমকে তাকাল। চোখে বিরক্তি পুঞ্জিত হয়েছে। আবার এই সময়ে ছুটো গেঁয়ো স্ত্রীলোক গাড়িতে উঠবার ব্যস্ততায় ছুটতে ছুটতে তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে গেল। এক পা সরে দাঁড়াল যূথী, ভ্রূ কুঁচকে নাক সিঁটকে বলল, মানুষ না জানোয়ার? নোংরা কাপড়-চোপড়—কী বিশ্রী, মাগো!

জলের কল কাছেই, জল পড়ছিল। হাতে সম্ভবত তাদের ছোঁয়া লেগেছিল, যূথী রগড়ে হাত ধুয়ে এল। বদলেছে কি রকম, পরেশ বুঝতে পারেন না। রূপ আছে—কিন্তু রূপের দেমাক এমন বিষম উগ্র যে মুখ তুলে চেয়ে দেখতেও বিরক্তি লাগে। ধূলোভরা নোংরা পৃথিবীতে এরা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটে। ধূলো না হয়ে যদি আগাগোড়া কার্পেট বিছানো থাকত, সোয়াস্তি পেত যূথীর জাতের মেয়েগুলো।

হাত ধুয়ে এসে দাঁড়াতে, বঙ্কিম নাছোড়বান্দা—আবার শুরু করল: চিনতে পারছেন না ডাক্তার-দাকে? সেই যে সেবার—মনে পড়ছে না? আমার নিজের দাদাদের থেকেও অনেক বেশি ভক্তি করি এঁকে। ওঃ, এদ্দিন পরে দেখা—আপনাকে প্রণাম করা হয় নি ডাক্তার-দা।

টিফিন-কেরিয়ার নামিয়ে রেখে বঙ্কিম পরেশের পায়ের ধুলো নিল। যূথী দেখাদেখি হাত দু-খানা একটু তুলল—হাতজোড় হল না, কপাল অবধিও পৌছল না। পরেশের হাসি পা... প্রহসন-দর্শকের নির্লিপ্ত হাসি। যা-ই হোক যূথী বদলেছে একটু সত্যিই। একালের মা-লক্ষ্মীরা গড় হয়ে প্রণাম করতে শেখেন না—কিন্তু যে হাত একদিন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল, কপালের দিকে সেই হাত অতখানি উঠল তো উঁচু হয়ে!

বঙ্কিম ছাড়ল না, ঐ কামরায় পরেশকে উঠে বসতে হল শেষ পর্যন্ত। জ্যোৎস্না বেশ পরিষ্কার হয়েছে, জানলা দিয়ে এসে পড়েছে। শশিশেখর আপার বার্থে। স্লিপিং-স্যুট পরা---অঘোরে ঘুমিয়ে আছেন। আর ওদিককার বেঞ্চিতে ইন্দুমতী বাইরের দিকে চেয়ে নিবিষ্ট ভাবে বসে। অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। বঙ্কিমের সঙ্গে মেয়ের এ রকম অন্তরঙ্গতা পছন্দ করছেন না বোধহয়। কিম্বা আর কি ব্যাপার, কে জানে! পাথরের মূর্তির মতো তাঁর নড়াচড়া নেই।

পরেশ যূথীর সামনাসামনি বসলেন। গাড়িতে রয়েছে, তার ভিতরেও এমন সেজেছে মেয়েটা! সুগৌর গায়ের রঙের কতখানি নিজস্ব, আর কতটা ক্রিম-পাউডারের মারফতে দাঁড় করিয়েছে—ঠিক করে বলা কঠিন। ঠোঁটে আর গালে রুজ, নখে রঙ, এক হাতে চুড়ির গোছা আর এক হাত খালি। রুক্ষ চুলের বোঝা, মুখের উপর 'মরি, মরি—'গোছের একটা ভাব, কত দিনের করুণ ক্লান্তি যেন জমে আছে সেখানে। পরেশ চেয়ে চেয়ে দেখছেন, মুখের উপর হাস্যলেপ—কিন্তু বিরক্তির কুঞ্চন ফুটেছে যেন ঐ হাসির অন্তরালে। ভাবছেন, কত ঘণ্টা সময় লেগেছে না-জানি প্রসাধনে! ছবি আঁকার মতো দেহখানি এরা সাজিয়ে-গুজিয়ে বুভুক্ষু চোখের সামনে তুলে ধরে। সিল্কের আঁটো-ব্লাউস গায়ে, শাড়ির গুটানো আঁচল আলগোছে আছে কাঁধের উপর। সুরার রক্তিম আভা

কাচের পাত্র থেকে যেন বেরিয়ে আসছে। গা শির-শির করে উঠে। পরেশের ইচ্ছা করে, বেশ ভারী ওজনের থাপ্পড় কষিয়ে দেন এই ধরনের চপল মেয়েগুলোকে ধরে ধরে—যারা দিনের অর্ধেক সময় ধরে সাজে, আর সাজ কতটা খুলল বাকি অর্ধেক সময় তারই পরখ করে বঙ্কিমের মতো হাঁদারামগুলোর উপর।

মনের ভিতরে যাই থাক, বঙ্কিমের খাতিরে হেসে আলাপ জমানোর চেষ্টা করতে হয়। আলাপ করবেনই বা কি নিয়ে! বোঝে তো এরা তুটো জিনিস পৃথিবীতে—সিনেমা আর টয়লেট, আর পরেশ ডাক্তার নিতান্ত আনাড়ি ঐ তুটো জিনিস সম্পর্কে।

যূথী বলে, উঠেছেন কোন্ গাড়িতে ডাক্তার বাবু?

বঙ্কিম বলল, ওধারে কোথায়। ঘুম—ঘুম—ঘুম—এমন ঘুম-কাতুরে দাদা আমার! আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করাতে আনব, ঘুম কামাই হবে বলে কিছুতে আসতে চান না।

যূথী বলে, হাই তুলছেন, ক্লান্ত হয়ে আছেন। ওঁকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। আলাপ তো হল—যান ডাক্তার বাবু, ঘুমুনগে আপনি।

অর্থাৎ সরল বাংলায় এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আপদ-বালাই বিদায় হও তুমি এখান থেকে। বর্ষা-রাত্রে তুটিতে গল্পগুজব করব, কাঁচা-পাকা চুল আর ভারি গোঁফজোড়া নিয়ে দোহাই তোমার—জেঁকে বসে থেকো না এর মধ্যে।

কিন্তু বঙ্কিমটা বুঝবে না এসব কিছু। বলে, কষ্ট না আরো কিছু! কি হয় মানুষের একটা রাত না ঘুমুলে! অনেক কথা আছে ডাক্তার-দা, বসুন আর একটু। আপনি দেশে এসে রইলেন, আমারও ঘোরাঘুরির চাকরি। দেখাশোনার পাট উঠে গেছে, আজকে তার শোধ তুলব।

এই সময়ে তার খেয়াল হল, টিফিন-কেরিয়ারের খাবার যেমন তেমনি রয়েছে।

কই যূথিকা দেবী, খেলেন না যে!

এখন থাক।

ক্ষিধে পেয়েছে বললেন—

যূথী মৃদু হেসে বলে, কখন?

আমি জানি, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। খান।

যূথী কিছু বলে না, হাসিমুখে চেয়ে রইল।

পরেশ বললেন, খাওয়ানোই যদি মতলব, আমায় টেনে নিয়ে এলে কেন বলো দিকি? আমি উঠি।

যূথী বলে উঠে, না না, বসুন আপনি, গল্প করুন। আমি ওয়েটিংরুমে যাচ্ছি। হাত-টাত ভাল করে ধোবার দরকার, গাড়িতে সুবিধে হবে না—নিচে নামতে হবে।

বঙ্কিমের দিকে চেয়ে বলে, ওমা, অত এনেছেন কেন? দিন, অতি-সামান্য কিছু।

নিজেই সে একটা বাটিতে করে তুলে নিল। যা নিল, নেহাৎ অতি-সামান্য অবশ্য নয়। পরেশ মনে মনে প্রসন্ন হলেন—একেবারে বে-পরোয়া হয় নি তা হলে পুরুষের সামনে হাঁ করে গিলতে লজ্জা লাগে!

যূথী গেল তো ফাঁকা পেয়ে অতঃপর বঙ্কিম ছেঁকে ধরল পরেশকে। শতকণ্ঠে যূথীর কথা। বাইরে একটু বেশি চটপটে হলেও অন্তরে সে অত্যন্ত সরল ও অমায়িক, অমন মেয়ে হয় না। অর্থাৎ গদগদ অবস্থা বেচারার। যূথী আলোকসামান্য নারী, পৃথিবীতে এমনটি দ্বিতীয় জন্মায় নি—বিনা তর্কে মেনে নিয়েও অব্যাহতি নেই পরেশের। বঙ্কিম বিপুলতর উৎসাহে আবার তার গুণের ফিরিস্তি দিতে লেগে যায়। এ পাগল মাথা খারাপ করে দেবে যে এমনিভাবে বকে বকে!

যূথী ফিরে আসছে। ওরা কথাবার্তা বলুক, পরেশ পালাবেন এবার। না ঘুমুলে উপায় নেই।

বঙ্কিম বলে, এর মধ্যে হয়ে গেল ?

যাচ্ছেতাই খাবার। ফেলে দিতে হল প্রায় সমস্ত।

লজ্জায় মরে গিয়ে বঙ্কিম বলে, তাই নাকি ? সব তাতে আজকাল জোচ্চুরি চলছে। আচ্ছা, মামুদপুর পৌঁছই। সেখানে—

মামুদপুর পরেশের নীলগঞ্জের ঠিক পরের স্টেশন। আশ্চর্য হয়ে পরেশ বললেন, ফ্লাগ-স্টেশন—একঢোক জল জোটানো যায় না, জলখাবার মিলবে কোথা মামুদপুরে ?

মুচকি হেসে রহস্যপূর্ণ চোখে বঙ্কিম বলল, আমাদের মিলবে দাদা, ষোড়শোপচারে রাজভোগ। লোক আছে আমাদের।

পরেশ বললেন, এ গাড়ি আগে তো ধরতই না ওখানে।

আজকাল ধরে। মিলিটারি-ক্যান্টিন হয়েছে কিনা, ক্যান্টিনে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা আছে। আর তা ছাড়া—

কথার মাঝে বঙ্কিম থেমে গেল হঠাৎ। যূথী আর পরেশ চেয়ে আছেন। বঙ্কিম বলল, যূথীর ঐ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে নিশ্চয়ই—তা আপনাদের কাছে বলতে দোষ কি! বাইরে রাষ্ট্র করতে যাচ্ছেন না তো!

গলা নিচু করে বলতে লাগল, বেলেডাঙার ব্যারাক পোড়ানোর সেই ঘটনা—

যূথী বিশুষ্ক মুখে বলল, আমাদের সর্বনাশ করেছে। বাবা তো সেই থেকে পাগলের মতো।

তারপর পরম আগ্রহে বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করে, কতগুলো ধরা পড়ল ?

বঙ্কিম বলে, সন্দেহ করে ধরেছে জন পঁচিশ-ত্রিশ। পালের গোদা মহীন রায়—সেইটেরই পাত্তা নেই। সরে পড়তে পারবে না অবিশ্যি, বেড়াজালে আটকে ফেলা হয়েছে। এ গাড়িটায় আমার নজর রাখবার কথা। স্টেশনে স্টেশনে নেমে যাচ্ছি, দেখছেন না!

যূথী বলে, দেখলে চিনতে পারবেন তো মহীন রায়কে ?

খুব, খুব। চিহ্নিত-মানুষ ওরা, দু-পুরুষে ঘাগি—কতদিন ওর পিছনে ঘুরেছি। মামুদপুরে আমাদের আরও দশ-বারো জন উঠবে। সমস্ত গাড়ি তন্নতন্ন করে দেখা হবে সেই সময়।

যূথী বলে, ধরতে পারলে ফাঁসিতে লটকে দেবেন। সে-ই উচিত। শয়তানগুলো ষড়যন্ত্র করে আমাদের একেবারে পথে বসাবার জোগাড় করেছে।

পরেশ উঠে দাঁড়ালেন। বসে বসে আর শোনা যায় না—অসহ্য। রায় বাহাদুর নৃসিংহ হালদার যা এদের সম্বন্ধে বলে থাকেন, মোটেই মিথ্যা নয়। যূথীর দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়ে মনে মনে বললেন, বিলাতি পারফিউমারির জীবন্ত বিজ্ঞাপন বই তো নও—তুমি একথা বলবে বই কি! সূর্যের চেয়ে বালির উত্তাপ বেশি। তোমাদের পরম উপাস্য বিলাতি দেবতারাও কিন্তু, আর যাই করুক, ঘর পোড়াবার দায়ে ফাঁসির হুকুম দিতে ইতস্তত করত।

(১৫)

বিষম বিরক্তিতে কামরায় ঢুকে পরেশ নিজের জায়গায় যাচ্ছেন, জুতোসুদ্ধ পা হড়কে গেল। পড়তে পড়তে সামলে নিলেন। ব্যাপার কি? টর্চ জেলে দেখেন, কলার খোসা। আর দেখতে পেলেন, কেক আর কাটলেটের টুকরো ছড়িয়ে আছে তাঁর সতরঞ্চি-কম্বলের উপর।

কী করে এলো এসব? একটা কথা ধ্বক করে মনে উঠল। কিন্তু না—এত জায়গা থাকতে যূথী বেছে বেছে এই থার্ডক্লাশের কামরায় জলযোগ করতে আসবে কি জন্য? সরকারি গাড়ি—যার ইচ্ছে হয়েছে, এখানে বসে খেয়ে গেছে। তবে পরেশের বিছানার উপর ছড়িয়ে না গেলে কোন-কিছু বলবার থাকত না।

সতরঞ্চি ঝেড়েঝুড়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।

সেই স্বপ্ন আবার। এবার পরেশ চোখ বোজেন নি। নিঃশব্দ-গতিতে ঢুকল, পাখির মতো উড়ে এলো যেন। মুহূর্তে তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে গেলেন।

ফিসফাস করে যূথী ডাকছে, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

বেডিং ও বস্তার মাঝ থেকে শব্দ বেরুল : উঁ ?

খেয়েছেন ?

তুমি খাইয়ে দিয়ে যাও নি তো !

খান নি তাই বলে নাকি ?

ফেলে দিয়েছি। ছড়িয়ে গেছে সমস্ত।

পরেশ নিশ্বাস রোধ করে উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাচ্ছেন। বটে রে! লগেজের সঙ্গে জলজ্যান্ত প্রেমিক একটি নিয়ে চলেছে ধুরন্ধর মেয়েটা—ফাঁকমতো এসে এসে প্রেম করে যাচ্ছে, আর বঙ্কিম হতভাগা ওদিকে খাবার বয়ে বেড়াচ্ছে প্রেমিকযুগলের।

যূথী অনুনয়ের স্বরে বলে, কি করব বলুন! বঙ্কিমটা তো ফেউ লেগেই আছে। আবার দু-নম্বর জুটেছে—বঙ্কিমের চেনাশোনা কোথাকার এক ভবঘুরে ডাক্তার। বেশিক্ষণ কাছে থাকতে ভরসা হয় না। নইলে কি খাইয়ে দিয়ে যেতাম না? মিথ্যে আপনি রাগ করছেন।

খুব চুপি-চুপি বলছে, কিন্তু পরেশের অত্যন্ত কাছে বলে প্রতিটি কথা তিনি শুনতে পাচ্ছেন।

কোমল স্বরে যূথীর কথার প্রত্যুত্তর এলো, না—রাগ করব কেন, যদ্দূর পারি খেয়েছি। হাত দিয়ে তুলে খাবার জো আছে কি!

জল এনেছি, জল খান। হাত-মুখ মুছিয়ে দি আপনার।

পরেশ আস্তে আস্তে উঠে বসেছেন। এমন আবিষ্ট, যূথী টের পেল না। শুধু হাত ধোওয়ানো নয়—ও কি! মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়—রামো, রামো!

হাতে-নাতে ধরে ফেলবার মতলবে পরেশ টর্চ জ্বাললেন।

বাঙ্কের উপর অত্যন্ত ঝুঁকে পড়ে যূথী শাড়ির আঁচলে পরম যত্নে লোকটার হাত-মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিল। পরেশ উঠে দাঁড়াতে মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল, খপ করে সে ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরল।

ঘাড় নেড়ে দৃঢ় কণ্ঠে পরেশ বললেন, বঙ্কিমকে বলবই আমি। সমস্ত ফাঁক করে দেবো।

সহসা বিছানার স্তূপ ঠেলে লোকটা খাড়া হয়ে বসল।

চলুন, আমিই যাচ্ছি।

যূথী ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, উঠবেন না—উঠবেন না মহীন বাবু।

শুধু ওঠা নয়, বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে পড়তে যায় মহীন। অসহ্য আর্তনাদ করে সে বস্তার উপর গড়িয়ে পড়ল।

শিউরে উঠে পরেশ তার দিকে টর্চ ফেললেন। ডাক্তার মানুষ —কত রকম রোগি দেখতে হয়, কত দেখেছেন—কিন্তু এমন বীভৎস মূর্তি দেখতে চান না জীবনে। সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়ে ঘা দগদগ করছে, ঝাঁকুনিতে রক্তের ধারা বেরুচ্ছে ক্ষতমুখ দিয়ে। মহীন বলে, প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াই নে। বিস্তর কাজ, লোকের অভাব —কাজের জন্য বাইরে থাকবার দরকার। কিন্তু কি কাজ করব এ অবস্থায়? আর ভাল লাগে না, ডাকুন ওদের মশাই। হেঁটে যাবার উপায় তো নেই—

যূথী সজল কণ্ঠে বলে, না মহীন বাবু, না। কক্ষনো তা হবে না।

পরেশ বললেন, ও সব পরের ঝগড়া দিদি। মহীনকে নিচে নামানোর দরকার। বড্ড রক্ত পড়ছে—রক্ত বন্ধ না হলে খারাপ হবে।

দু-জনে ধরাধরি করে মহীনকে নামালেন। পরেশ জল আনতে ছুটলেন প্লাটফরমের কল থেকে। এসে দেখেন—চোখে না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতেন না—নাক-সিঁটকানো ঐ রকম শৌখিন মেয়ে সবুজ সিল্কের একখানা রুমাল মহীনের ঘায়ের উপর চেপে ধরেছে।

রুমাল ভিজে গিয়ে ঘায়ের রসরক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার পাউডার-বুলানো সুশুভ্র হাতের উপর দিয়ে, রাঙানো নখগুলোর উপর দিয়ে। কী আকুলতা চোখে-মুখে!

পরেশ সান্ত্বনা দেন: ভয় কি—ব্যাগে ওযুধপত্তোর আছে। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।

যূথী বলে, কোয়ার্টারের ভিতর বাবা লুকিয়ে রেখেছিলেন, আট-দশ দিন ছিলেন। চিকিৎসার কোন উপায় করা গেল না দেখে, আমিই জোর করে নিয়ে যাচ্ছি। স্বপ্নেও কি জানতাম, আটঘাট ওরা এমন করে বেঁধে ফেলেছে, পথের মধ্যে এমন বিপদ!

অশ্রুতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। বলে, এতক্ষণ কখন ধরে ফেলত! বেডিং ঢাকা দিয়ে রেখে আর কত কষ্ট করে যে নিয়ে চলেছি! আমার কষ্ট আপনি তো নিজের চোখেই দেখে এলেন।

কোন ভয় নেই দিদি—

একটু পরে বঙ্কিমকে প্লাটফরমের আলোর নিচে দেখা গেল। ঘুরে ঘুরে ডিউটি দিচ্ছে বোধ হয়। মহীনকে তাড়াতাড়ি আড়াল করে পরেশ জিজ্ঞাসা করলেন: কি বঙ্কিম?

'আসছি—' বলে যূথিকা দেবী কোথায় যে চলে গেলেন, অনেকক্ষণ আর দেখতে পাচ্ছি না। গাড়ি ছাড়বে, ঘণ্টা দিতে যাচ্ছে এবার।

পরেশ হেসে উঠে বললেন, যূথীকে আমার এখানে টেনে এনেছি। বড়মানুষের মেয়ে—দেখে যাক থুতু-কাশি শালের-পাতা পোড়া-বিড়ির মধ্যে কেমন আনন্দ-ভ্রমণ হয় আমাদের। যাও যূথী, বঙ্কিম এসেছে, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, মামুদপুরে ওদের দল উঠবে—তার আগেই আমি ব্যবস্থা করে ফেলব। নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও দিদিভাই—

যূথী নেমে গেল। বঙ্কিমের পিছু-পিছু যাচ্ছে। যেতে যেতে ঘনপক্ষ্ম দৃষ্টি তুলে আর একবার তাকাল পরেশ ডাক্তারের দিকে।

নীলগঞ্জ স্টেশনে গাড়ি থামলে পরেশ ডাক্তার ছুটোছুটি লাগালেন। স্টেশনে স্ট্রেচার নেই; জন চারেক কুলিকে দিয়ে অফিসের ইজিচেয়ারটা আনালেন। সবাই এখানে চেনা, হাসপাতাল করে দিয়ে তিনি দেবতা বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন এখানকার মানুষের চোখে। ইজিচেয়ারের উপর মহীনকে শুইয়ে পরেশ তাঁর কম্বলখানা দিয়ে আগাগোড়া ঢেকে দিলেন। ইচ্ছে করেই বঙ্কিমদের গাড়ির সামনে দিয়ে চললেন। যূথী খুব গল্প জমিয়েছে, একখানা হাত এলিয়ে দিয়েছে বঙ্কিমের কোলের উপর। মুখচোখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে, এ মরধামে নেই আর বঙ্কিম। তবু ওরই মধ্যে জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যথাসম্ভব সে ডিউটি করে যাচ্ছে।

পরেশকে দেখে বলল, চললেন ডাক্তার-দা?

হ্যাঁ। আর গেরো কেমন দেখ। রোগ দেখতে গিয়ে রোগিটা আমার পিছন নিয়ে নিল। ত্রি-সংসারে কেউ নেই, হাসপাতালে ভরতি করে নিতে হবে।

যূথী উঠে দাঁড়াল।

প্রণাম করে আসি দাদাকে—

কাছে এসে চুপি-চুপি বলে, ঠিক বলেছেন—ত্রি-সংসারে আজকে কেউ নেই এঁদের। আমার মা ঐ দেখুন ভরসা করে একবার এদিকে তাকাতেও পারছেন না। দেখবেন আপনি।

জল-কাদায় ভরতি সেই প্লাটফরমে পরেশের পায়ের গোড়ায় যূথী উপুড় হয়ে প্রণাম করল। মুখ তুলল যখন, দেখা গেল, সাবান দিয়ে ফাঁপানো চুলে, ভ্রূর কাজলে, ঠোঁটের রুজে কাদা লেপটে গেছে। কুলিরা ততক্ষণে পরেশ ডাক্তারের রোগিকে গেট পার করে নিয়ে গেছে।

(১৬)

আগে যূথী রেখাকে তেমন আমল দিত না, এখন বাড়ির মধ্যে কথার দোসর সে-ই। সাজ-পোষাক নিয়ে প্রায়ই রেখা ঠাট্টা করে—জো পেয়েছে, ছাড়বে কেন ?

অমন রেশমের মতো চুলে জট পাকিয়ে গেছে। একটুখানি বোসো দিকি দিদি, ছাড়িয়ে দিই।

যূথী বলে, পড়ার জন্য অনেক গালমন্দ করেছি, পটাপট চুল ছিঁড়ে তারই শোধ তুলবি বুঝি ?

সত্যি সত্যি তুমি যে বৈরাগিণী হলে! মহীন বাবুর পচা-ঘা ছুঁয়ে এসে সেই শাড়ি ছেড়ে ফেললে, ভাল জামা-কাপড় তারপর একটা দিন পরতে দেখলাম না।

যূথী হেসে বলে, পরিনে নোংরা হয়ে যাবে সেই ভয়ে। আবার কবে কোন হতভাগার দায় এসে ঘাড়ে পড়বে—এ দুর্দিনে পথে-ঘাটে ওদের তো অন্ত নেই! আর এসে পড়লে ঝেড়ে ফেলে দেওয়াও চলবে না।

রেখা বলে, তা নয়—দেখেছ যে সাজ-পোষাক সময়কালে কোন কাজে আসে না—মনের দরদ চাপা থাকে না ওর নিচে, উছলে বেরিয়ে পড়ে। হেরে গেছ তুমি দিদি, একেবারে হেরে গেছ। গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে তোমার নির্বিকার নিরাসক্ত থাকবার দেমাক।

একদিন শুকনো মুখে রেখা খবর নিয়ে এল, মহীন বাবু ধরা পড়েছেন।

বলিস কি !

খাঁটি খবর। খুব ভাল জায়গা থেকে জেনে এসেছি।

বিজলীর বিয়েতে গিয়ে যূথী খবরটা আরও বিশদ ভাবে জেনে এল। কলেজের বন্ধু হিসাবে বিজলী তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল।

বিয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে। মেয়ে দেখতে গিয়ে সেই দুর্ভাগ্যের পর রায় বাহাদুর পুত্রবধূর সম্পর্কেও উঁচু আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন—ও-বাড়ির বউ আর দু'টি যেমন এসেছে, এটিও তেমনি হবে। বাঁশবনে বাদুড়ই ঝোলে, কোকিল এসে বাসা বাঁধবে না কখনো। বিজলীর সঙ্গেই সম্বন্ধ হল শেষ পর্যন্ত।

বরবেশী বঙ্কিমের মুখে শুনল, মহীনের পোড়া-ঘা সেরে গেছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সে এখন। আর নীরোগ দেহে ওসব বায়ুগ্রস্ত মানুষ চুপচাপ থাকতে পারে না তো—গিয়েছিল গৌহাটি-অঞ্চলে আবার কোন গোলমাল ঘটাবার মতলবে। ধরা পড়েছে, লম্বা জেল হয়ে গেছে তার। জেল হয়েছে তবু রক্ষে। আইন যে রকম কড়া, অনেক-কিছু হতে পারত। বড় বড় চার্জগুলো একেবারেই প্রমাণ হল না কিনা—সাক্ষিসাবুদই মিলল না তার বিরুদ্ধে। লোকে বড্ড ভালবাসে, বড় শ্রদ্ধা করে—

বলে বঙ্কিমও যেন একটু বিমর্ষ হয়ে পড়ে। চন্দ্রা শুনলে কষ্ট পাবে, অসীম শ্রদ্ধা তার মহীনের উপর। কোথায় আছে চন্দ্রা এখন, কি করছে! ধরা পড়লে তারও তো শাস্তি হবে মহীন রায়ের মতন। কিম্বা কঠোরতর মহীনের চেয়েও।

কিন্তু যূথীর কষ্ট হয় না—বরঞ্চ আনন্দ লাগছে, বুকের উপর চাপা পাষাণ-ভার নেমে গেল যেন। আটক থাকুক, তবু প্রাণে বেঁচে রইল। লেখাপড়া ছেড়ে সর্বস্ব ছেড়ে এতকাল মাতামাতি করেছে, তারপর অমন জীবন-সঙ্কটের পর আপাতত ছুটি পেয়ে মহীন সুস্থ ও নির্বিঘ্ন আছে—মনের মধ্যে পরম সোয়াস্তি পাচ্ছে সে তার জন্য।

রেখা 'হায়' 'হায়' করছে। সমস্ত পণ্ড হল। অকারণ রক্তস্রোত। কত মানুষ মেরেছে, কত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, কত সংসার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! মেরে ধরে ঠাণ্ডা করে ফেলল এবারও?

যূথী বলল, বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে। আর তাকে ঠাণ্ডা করে রাখা যাবে না বোন।

লেখাটার যূথী নাম দিয়েছে—'সপ্তাহের স্বাধীনতা'।

হাসির ব্যাপার নিশ্চয়। মাত্র একটি সপ্তাহকাল জাতীয়-পতাকা উড়ছে সরকারি বাড়িতে। খদ্দরধারীরা থানা আর আদালতে জাঁকিয়ে বসেছে, গারদে যত হোমরা-চোমরা—মোটা মাইনে খেয়ে ভুঁড়ি বাড়িয়ে এসেছে যারা এতদিন। মহাব্যস্ত বিদ্যুৎবাহিনী আর নারীবাহিনী। নিজেদের ডাক চলাচল করছে—চিঠি খুলে পড়ে না আজকাল আর কেউ, আমার গোপন কথা প্রিয়জন ছাড়া কেউ জানতে পারছে না। টেলিগ্রাফ-টেলিফোনে সংযোগ নেই, খেয়া ডুবানো, রাস্তা কাটা। ভারতবর্ষের রাঙা মানচিত্রের উপর ছোট্ট একটি সবুজ ফুটকি। এ সব সাতটা দিনের জন্য মাত্র। সাতদিন পরে রক্তস্রোত আর লেলিহ আগুনে সবুজ ফুটকি নিচিহ্ন হয়ে গেল—লালে লাল আবার। হাসির কথাই বটে। রাজা-বাদশার পোলাও-কালিয়া ভোগের পাশে এ যেন চিরদুঃখীর একমুঠো পান্তাভাত নিয়ে সমারোহ। দেখে হাসি পায় না কার বলো?

কিন্তু দেশের মানুষ হেসো না, কিম্বা দুঃখ কোরো না তোমরা।

পৌনে-দুশ' বছরের পর প্রথম যারা স্বাধীনতার পতাকা উড়াল দেশের অখ্যাত অবজ্ঞাত কোণে কোণে, তাদের নমস্কার করো। যে কেউ চোখে দেখেছে সেই বিজয়দৃপ্তি, তার গল্প শুনেছে, খাঁচার সঙ্কীর্ণ কোটরে শান্ত মনে কলম পিষে কাটাতে পারবে কি সে কখনো? কে রাখবে আর তার মন আটকে? বাইরে শিকলের বন্ধন অটুট এখনো, কিন্তু বিমুক্ত ভাস্বর আত্মা অনন্ত আকাশে পাখা মেলেছে।

বিজ্ঞান নব নব দিকে শক্তির উদ্বোধন করে চলেছে। শক্তি সমস্তই শাশ্বত—নিষুপ্ত হয়ে ছিল আবিষ্কারের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। তেমনি জনশক্তি—দোলা দিয়ে বোঝা গেছে কত দুর্বার ও অপরিমিত।

তারা প্রস্তুত, অপেক্ষা করতে রাজি নয় আর। মানুষের আদিম-পুরুষরা যেমন দল বেঁধে চলত নূতন দেশ আর নব নব সমৃদ্ধির কামনায়, তারাও তেমনি এগোল স্বাধীন দেশের প্রমত্ত স্বপ্নে ভরপুর হয়ে। দারিদ্র্য থাকবে না, অবজ্ঞা আর অসম্মান অন্তর বিদ্ধ করবে না পদে পদে···সে যে কেমন হবে, সঠিক সুস্পষ্ট ধারণা নেই—মনোমত যত-কিছু আছে কল্পনায় সাজিয়ে এরা রচনা করেছে স্বাধীন ভাবীকালের দিনগুলি।

সামনে তাকাও। যা কিছু ঘটল এ তো কালবৈশাখীর বাতাস—কয়েক সপ্তাহ কিম্বা কয়েক মাসে থেমে গেল। বাত্যা আর মহাবন্যা প্রত্যাসন্ন। সেই ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে রঙিন পাতাবাহারের সারি। ঠুনকো কাচের সার্সির আড়ালে নিশ্চিন্তে যারা ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ জেগে উঠে তারা থরথর কাঁপবে। আগস্ট-বিপ্লব শিশুর খেলনা নিয়ে খেলা করার মতো মনে হবে সেদিন। কোটি কোটি মানুষের এই দেশ ভয়াল আবর্তে আলোড়িত হতে থাকবে, মন্থনে হলাহল উঠবে, অমৃতও উঠবে, সুনীল সমুদ্রজল কর্দমাক্ত হবে। সামনে তাকিয়ে আজকে আমি রাসবাগানের শান্ত স্থির সুপ্রাচীন আমগাছটা দেখছি না, বদ্ধ নিষ্প্রাণ পচাগলি দেখছি না—দেখছি অদূরকালের উন্মত্ত সংগ্রাম। আজিকার বিক্ষোভ—এই এক সপ্তাহের স্বাধীনতা নগণ্য মনে হবে তার তুলনায়। কিন্তু গৌরব বিয়াল্লিশের আগস্টেরও—ঝড়ের যে অগ্রদূত। এর নেতা হয়েছিলাম তুমি আমি এবং আমাদেরও নিচেকার নিতান্ত সাধারণ যারা। শেষরাত্রে যেন জাল ছেঁকে আহিমাচল-কুমারিকা নেতাদের ধরে ফেলল। কিন্তু মানুষ ভয় পায় নি—আয়োজন নিঃশব্দে চলল দূরতম পল্লীপ্রান্ত অবধি। দেখা গেল, জাগ্রত আমরা—বাছাইকরা একটি-দুটি একশ-দু'শ বা হাজার-দু'হাজারের উপর নির্ভরশীল আর নই। জেলের ভয় মানুষের আগেই ভেঙেছে, ছোট্ট ছেলেটা অবধি মৃত্যুভয়ও ভুলেছে—বিয়াল্লিশের আগস্ট নিঃসংশয়ে সেই প্রমাণ দিয়ে দিল।

উত্তর কথা

(১)

বছর তিনেক কেটে গেছে তারপর।

কাগজে ফলাও করে একটা খবর দিচ্ছে, বড়লাট ও নেতাদের কনফারেন্স। সিমলা-পর্বতে তুমুল আয়োজন।

যূথী বলে, সেই মামুলি চাল। পৃথিবীর দরবারে ইংরেজ ভালমানুষ সাজছে। পর্বত শেষ পর্যন্ত মূষিক প্রসব করবে, দেখিস। কিছু হবে না।

হলও তাই। কনফারেন্স ভেস্তে গেল।

রেখা বলে, দেশের লোকের কিছু হল না, তবে আমাদের একটা বড় লাভ হয়েছে। অনেককে ছেড়ে দিয়েছে—তার মধ্যে মহীন বাবুর নাম দেখলাম।

রেখারই পরামর্শক্রমে শশিশেখর নিজে রায়গ্রামে ছুটলেন। এ এমন ব্যাপার—পরের উপর বরাত দেওয়া চলে না। বেলেডাঙা এখনো মিলিটারির কবলে—পথের দুর্গমতা তেমনি আছে। নৌকা ও গরুর গাড়ি যোগে অনেক কষ্টে অবশেষে পৌঁছলেন। অবস্থা ভাল হয়ে যাবার পর এই ক'বছরের মধ্যে এত কষ্ট তিনি করেন নি। কষ্টের ফল মেলে, তবে তো!

বাইরে প্রকাশ, নূতন টেণ্ডারের তদ্বির করতে বিলাতি বোতল ও আইসক্রিম সন্দেশ সহ তিনি পার্বতীপুরে মেজ-সাহেবের কাছে গেছেন। যূথী পর্যন্ত সঠিক খবর জানে না। সৌদামিনী ও শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে বিস্তারিত কথাবার্তা হল, শশিশেখর করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে সৌদামিনীর কাছে কন্যাদায় জানালেন। মহীনও শুনল

সমস্ত কথা। তারপর শশিশেখর ফিরে আসবার দিন পাঁচেক পরে মহীনের স্বহস্তে লেখা চিঠি এসে পৌঁছল, বিয়েতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু—

'কিন্তু'র ভাবনাটা ধীরে সুস্থে পরে ভাবা যাবে। চিঠি হাতে করে শশিশেখর মেয়ের কাছে এলেন।

পড়ে দেখ্। কি বলবি এবারে তুই ?

যূথী অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল না, বরঞ্চ মৃদু হেসে মুখ নামাল।

বেঁকে বসবি নে গেল-বছরের মতো—বিভাসকে যখন পাকা কথা দিয়ে এলাম ? আগেভাগে ঠিক করে বল্।

ইন্দুবালা ছিলেন। তিনি বললেন, কি অত জিজ্ঞাসা করছ ওকে ? জিজ্ঞাসার কি আছে ? তোমার যেমন কাণ্ড !

রুক্ষ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে শশিশেখর বললেন, সেবারও তুমি ঐরকম বলেছিলে। বাপান্ত দিব্যি করেছি, মারফতি কথায় আর কাজে নামব না। কি কেলেঙ্কারিটা হল—বিভাসের কাছে তারপর থেকে আমি আর মুখ দেখাতে পারি নে। বিয়ে করবি তো যূথী ? স্পষ্ট কথা শুনতে চাই।

আমি কিছু জানি নে বাবা। তুমি যাও—

হাসতে হাসতে যূথী ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

ইন্দুবালার আনন্দের সীমা নেই। মত পাওয়া গেল এতদিনে। বিভাস হেন পাত্রের সম্পর্কে যে রকম নাটকীয় ব্যাপার করে বসল, তাতে মেয়ের বিয়ের আশা তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন একরকম। রেখাই শেষটা আলোর সন্ধান দিল। ভালোয় ভালোয় এখন শুভকর্ম হয়ে গেলে হয়। যা ছেলে এই মহীনেরা, কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই এদের সম্পর্কে। ইতিমধ্যে আবার কবে কি ধুয়ো উঠবে, জেলের ডাক এসে যাবে—শশিশেখর তাই একবিন্দু গড়িমসি করছেন না। বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গেল। পাকা কথাবার্তার পর থেকে হাসি উপছে পড়ছে। ইন্দুবালার চোখে-মুখে।

হাসছেন শশিশেখরও কিন্তু আড়ালে গেলে মুখ গম্ভীর হয়। এমন মেয়ে—রাজার ছেলে লুফে নিয়ে রাজ-অট্টালিকায় তুলত, রাজরাজ্যেশ্বরীর সজ্জায় সাজিয়ে যূথীকে তিনি সম্প্রদান করতে চেয়েছিলেনও কিন্তু—। দুঃখটা আরও বেড়েছে মহীনের চিঠির ঐ 'কিন্তু' নিয়ে। বিয়ের তার আপত্তি নেই, কিন্তু শাঁখা আর শাড়ির বেশি মেয়ের সঙ্গে থাকতে পাবে না। পটের মতো মেয়ে—তার গায়ে এক সেট জড়োয়া গয়না থাকলে, কি চাঁপার কলির মতো আঙুলে একটা হীরের আংটি থাকলে মহাভারত ওদের অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সর্বক্ষেত্রেই উল্টো বুদ্ধি স্বদেশি ছোঁড়াগুলোর। আর পরের ছেলের কথা বলে কি হবে? নিজের মেয়ের রকম দেখ—ঐ হতভাগাটারই জন্য ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে ছিল। বিভাস ছাড়াও কত কত ভাল সম্বন্ধ এসেছে, মিষ্টিকথা বলে কিংবা গালমন্দ করে—কোন রকমেই মেয়ে-দেখানোর জন্য যূথীকে বের করা যায় নি কুটুম্বর সামনে।

তবে এই একটু অনুগ্রহ করেছেন বাবাজীবন, আলো-বাজনা কিম্বা লোকজন খাওয়ানো সম্বন্ধে কোন হুকুম জারি করেন নি। খেয়াল হয় নি সম্ভবত। এই দিক দিয়ে আশ মেটাবেন, শশিশেখর ঠিক করেছেন। ফটকের উপর রসুনচৌকি বসে গেছে, ব্যাগপাইপ আর ব্যাণ্ড দু-রকমেরই বায়না দেওয়া হয়েছে। আর সম্প্রতি যশোর জেলায় এক মৌজা খরিদ করেছেন, সেখান থেকে স্বদেশি ঢোল-শানাই আসছে দুটো-তিনটে দল।

নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি হচ্ছে আজ দিন আষ্টেক ধরে। বাড়ির গাড়ি দুটো আছেই, তার উপর পুরো দিন হিসাবে ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছে। শশিশেখর, ইন্দুবালা, রেখা আর কোন কোন ক্ষেত্রে যূথীও—চারজনের চতুর্মুখী অভিযান চলেছে সকাল থেকে রাত্রি ন'টা ইস্তক। আইন মতে পঞ্চাশজনের বেশি খাওয়ানো মানা—চিঠির পাদটীকায় ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—'অনুগ্রহপূর্বক পূর্বাহ্নে নিজ

নিজ রেশন পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।'

কি মশায় চাল-চিনি পাঠিয়ে দিতে হবে নাকি হিসেব করে?

কিছু না, কিছু না! হেসে শশিশেখর বলেন, যেমন ব্যাধি তার তেমনি চিকিচ্ছে। যদি কেউ ধরতে আসে, লোক খাওয়াচ্ছ তার জিনিস পেলে কোথায়—চিঠি ফেলে দেব তক্ষুণি। যাঁরা খাচ্ছেন, এ সমস্ত তাঁদেরই জিনিসপত্র। আর আপনারাও যেমন—কার ম্যাথাব্যথা পড়েছে, কে আসছে খোঁজাখুঁজি করতে? যদি আসেও, সরকারি মানুষ তো—মুনি-ঋষি নয়, একখানা কি দেড়খানা নোট গুঁজে দিলে আপনি মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আইনমাফিক শুধু একটা পথ খুলে রাখা।

মৌজায় কাছারিবাড়ির লাগোয়া বড় এক দীঘি কেনা হয়েছে, তাতে বিস্তর মাছ। সেই মাছ আনা হয়েছে, তহশিলদার অক্ষয় সাধুখাঁ নিয়ে এসেছে। আর মেয়েপুরুষ আট-দশজন এসেছে বিয়ের কাজে খাটাখাটনি করবে বলে। ঘোড়ার গাড়ি থেকে একটা মাছ নামিয়ে বাড়ির ভিতর আনতে মরদগুলো হিমসিম হয়ে গেছে। সদর-বারাণ্ডার সামনে এনে ফেলল। শশিশেখর ছুটে এলেন, আরও অনেকে এল দেখতে। দেখবার মতোই বটে! পুরাণো মাছ—আঁশের উপর ছাতা পড়ে মিশ-কালো রং ধরেছে।

বাঃ বাঃ—কত ওজন দাঁড়াবে অক্ষয়? ঐ কাতলাটাই ধরো। আধ মন—না আরও বেশি হবে—কি বলো?

অক্ষয় বলে, আধ মন কি বলছেন কর্তা? কাঁটায় চড়িয়ে দেখুন, মনের ধাক্কায় পৌঁছবে। মুণ্ডুটাই হবে তো সের দশেক।

সমস্ত আমাদের দীঘির?

এ আর কি! জালে রাখা গেল না যে, ছিঁড়ে পালাল। আমাদের রাখাল পাড়ুই অবধি আঁতকে উঠেছিল। বলে, কুমীর পড়েছে জালে।

খুব তারিপ করতে লাগলেন শশিশেখর। তোমার মেয়ের একটা

শাড়ি কিনে দেব বলেছিলাম, এবারে উদ্যুগ করে নিয়ে যেও অক্ষয়। বাহাদুরি আছে সত্যি, অত বড় জলকর মাঙনাই তো কিনে দিয়েছে এক রকম।

অক্ষয় চোখ টিপছে দেখে তিনি থেমে গেলেন।

কমবয়সি একটি মেয়েলোককে দেখিয়ে অক্ষয় বলে, এর নাম সারদা বেওয়া। দীঘিটা এদের ছিল। কাজকর্ম করবে, শহর দেখবে, ভাল-মন্দ খেয়ে যাবে দুটো-তিনটে দিন—তাই ক'জনকে নিয়ে এসেছি। অনেকেই আসতে চাচ্ছিল, তা গ্রামসুদ্ধ তো আর নিয়ে আসা চলে না!

সারদা এগিয়ে এসে গড় হয়ে প্রণাম করল। শশিশেখর দু-পা পিছিয়ে গেলেন। সতুর মা যাচ্ছিল, ডাক দিলেন। ওরে শোন্, যূথীর কাছে নিয়ে যা এই মেয়ে ক'টিকে। এক-একখানা পুরাণো কাপড় দিয়ে দিক। যাও মায়েরা, আগে ভদ্রস্থ হয়ে এসো।

তাড়ু হাতে বসন্ত হালুইকর দেখা দিল। বসন্তর সঙ্গে তার সহকারী নেপাল।

এখন সকালবেলা?

কালকের কিছু ছানা রয়ে গেছে, সাপটাতে পারা যায় নি।

বড় বড় বারকোশে ছানা রেখে দিয়েছে, বারকোশের একধার নিচু, জল গড়িয়ে জমছে সেদিকে। একদলা তার থেকে তুলে নিয়ে বসন্ত গালে ফেলল। মুখ বিকৃত করে বলে, টকে গিয়েছে—

নেপাল বলে, তা হলে?

চিনি দিয়ে ঘুঁটে দিয়ে যাই। স্বাদ না হোক, মিষ্টি তো হবে। কত রকমের মানুষ খাবে—সরেশ-নিরেশ সব রকমের টান পড়ে যাবে। চিনির রসটা চাপিয়ে দে ন্যাপলা।

দু-জনে আংটা ধরে ভিয়েনের কড়াই উনুনে চাপাল। গাঁট থেকে বসন্ত গাঁজা বের করল এইবার। গাঁজা টিপছে আর নেপালকে

নির্দেশ দিচ্ছে, কি পরিমাণ চিনি ঢালতে হবে কড়াইয়ে। দু-কৌটা জল দিয়ে নিল একবার বাঁ-হাতের চেটোয়। শশিশেখর আসছেন দেখে গাঁজা সমেত হাতখানা তাড়াতাড়ি মুঠো করল।

শশিশেখর বললেন, চিনির বস্তা উঠোনের উপর ফেলে রেখেছে, কি আক্কেল বল দিকি তোমাদের? সুঁচের ছেদা দিয়ে হাতী বেরিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু সমস্ত ঢেকেঢুকে করতে হয় রে বাপু। লোকে কোথাও এক ছটাক চিনি পাচ্ছে না। বস্তা দুটো ঘরের ভিতর তুলে দাও, দরকারের সময় বের করে এনো।

বলতে বলতে এগিয়ে চললেন। মাছ কোটা আরম্ভ হয়ে গেছে। নূতন-কেনা চাটায়ের উপর সারদা, পাঁচুর মা এরা সব বঁটি নিয়ে বসেছে সারবন্দি। নারিকেলের মালা দিয়ে আঁশ ছাড়াচ্ছে। ল্যাজার দিকে পা দিয়ে চেপে ধরেছে, মালা দিয়ে ঘসছে, বড় বড় আঁশ ছড়িয়ে পড়ছে চার দিকে।

রেখা এল। সঙ্গে ফুটফুটে ছোট মেয়ে কয়েকটি।

কি দিদিমণি?

আঁশের ঝাঁপি করবে এরা, আমায় সুপারিশ ধরেছে। বড় বড় দেখে বেছে আঁশ দেবেন তো কতকগুলো।

অক্ষয় তদারকে আছে এদিককার। বলে, খুব—খুব। এক ঝুড়ি, দু-ঝুড়ি—যত দরকার। হাতের কাজ উঠে গেলে সারদা, কতকগুলো আঁশ রেখে দিও ছোটদিদিমণির জন্যে। কলতলায় ঘসে ঘসে সাফ করে দিও।

রেখা চলে গেলে চোখ টিপে অক্ষয় বলে, কর্তার ছোট মেয়ে। বাহারখানা দেখেছিস? হাতে ঘড়ি বেঁধেছে সাড়ে ছ'শ টাকার। বেনারসি দিয়ে পা মোছে এরা আজকাল।

কি কাজে অক্ষয়ের ডাক এল। যাবার সময় সারদার কানের কাছে মুখ এনে চুপি-চুপি বলে যায়, কড়া নজর রেখো। কলকাতা শহর এর নাম—এখানে সব শালা চোর। বড় ছোট বাছবিচার

নেই। দালানে নিয়ে নিয়ে রাখছে, তুমি হাজির থেকো সারদা, নয় তো কোটা-মাছই লোপাট করে দেবে।

(২)

সন্ধ্যা হল। ব্যাণ্ড-ব্যাগপাইপ, ঢোল-কাঁসি মিলে এমন কাণ্ড শুরু করেছে পথ-চলতি মানুষ কানে হাত-চাপা দিয়ে রাস্তা পার হয়। মোটরের পর মোটর নিমন্ত্রিতদের নামিয়ে দিয়ে পার্কের পাশে লাইনবন্দি দাঁড়াচ্ছে। শশিশেখর আর তাঁর জ্ঞাতি সম্পর্কের কয়েকজন গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করছেন। ছোট ছোট মেয়েও ক'টি আছে, বেলফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে নিমন্ত্রিতদের।

সময় হয়ে গেছে, বর পৌঁছায় না কেন? দোতলার বারান্দায় মেয়েরা ভিড় করেছে। ফুল আর খই ছড়াবে, শঙ্খ বাজাবে ওখান থেকে। শাড়ি-গয়নার ঝিকিমিকি, কলহাস্য, কৌতুক-চঞ্চল দৃষ্টি। এ যেন ইট-কংক্রিটের বাড়ি নয়, পরীর দেশের একটুকুরা এসে পড়েছে এখানে। কিন্তু বর আসছে না কেন এখনো?

কলরব উঠল রান্নাবাড়ির দিক দিয়ে। রেখা সকলের আগে দেখতে পেয়েছে, সে চেঁচাচ্ছে, এই যে—এসে গেছে এদিক দিয়ে—

খিড়কির দরজার ওদিকে সেই পুরাণো সরু গলিটা। সৃষ্টিছাড়া বর ঐ পথে চলে এসেছে, সদর রাস্তা চোখে পড়ে নি। পুরুত সঙ্গে এসেছেন, গায়ে পড়েই তিনি শোনাতে লাগলেন এই গলিটুকুই মাত্র তাঁরা পায়ে হেঁটে এসেছেন। বাকি সমস্ত পথ বিরাট এক ট্যাক্সি-গাড়িতে। কি করা যাবে, কোন রকমে যে ঢোকানো গেল না—তাই ট্রাম-রাস্তা থেকে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসতে হল।

হুড়দাড় করে মেয়েরা ছুটল। ফুল-খই ছড়াবে কি—বর ইতিমধ্যেই বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে গেছে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসেছে।

ব্যাণ্ড-ব্যাগপাইপেরা বেকুব হয়ে গেছে, বর আসবার সময় বিক্রম দেখাবে ঠিক করেছিল—এখন বাজাবে কি বাজানো বন্ধ রাখবে, সাব্যস্ত করতে না পেরে শশিশেখরের দিকে তাকায়।

শশিশেখরের মুখ অন্ধকার। জামাই এসেছে খবর পেয়েও তিনি ভিতরে এলেন না জামাই দেখতে। বরযাত্রী একজন মাত্র—বিনয়। বরকর্তা সুতরাং সে-ই। শশিশেখরের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য বাইরে যে সব চেয়ার পাতা আছে, তারই একটায় সে বসে পড়ল।

রেখা থাকতে পারে না, এই বৈঠকখানা ঘরেই চলে এল তার বয়সি পাঁচ-সাতটি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে।

বাবাঃ, নতুন জিনিস দেখালেন বটে!

মহীন জিজ্ঞাসা করে, কি?

চোর নাকি আপনি? সিঁদ কাটবার মতলবে চুপিসারে পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকলেন?

আর একটি মেয়ে বলে, বিয়ে করতে এমন ভাবে কেউ আসে?

মহীন ভালমানুষের মতো বলল, আর কখনো বিয়ে তো করি নি। জানব কি করে বলুন।

এত করে গেট সাজাল আজ দু-দিন ধরে, এত মানুষজন! সকলে আমরা সেই সন্ধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে—

বলতে বলতে রেখা থেমে গেল। অশ্রুর আভাস যেন তার কণ্ঠে। বলে, বাবার কোন সাধ মেটাতে দিলেন না জামাইবাবু। তাঁকে এমনধারা বেকুব করে কি লাভ হল বলতে পারেন?

মহীন বলে, আমি বুঝতে পারি নি—সত্যি বলছি রেখা, যে ওটা খিড়কির দরজা। ঢুকে খানিকটা এসে তারপর বুঝলাম। তখন আর ফিরে যাওয়া চলে না।

কোনটা সদর, কোনটা খিড়কি—তা-ও ধরতে পারেন না? বিয়ে-বাড়ি—না দেখতে পেলেন একটা মানুষ, না আলো-রসুনচৌকি

—তবু বুঝলেন না বরের ঢুকবার পথ ওটা নয় ?

মৃদু হেসে মহীন বলে, ভুলে যাচ্ছ রেখা, তিন বছর আগে জেলে ঢুকেছি। আজকের যেটা খিড়কি সেইটাই তখন সদর ছিল তোমাদের। তোমাদের বাড়ি আমি আরও একবার এসেছি কিনা তোমার দিদির সঙ্গে! তা ছাড়া—

একটু ইতস্তত করে বলে ফেলল, সে সময়ে তোমাদের বাড়ি বিয়ে-থাওয়া হলে দরজায় বসত কি রসুনচৌকি, জ্বলত আলো? বড়ঘরের এই যে মেয়েরা এসেছেন, পায়ের ধূলো দিতে আসতেন কি এঁরা? জবাব দাও, শুধু আমায় দোষ দিলে হবে না।

সত্যি, জবাব নেই। এই তিনটে বছর তিন শতাব্দী বলে মনে হয়। এরই মধ্যে রেখারা সেই অতীত ভুলে যেতে বসেছে। এখন যেটা রান্নাবাড়ি, সেইটেই বসতবাড়ি ছিল এদের—রাসবাগানের পিছনে এঁদো সেই কুঠুরি কয়েকটা। গলিপথে বাড়ি ঢুকতেই হত। গলিটাও কি এখানকার এমনি? নর্দামায় জল জমে থাকত, বারো শ' বছরে ঝাঁট পড়ত না, নাকে কাপড় দিতে হত আবর্জনার গন্ধে, রাসবাগানের অতিকায় আমগাছগুলো এমন আঁধার করে রাখত যে দিন-দুপুরেও গা ছমছম করত গলিটুকু পার হয়ে আসতে।

রেখা বলে, সত্যিই আপনি জানতেন না রাসবাগান কিনে সেখানে আমাদের বাড়ি উঠেছে, সদর-রাস্তায় বাড়ির মুখ হয়েছে ?

মহীন ঘাড় নাড়ে। না, কিছু না। আজকেই এসে দেখছি এই ব্যাপার। দৈত্যের মতো সেই গাছগুলো নিপাত গেছে। তোমাদেরও নতুন চেহারায় দেখতে পাচ্ছি। আজব জগৎ দেখছি বাইরে এসে। জেলে খবরের কাগজ দিত—তাতে আমরা পড়তাম, মন্বন্তরে লাখ লাখ মানুষ মরছে। আর আকাশ ফুঁড়ে যে টাকার বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, টিনের ঘরের সামনে বিশাল তেতলা উঠছে, এসব সুখের খবর কোন কাগজে দেয় নি তো রেখা-ভাই।

বিয়ে শেষ হল, বর-কনে বাসরে গেছে। আত্মীয়রা ঘিরে

বসেছেন। মহীন সকলের কথাবার্তার জবাব দিচ্ছে, হাসছেও—তবু তার কেমন-কেমন ভাব। বুঝতে পারছে, যেমন হওয়া উচিত এখানে, ঠিক তেমনটি সে হতে পারছে না। কোনদিনই সে মিশুক নয়—তার উপর এই তিন বছর জেলে থেকে একেবারে দল-ছাড়া হয়ে গেছে। নতুন সমাজে এসেছে, এখানে সবই অচেনা। উল্লাস দেখাতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে যায়, অশোভন বাড়াবাড়ি হচ্ছে নাকি? চুপ করে থেকেও সোয়াস্তি পায় না—দার্শনিক স্তব্ধতার জায়গা নয় তো এই বিয়ের বাসর!

মেয়েরা ক্ষুণ্ণ। সুবেশ রূপসীরা বিদ্যুতের মতো ঝিকমিক করছেন। পরিমার্জনায় কালো মেয়েদেরও রঙের উপর রূপালি জৌলস খুলেছে। কোন্ শাড়িতে কোন্ ব্লাউস ম্যাচ করবে, কোন্ ঢঙে কেশবিন্যাস মানাবে ভাল, তা নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না—আর বেরসিক জামাই মুখ তুলে চাইল না একটি বার। দুটি মেয়ে রাগ করে তো উঠেই দাঁড়াল—

উঠলি মীরা? এর মধ্যে?

যে কাঠখোট্টা জামাই তোমার কাকীমা। রস-কষ নেই—না দেহে, না মনে।

চুপ! চুপ!

গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন, মানুষ বলে ভাবেন না আমাদের। অত দেমাক কিসের শুনি?

আঃ—বলে পাশের মেয়েটি মুখ চেপে ধরল।

ইন্দুবালা কি করবেন ভেবে পান না। সতুর মা এসে ডাকে, নিচে এসো মা। দেখে যাও কি কাণ্ড—

কি, কি রে?

সরে পড়ে বাঁচলেন তিনি এদের সামনে থেকে।

কাণ্ড একখানা বেধেছে বটে! নিমন্ত্রিতেরা খেতে বসেছেন, দেওয়া-থোওয়া হচ্ছে, খুব হৈ-চৈ গণ্ডগোল সেদিকে। ভাজা-মাছের

পাহারায় ছিল সারদা। ফাঁক বুঝে গবাগব সে খাচ্ছিল। অক্ষয় কি কাজে এসে পড়ে সেই সময়। তার গালিগালাজে আরও অনেকে এসে পড়ল। মাছ এখনো সারদার মুখ-ভরতি, গিলে ফেলার ফুরসৎ পায় নি, চেষ্টা করছে—চোখ লাল হয়ে গেছে, দম আটকে না যায়।

অবস্থা দেখে শশিশেখরের দয়া হয়। আহা—এ কি করছ তোমরা? ওদেরই পুকুরের মাছ—দু-খানা খেয়েছে, তা কি হয়েছে? হাঁ করো তুমি মা, ফেলে দাও ওগুলো। এই ঠাকুর, খুরিতে করে ঝোলের মাছ দিয়ে যাও তো খানকতক—

ইন্দুবালা রাগ করে ওঠেন, থাক—মায়া দেখাতে হবে না। বিধবা মানুষ মাছ খাচ্ছে, চুরি করে খাচ্ছে—আর আস্কারা দিচ্ছ তুমি এসে? নিজের কাজে যাও।

সারদা মুখ তুলতে পারছে না, মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারলে সে বাঁচে।

ছোট্ট একটি ঘটনা—মাস আষ্টেক আগেকার। বুড়ো বর—ওদের সমাজে কন্যাপণের জোগাড় করতে বয়স হয়ে যায়, আর খুব বেশি টাকা পণ দিতে না পারলে ডাগর মেয়েও জোটে না—তাই কচি মেয়ে ও বুড়ো বরে বিয়ে হয় প্রায় সর্বক্ষেত্রে। সারদার বুড়ো অথর্ব বর মরো-মরো হল। দীঘি-ভরা মাছ—বুড়োরই যৌবন বয়সে ছেড়ে দেওয়া—ঐ মাছেরই কতকগুলো ধরে সেবার পণের টাকার জোগাড় করেছিল। পাড়াপড়শিরা বলল, মাছ-ভাত খেয়ে নে রে বউ, বুড়ো মরে যাবে—আর তো খেতে পারবি নে। তার ভাসুর-পো সমস্ত পাড়া ঘুরে বেড়াল একগাছা জালের চেষ্টায়। তারপর ভিন্ন গ্রামেও গেল। কোথায় জাল! কাপড় বোনবারই সুতো জোটে না, তার জলে! বুড়োকে অন্তর্জলীতে নামিয়েছে, খাবি খাচ্ছে সে—সারদার তখনো আশা, জাল কাঁধে ভাসুর-পো দড়াম করে বড় এক মাছ উঠানে এনে ফেলবে এইবার।

রাত গভীর, শহর নিস্তব্ধ। রাস্তার আলো নিভিয়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ। বিয়েবাড়ির আলোও নিভল একে একে। অনেক দূরে হাসপাতাল—তারই আলো কেবল দেখা যাচ্ছে, অন্ধকার পটের উপর সারি সারি জানলার ফ্রেমে বসানো আলো। মেয়েরা সবাই বিদায় হয়ে গেছে, বরণ-প্রদীপটা জ্বলছে শুধু টেবিলের নিচে। ওটা নেভাতে নেই, সমস্ত রাত জ্বলবে।

যূথী নিঃশব্দ হয়ে আছে। কিন্তু ঘুমোয় নি, অনুমান হচ্ছে। না, ঘুমোয় নি। নিশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে, পাশ ফিরে শুলো একবার। কিন্তু এ রকম করছে কেন, কথা বলে না কেন? নূতন পরিচয় নয়, এমন লজ্জাবতী নববধূ হবার মানে হয় না কিছু। বিয়ে হয়ে মেয়েরা আর এক রকম হয়ে যায় বুঝি সঙ্গে সঙ্গে? না, রাগ করেছে?

মহীনের মন ভরে উঠল। একদিন এ বাড়িতে এসে নিতান্ত অকারণে একে অপমান করেছিল, কিন্তু রাগ করে নি সেজন্যে—অতি অসময়ে অদ্ভুত দুঃসাহসিকতায় তাকে বাঁচিয়েছিল পুলিশের কবল থেকে। বিভাসের মতো পাত্রকে কুকুরের মতো দূর-দূর করে দিয়ে তারই জেল থেকে ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ছিল। গোলাপি রঙের পাতলা সিল্কের শাড়ি পরনে, আটো-সাটো জামা গায়ে—এতক্ষণ জোরালো বিদ্যুতের আলোয় অঙ্গ-শোভা উগ্র হয়ে ফুটে বেরুচ্ছিল। এখন আর এক ছবি—রেড়ির তেলের মিটিমিটি আলোয় স্বপ্নমায়া। আলোর শিখা কাঁপছে, বিছানায় ফুল ছড়ানো, কাপড়চোপড়ে সেন্টের মাদক গন্ধ, যূথী একটুখানি কাত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আছে। মহীনের সঙ্কোচ লাগে, এখানেও যেন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। দেশের মুক্তি-সাধনায় এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ছেলেদের আশ্রমে আর সমাজ-স্পর্শহীন জেলে জেলে অনেক বছর কাটিয়ে দিয়ে কিছুতে যেন জোড় লাগানো যাচ্ছে না জীবনের সঙ্গে।

উঠে মহীন সুইস টিপল। ঘুমোয় নি যূথী, চেয়ে দেখছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে-ও। বিছানার ও-ধারে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

কথা বলছ না, আমার উপর রাগ করেছ যূথী?

চোখ দুটি নিচু হয়ে আছে মাটির দিকে। কলেজের সেই প্রগল্‌ভ মেয়ে মুখচোরা মহীনকে অপদস্থ করে আনন্দ পেত, আজ তার কি হয়েছে—চোখ তুলতে গিয়ে আবার নিচু হয়ে পড়ে। যতবার চেষ্টা করে, পেরে উঠছে না।

মহীন ডাকে, শোন যূথী, তাকাও এদিকে।

অবশেষে মুখ ফেরাল। হাসির মৃদু প্রলেপ ঠোঁট দুটিতে। ভয়-ভয় করছে বড়। মহীন এসে হাত ধরল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে, পুরুষের কঠিন বাহু-পেষণে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে তার নরম দেহ। বুকের উপর তাকে লুফে তুলে নিল। যূথীর সম্বিত নেই তখন।

কথা তারপর আর ফুরোয় না।

আচ্ছা, নতুন পরিচয় নয় আমাদের—অমন মুখ-গোমড়া করে কেন ছিলে বলো তো?

আমি আগ বাড়িয়ে বলতে যাব কেন? মান নেই বুঝি আমার!

আর মান নিয়ে আমিও যদি তোমার মতো পড়ে থাকতাম ঘুমের ভাণ করে?

পারলে না তো! হেরে গেলে—নিজেই কথা বললে খোশামুদি করে। হি-হি-হি—

বিমুগ্ধ মহীন বলতে লাগল, গেল-মাসের এই সাতাশে জেলের মধ্যে এতক্ষণ কম্বল মাথায় নাক ডাকাচ্ছি। তখন কি জানি, একটা মাস পরে আমার ভাগ্যে—

চুপ! তার মুখ চেপে ধরল যূথী।

মহীন হেসে বলে, শুনতে চাও না জেলের কথা? কিন্তু কী বিচিত্র জীবন মানুষের! আজকে বাসরঘরে, আর কাল হয়তো এমনি সময়—

যূথী বলে, পরমানন্দে কাল এমনি সময় তোমার সঙ্গে রায়গ্রামে

গিয়ে উঠেছি।

সহসা মহীনের মুখখানা কাছে টেনে নিয়ে যূথী সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে।

কি দেখছ?

শিরা বেরিয়ে পড়েছে। উঃ, এই তিন বছরে নিংড়ে যেন সকল রস বের করে নিয়েছে। চিনতে পারা যায় না।

মহীন বলে, তোমাকেও চেনা যাচ্ছে না যূথী। তিন বছরে আরো অপূর্ব হয়ে উঠেছ।

যূথী প্রসন্ন মুখে বলে, আর অবস্থাও ফিরেছে, দেখছ তো! এমন হবে কেউ ভাবতে পারে নি। কনকনে সেই অন্ধকার বাড়ি-- মাগো!

সবুজ কম্পউণ্ডওয়ালা ঝকঝকে এই তেতলা হয়ে গেছে। রূপসী ছিলে তখনো তুমি, কিন্তু নকল সাজ ফেলে দিয়ে অপরূপ হয়েছ। আজকে নতুন করে তোমার প্রেমে পড়লাম।

টং-টং বাজল চারবার।

সর্বনাশ! ঘুমোও, ঘুমোও—কালকে আবার ট্রেন-নৌকো গরুর-গাড়ি—

খুব আনন্দ হচ্ছে, না যূথী?

যূথী সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, তা মিছে বলব কেন? পাড়াগাঁ হোক, পুরাণো বাড়ি হোক, আমার নিজের ঘরবাড়ি তো সেটা! যাই বলো, শহরের চেয়ে অনেক ভালো পাড়াগাঁ জায়গা—সেখানে জীবন আছে, মানুষ মন খুলে হাসতে জানে। জানো তো, তোমাদের ও-অঞ্চল দেখে এসেছি সেবার নীলগঞ্জ গিয়ে। বড্ড পছন্দ হয়েছিল আমার। যাকগে—ঘুমোও দিকি এবার।

মহীনের কপালের উপর ধীরে ধীরে যূথী মোলায়েম আঙুল ক'টি বুলাতে লাগল।

(৩)

মহিষখোলা নদীর ঘাটে নৌকা লাগল, তখন পড়ন্ত বেলা। বিনয় কলকাতায় রয়ে গেছে, ফুলশয্যার দরুন কিছু কেনাকাটা করে সকালবেলার দিকে পৌঁছবে। নৌকা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে মহীন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। না, গরুর-গাড়ি আসে নি তো! লোকজন কেউ এসে পৌঁছয় নি বাড়ি থেকে। বড় সকাল সকাল এসে পড়েছে, জোয়ার তীরবেগে নৌকা ছুটিয়ে এনেছে।

আহা, জুতো কি করলে? জুতো পরে নামো যূথী।

মধুর হেসে আবদারের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে যূথী বলে, না—

গোঁয়ার্তুমি নয়, যা বলি শোনো।

যূথী বলে, পীচের রাস্তা নয়—মাটি এখানে। মাটির ছোঁওয়া পায়ে নেবো। কী যে বলো তুমি! জুতো পায়ে মেমসাহেব হয়ে যাব নাকি আমার নতুন মা-দিদিমা-দাদামশায়ের কাছে? সে আমি পারব না।

হাড়-পাঁজরার টুকরো এইসব গাঙের ধারে। পায়ে ফুটে যাবে, টের পাবে তখন।

অবাক হয়ে যূথী জিজ্ঞাসা করে, হাড়? কিসের হাড়? কোথায়?

কোথায় নয় বলো! সারা অঞ্চল জুড়ে। আর সব চেয়ে বেশি এদিকটায়। শ্মশান ঐ পাশে কিনা! মড়া পড়ে পড়ে থাকত—টাটকা-বাসি কাঁচা-আধপোড়া। শিয়াল-শকুনের মচ্ছব লেগে গিয়েছিল, টেনে টেনে এদ্দূর এই পথের উপর অবধি নিয়ে আসত।

দেখেছ তুমি?

মহীন বলে, জেলে ছিলাম যে! তোমরা দেখ নি—আমিও না। তোমরা জেলের বাইরে ছিলে, কিন্তু শহরে ছিলে—রাসবাগানের গাছ কেটে ফেলে তখন তোমাদের কংক্রিটের বাড়ির ভিত-পত্তন

হচ্ছে। এখন দেখে নাও কিছু। আস্ত চেহারার না দেখলেও হাড়-পাঁজরা মাথার-খুলি ঢের ঢের দেখতে পাবে।

সভয়ে যূথী শ্মশানের দিকে তাকায়, আবার তাকায় মহীনের দিকে। শেষে জোর করে হেসে উঠল।

মিথ্যে কথা। মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ তুমি আমায়। আমায় ভয় দিয়ে মজা দেখছ।

ছুটে এসে সে মহীনের হাত জড়িয়ে ধরল। আরামের নিশ্বাস ফেলে বলে, ব্যস—কিচ্ছু আর গ্রাহ্য করি নে। কত কষ্ট করেছি জান এই অধিকারটুকু পাবার জন্যে? কত নিন্দে সয়েছি আপন-পর সকলের কাছে?

নদী-চরের সীমা ছাড়িয়ে তারা রাস্তায় এসে পড়েছে। দোচালা দোকান-ঘর—মুড়ি-বাতাসা আর বিড়ি-সিগারেট বিক্রি হয়। এখন দোকান বন্ধ। সামনে স্বর্ণচাঁপার গাছের নিচে দু-জনে বসল। তাকিয়ে তাকিয়ে যতদূর নজর চলে দেখছে। কী আশ্চর্য, সন্ধ্যা হয়ে যায়—এখনো গরুর-গাড়ির দেখা নেই। মাঠের ওপারে ধান-ক্ষেতের ভিতর সূর্য ডুবে যাচ্ছে। ঘুঘু ডাকছে, কোকিল ডাকছে, আরও কত কি নাম-না-জানা পাখী। চাষীরা সার বেঁধে ক্ষেত নিড়াচ্ছে, ঢাকের বাজনা আসছে অনেক দূরের কোন গ্রাম থেকে। ডাইনে খেজুর-তাল-নারিকেলের মাঝে মাঝে খোড়ো-বাড়ি।

আঁধার হয়ে এলো—গাড়ি না হোক, খবর নিতেও একজন-কেউ আসছে না। চাষীর ছেলে—হাতে দড়ি-খুঁটো ও খুঁটো-পোতা মুগুর, আগে আগে গরুর পাল—গরু তাড়িয়ে নিয়ে গ্রামে ঢুকছে। বিরক্ত বিব্রত হয়ে মহীন বলে, এখনো আসে না কেন?

যূথী বলে, ব্যস্ত কিসের! হোক না দেরি।

ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে, চমৎকার লাগছে যূথীর। চাঁদ উঁকি দিল পূব-আকাশে। স্বর্ণচাঁপার গন্ধ আসছে, অনেক ফুল ফুটেছে।

যূথী বলে, দু-তিন মাইল পথ তো মোটে, না হয় হেঁটেই চলে যাবো চাঁদের আলোয়। তুমি ক'টা ফুল পেড়ে এনে দাও দিকি—দেখি কেমন পুরুষ।

ঐ চাঁপা-ডালে যূথী, গলায় দড়ি দিয়েছিল দোকানির বউ।

ফের? আচ্ছা, যা খুশি বলোগে। আমি কানেই নেবো না মোটে—

দু-কানে হাত চাপা দিয়ে সেই সদর পথের পাশে যূথী মহীনের গা ঘেঁসে বসে পড়ল।

মহীন বলছিল, এই মাস ছয়েক বড় জোর হবে। ভাগ্যে জেলে ছিলাম—চোখে দেখতে হয় নি। উলঙ্গ মড়া সমস্তটা দিন ঝুলেছিল—আজকে কত ফুল ফুটে আছে সেই ডালে!

যূথী জিজ্ঞাসা করে, হয়েছিল কি?

শাড়ি ছিঁড়ে গিয়ে এমন হয়েছিল যে সম্ভ্রম থাকে না। ছেঁড়া-শাড়ি পাকিয়ে দড়ি করে মেয়েটা তখন লজ্জা বাঁচাল।

একটু চুপ করে থেকে মহীন বলতে লাগল, মানকচুর দু'তিনটে বড় বড় পাতা বেড় দিয়ে বেঁধেছে। ঐ হল তার আবরু। দারোগা এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত ঝুলতে লাগল। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, মড়া নামিয়ে ফ্যাসাদে পড়বে! মুরারি বৈরাগী চোখের জলে বারম্বার বলে, না হুজুর···কোনরকম ঝগড়াঝাটি হয় নি আমাদের মধ্যে। লোকের সামনে বেরুবার উপায় ছিল না তো—বউ তাই ঘরের মধ্যে ঝাঁপ এঁটে থাকত। শেষে বোধহয় মনের ঘেন্নায়···। দারোগা হাঁক দিলেন, চোপরও! থতমত খেয়ে মুরারি থামল। রিপোর্ট লিখে লাস চালান দিয়ে দারোগা সাহেব ঘোড়ায় উঠলেন।

যূথী হঠাৎ মহীনের হাত ধরে টানল: চলো, হাঁটতে লাগি—

হাঁটা তাকে বলে না, একরকম দৌড়তে শুরু করল। মহীন অবধি পেরে উঠছে না, পিছিয়ে পড়ছে। বলে, দাঁড়াও—দাঁড়াও। সবখানে এক দশা—পালাবে কোথা? পালিয়ে তো তোমাদের

কলকাতায় গিয়ে উঠতে পারবে না!

বাঁকের মুখে এই সময় গরুর-গাড়ি দেখা দিল। ঝণ্টু রয়েছে সঙ্গে। বাঁচা গেল।

অত কাদা লাগালে কোত্থেকে যূথী? পথ চলছ দেখে তো নয়!

পুকুর-ঘাটে পা ধুয়ে তারা গাড়ি চাপল। মন্থরগতিতে গাড়ি চলেছে। অসমান পথে এই উপরে ওঠে, এই নিচু গর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে, যেন দিনমান।

হঠাৎ চমকে উঠে যূথী জিজ্ঞাসা করে: ও কি—ঐ সমস্ত?

ভিটে—

এত?

মস্ত একটা পাড়া ছিল এখানে। শ' আড়াই গৃহস্থ।

সব মরে গেছে?

মরেছে, পালিয়েছেও। ঘর বাড়ি পুড়ে গেল কিনা!

তারপর গভীর কণ্ঠে মহীন বলল, এ-ও শোনা গল্প আমার। গল্প করতে করতে যাওয়া যাক।

যূথী অনুনয় করে বলে, ঐ সব মরাছাড়ার গল্প হয় তো থাক। গা কাঁপছে আমার দেখে শুনে।

না যূথী, মরা নয়—জলজ্যান্ত মানুষগুলোর গল্প। মেরেও যাদের মারতে পারা যায় না।

আঙুল তুলে এক প্রান্তে দেখিয়ে বলে, দশ-বারোটা চৌরিঘর ছিল এই বাড়ি। কর্তা লক্ষ্মণ প্রামাণিক—বুড়োমানুষ। বেলেডাঙার ঘটনার ক'দিন আগেও বুড়ো ডেকে আমায় আনারস খাইয়েছিল। যে পুকুরে আমরা পা ধুয়ে উঠলাম, পৌষের রাত-দুপুরে ঐখানে নাকি লক্ষ্মণের ঘাড় ধরে জলে চুবুচ্ছিল। দম বন্ধ হলে একটুখানি তোলে, আবার ঠেসে ধরে জলের নিচে।

কি করেছিল সে?

মহীন বলল, কতকগুলো ফেরারি কর্মীকে আশ্রয় দিয়েছিল।

হাঁ-না কোন কথাই বুড়োর মুখ দিয়ে বের করা গেল না। আধ-মরা অসাড় দেহ পড়ে রইল ঘাটের রানার উপর। তারই দিন ছয়েক পরে আগুন লেগে সাফ হয়ে গেল পাড়াটা।

যূথী শিউরে ওঠে: কী সর্বনাশ, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল?

মহীন ঘাড় নেড়ে বলে, জেলে ছিলাম—চোখে দেখি নি। চৌকিদারি রিপোর্টে আছে, দৈবাৎ আগুন লেগে সমস্ত পাড়া পুড়ে গিয়েছিল। গাঙের ধারের ঐ যে সব মড়া—ওগুলোও নাকি ভাতের অভাবে মারা যায় নি, মরেছে পিলেরোগ আর রক্তাল্পতায়। মুরারি বৈরাগীর বউ নাকি বৈরাগীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে শেষটা গলায় দড়ি দিয়েছিল। আর গ্রহণের যোগ ছিল বুঝি পৌষের সেই রাত্রে—লক্ষ্মণ প্রামাণিক স্বেচ্ছায় স্নান করছিল পুণ্যার্জনের লোভে, বুড়োমানুষ শেষটা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে—

যূথী চোখ ঢাকল আঁচলে, গভীর একটা নিশ্বাস ফেলল।

আহা রে!

মহীন বলে, দুঃখ কিসের! দু-শ'ও যদি মরে থাকে এ গাঁয়ে, দুই লাখ পেয়ে গেছেন তোমার বাবা অথবা কেউ না কেউ। কত নতুন নতুন বাড়ি উঠল, মৌজা কেনা হল। এটাও আইনসম্মত সরকারি হিসাব—জনপ্রতি এক এক হাজার।

তিক্ত হাসি হেসে উঠল। নির্জন গ্রামপথ হাসির তরঙ্গে শিউরে উঠল যেন।

সংগ্রাম-শেষে ধ্বংস-স্তূপের মতো দেখাচ্ছে—না যূথী?

দৃঢ়কণ্ঠে যূথী বলে, সংগ্রাম শেষ হয় নি। নতুন মালমশলা নিয়ে নতুন নতুন ঘাঁটি করে আসব আবার আমরা। সার্বিক যুদ্ধে একটি মানুষও এবার পিছিয়ে থাকবে না। পিছনে পড়লে কোটি কোটি পদক্ষেপের ধুলোর ঝড়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

(৪)

ফুলশয্যা পরের দিন! আমোদ-স্ফূর্তিতে প্রাচীন বাড়িটা ভেঙে পড়ে বুঝি-বা!

সিঁড়ির মুখে সৌদামিনী মহীনকে গ্রেপ্তার করলেন।

কেমন জব্দ ভাই? ছুটো দিনও একসঙ্গে কখনো বাড়িঘরে আটকে রাখতে পারি নি। না পেরেছি গায়ের জোরে, না পেরেছি গায়ের জৌলসে। হার মেনে তাই নতুন বয়সের সতীন নিয়ে এলাম। এতক্ষণে ছুটি দিল বুঝি। সে মহারানী কোথায়—ঘুমুচ্ছেন?

মুখ লাল হল মহীনের, জবাবে একটা কথা জোগায় না। বাসন্তী কি কাজে যাচ্ছিল, যেতে যেতে সকৌতুকে ঘরের দিকে তাকাল। মনে পড়ে গেল, উঠানের পাশে বকুলগাছের ঐখানটায় জ্যোৎস্নামগ্ন আর এক রাত্রির কথা। নিশ্বাস পড়ল।

যূথী নামছে। মহারানীই সত্যি! এ বাড়ীতে পা দিয়েছে কাল। নেমে আসছে, তা যেন ভূমিকম্পে কাঁপিয়ে তুলেছে সিঁড়িটা। জানিয়ে দিচ্ছে বউ এসেছে বটে একটি!

নীল রঙের একখানা শাড়ি পরেছে, কপালে সিঁছুরের টিপ, ছু-কানে ঝুমকো। এতেই অপরূপ দেখাচ্ছে তাকে। মুগ্ধ চোখে এক মুহূর্ত চেয়ে দিদিমা বললেন, এই সাজ হল নতুন বউয়ের?

আবার কি!

গয়নাগাঁটি না-ই পরলি দিদিভাই, নিতান্ত একপোঁচ আলতা পরে আয় পা-ছুটিতে।

যূথী ঘাড় নাড়ল।

অত দেমাক ভাল নয় বুঝলি? বর কেড়ে নিয়ে ডুব দেব বলে দিচ্ছি।

যূথী বলে, আমিও ছেড়ে দেবো বুঝি। আপনার বর কাড়ব তা-হলে, বরে বরে বদলাবদলি হবে।

সৌদামিনী বলেন, হুঁ—টের পাবি মজা। মকরধ্বজ মেড়ে খাওয়াতে হবে, বাতের তেল মালিশ করতে হবে। গলায় কম্ফর্টার আর পায়ে মোজা পরিয়ে চেয়ারের উপর ধরে বসিয়ে দিতে হবে দু-বেলা।

তা দেবো। সে ভালো—

নূতন বউয়ের গলাটা ধরে এল হঠাৎ। ম্লান হেসে বলতে লাগল, সে কিন্তু অনেক ভালো দিদিমা। যেমন বসিয়ে দেব, চুপচাপ তিনি সেইরকম বসে রইবেন। ছুটোছুটি করবেন না এদের মতো। ঝগড়া করব আবার ভাব করব দু'টিতে ঘরের মধ্যে বসে—যখন আমাদের যে রকম খুশি।

সৌদামিনী বিচলিত হলেন। আত্মীয়জন কারো কথা না শুনে মেয়েটা এত দিন গোঁ ধরে ছিল—জেল খাটা এবং বেরিয়ে এসে পুনশ্চ দেশোদ্ধার-কর্মের ফাঁকে কখন মহীনের ফুরসত হবে দুটো বিয়ের মন্ত্র পড়ে চলে যাবার। চলে আবার যাবেই, তাতে সন্দেহ নেই। বিয়ে মানে বাহুপাশে বন্দী হয়ে পড়ে থাকা নয় আজকালকার এই এদের কাছে।

দিদিমা কথায় না পেরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: বকে বকে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে দেখ আলতা পরবি কিনা, তাই শুনি।

যূথী কাতর হয়ে বলে, জুতোর সঙ্গে আলতা—সে বড্ড বিশ্রী দেখাবে দিদিমা। পায়ে পড়ি আপনার—

নিজের চেহারা আয়নায় দেখেছিস কোনদিন চেয়ে? সৌদামিনী বলতে লাগলেন, দেখাবে ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাকরুন পদ্মফুল থেকে সদ্য নেমে এলেন, দু'টি পায়ে পদ্মর রং লেগে রয়েছে।

যূথী হেসে উঠে বলে, উঃ—কবিত্ব দেখ দিদিমার!

মহীন বলল, তখনকার দিনে বামাবোধিনীতে পদ্য লিখতেন, তা

শোন নি বুঝি?

সৌদামিনী বলতে লাগলেন, সে এক কাণ্ড! দুপুরবেলা দরজায় খিল এঁটে বসে বসে লিখতাম। উনি টের পেয়ে গেছেন—কোন ফাঁকে গোটা দুই নকল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিচ্ছু জানি নে ভাই। ছাপা হয়ে গেলে তখন এনে দেখালেন। রক্ষে, বেনামিতে পাঠিয়েছিলেন বুদ্ধি করে। সৌদামিনীর জায়গায় জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী নামে বেরুল।

যুথী রাজি হল শেষে। বেশ, পরব আলতা—কিন্তু একা নয়, আপনাকেও পরতে হবে।

সৌদামিনী বলেন, শোন কথা। কাকে খুশি করতে আলতা পরব লো এই বয়সে? কাকে দেখাব?

আর কাউকে না হোক, দেখাবেন দাদামশায়কে। তখনকার দিনের সবচেয়ে আধুনিক—চুরি করে যিনি বউয়ের পদ্য ছাপিয়েছিলেন।

দেখবার কি চোখ আছে তাঁর! চশমাতেও আজকাল কুলোয় না রে ভাই—

ডাকাডাকি এই সময়। বনলতা বলছে, লবঙ্গ কোথা রেখে গেছেন ও দিদিমা? পান সাজা যাচ্ছে না।

রেখেছি আমার গালের মধ্যে পুরে।

বলে সৌদামিনী হাসতে হাসতে লবঙ্গ বের করতে ছুটলেন।

মহীন চুপি-চুপি বলে, আর ও-সব দিদিমাকে কক্ষনো বলো না যুথী—

কি?

এই আলতা পরার কথা-টথা। ওঁর কত কষ্ট হয় জানো না।

যুথী সভয়ে বলে, কেন—কি হয়েছে?

আমার মা হলেন দিদিমার বড় আদরের একমাত্র মেয়ে। সেই মেয়ের এই দশা—বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন—

যূথী বলে, ছি-ছি, বড্ড অন্যায় করেছি তো! এসে অবধি দেখছি কিনা আমোদস্ফূর্তি—

তুমি পা দিয়েছ, সেই থেকে ওঁর মূর্তি বদলেছে। সবাই আমরা অবাক হয়ে গেছি, দিদিমা আমাদের এত আমুদে!

সৌদামিনী আসছেন দেখে মহীন চক্ষের পলকে সরে পড়ল।

কি বলছিল? আমার নামে লাগালাগি করছিল যেন তোর কাছে? ঢাকছিস কেন, বল্।

বলছিল যে—

কি? বলে ভ্রূকুটি করলেন দিদিমা।

যূথীর মুখে মিথ্যাকথা জোগায় না। বলে, আপনাকে আলতা পরার কথা বলতে মানা করে দিল।

বটে! সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই দিদিমার? ইচ্ছে করে না আমার বুঝি?

যূথীর হাত ধরে বললেন, চল্—আলতা পরাবি আমায়। পরবই। আমি তুই আর বনলতা তিন বোনে আজ আলতা পরে সারা বাড়ি ঘুর-ঘুর করে বেড়াব।

আজ যেন একশ'খানা হাত হয়েছে সৌদামিনীর, একশ'টা চোখ। ক্রিয়াকর্মের বাড়ি, হাজার রকম ফাই-ফরমাস। সবাই ডাকে, দিদিমা গো -! কতবার উপর-নিচে করছেন তার অবধি নেই। কে বলবে, বুড়োমানুষ—যেন যাত্রা-থিয়েটারের মতো এক-মাথা নকল পাকাচুল পরে বাড়িময় দিদিমা মোড়লি করে বেড়াচ্ছেন।

একবার দেখতে পেলেন, রান্নাঘরের দাওয়ায় বনলতা আলুর ধামা নিয়ে বসেছে। তাড়া দিয়ে উঠলেন: ওঠ্, উঠে আয় বলছি।

মা বলে দিলেন যে—

মা'র যিনি মা তিনি বলছেন উঠে আসতে।

রোদ এসে পড়ে বনলতার মুখে ঘাম ফুটেছে। আঁচলে মুখ মুছিয়ে দিয়ে সৌদামিনী বললেন, যেমন তোর মা'র বুদ্ধি। বউটা উপরে একা আছে, আর আলু কুটতে বসিয়ে দিয়েছে এখানে। উপরে যা। শহুরে মেয়ে, নতুন পাড়াগাঁয়ে এসেছে—

গলা নামিয়ে মুচকি হেসে বললেন, বসে বসে ঝিমুচ্ছে দেখে এলাম। জিজ্ঞাসা কর্ গিয়ে তো, কি হয়েছে? মশা না ছারপোকা —কিসে কামড়েছে কাল সমস্ত রাত্রি?

বেলা পড়ে এলো। রোয়াকের ধারে পেট্রোম্যাক্সগুলো জ্বেলে জ্বেলে সারবন্দি রাখা হচ্ছে। নূতন চুনকাম করে বাড়ির চেহারা বদলে গেছে, ঘরগুলো ঝলমল করছে গোধূলি-আলোয়। তিন ডালা ফুল নিয়ে এসেছে। পদ্ম অল্পই পাওয়া গেছে—গোলাপ, গন্ধরাজ, স্থলপদ্ম, দোপাটি। বেলফুলের মালা দুলছে যূথীর গলায়। মালার ভয়ে মহীন কোথা পালিয়ে আছে, খুঁজে পাওয়া যায় নি এখনো।

চোখ-ইসারায় সৌদামিনী বনলতাকে এক পাশে ডেকে নিলেন।

এই, পাতান দিবি নে? কেমন মেয়ে তোরা?

না দিদিমা, যা শীত পড়েছে—

এখনি বুড়িয়ে গেলি? তোদের ঐ বয়সে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে ঘড়ার পর ঘড়া বয়েছি পুকুরঘাট থেকে। পুরো-হাতা জামা এঁটেছিস, তবু বলছিস শীত?

হেসে রহস্যভরা চোখে চেয়ে বললেন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি শীত যাতে না লাগে। উঁহু, না বললে শুনছি নে—.

টানতে টানতে সৌদামিনী তাকে নিয়ে গেলেন মাঝের ঘরে। ঢুকেছেন কি না ঢুকেছেন—যেন ডাকাত পড়ল। যূথী বাইরে থেকে দুয়োর ঝাঁকাচ্ছে।

সৌদামিনী সাড়া দিলেন : ঘুমিয়ে নেই রে বাপু। তোদেরই বিছানা করছি।

যুথী বলে, তা, দুয়োর এঁটেছেন কেন বলুন তো? শুনুন—বরণকুলোয় হত্তুকি না থাকলে নাকি হবে না, ওঁরা বলছেন।

দুয়োর খুলে সৌদামিনী বলেন, না হল তো বয়ে গেল। মাগো মা, কি রকম বেহায়া বউ দেখ্‌রে লতা। নিজে এসেছে বরণকুলোর তত্ত্ব নিয়ে। গাছকোমর বেঁধেছিস যে বড়! ঝাট দেওয়া হচ্ছে। ধূলোয় ভূত সেজেছিস— বর মাথায় ঘোল ঢেলে বিদেয় করে দেবে, টের পাবি তখন।

যুথী ভিতরে উঁকি দিয়ে সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করে : দুয়োর দিয়ে কি হচ্ছিল আপনাদের?

তোকে তা বলতে গেলাম কেন রে! নতুন বউ কৈফিয়ৎ চাইছে—ওরে লতা, হল কি দিনকে দিন!

রাত হয়েছে। মহীনের পাত্তা নেই। সে নাকি খেয়াঘাটে গিয়ে বসে আছে। তার কোন্ বন্ধু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এখানে আসছে—তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। মেয়েরা গাইবার জন্য যূথীকে ধরাধরি করছে, সৌদামিনীকেও টেনে এনে বসিয়েছে আসরের মাঝখানে। বাসন্তী যাচ্ছিল, উঁকি দিয়ে এদের এক নজর দেখে চলে গেল বাপকে দুধ আর রসগোল্লা খাওয়াতে। ইদানীং এমন হয়েছে—ঠিক আটটার সময় শ্রীশের খাবার চাই, ধরিত্রী রসাতলে গেলেও এক মিনিট এদিক-ওদিক হবে না। শুয়ে শুয়ে তিনি খাচ্ছেন, উঠে বসবার অবস্থা নেই। বাসন্তী একটু দূরে বাঁ-হাতের উপর থুতনি রেখে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। উৎসব-বাড়িতে আজ তার কি হয়েছে, বিদ্যুৎ-রেখার মতো মনের উপর ঝিকমিকিয়ে যাচ্ছে কতদিনের কত কথা!

ঐ ঘরেই তো,—মেয়েরা যেখানে হাসাহাসি হৈ-হল্লা করছে। শ্রীশ অত্যন্ত চটা ছিলেন জামাইয়ের উপর, মেয়ের দশা দেখে মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল তাঁর। ঘরে-বাইরে শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি বলতেন, মেয়ে আমার বিধবা। আইনে আটকায়, নয় তো বিয়ে দিয়ে দিতাম আবার। বাসন্তীকে নির্জনে ডেকে বলেছেন, সমস্তই তো দেখেশুনে দিয়েছিলাম—স্বামী-সুখ তোর ভাগ্যে নেই মা। মনে করিস বিধবা হয়েছিস। আর কোনো দিক দিয়ে কষ্ট পেতে না হয়, সে ব্যবস্থা করে তবে আমি মরব। বিনয় যেমন, তুইও তেমনি আমার আর এক ছেলে—মেয়ে নোস, বড় ছেলে তুই আমার।

ঐ ঘরে—ঐ মাঝের-ঘরেই হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা অরিজিত এল। বাবা-মা কেউ বাড়ি ছিলেন না, মেজমাসীর ছেলের অন্নপ্রাশনে গিয়েছিলেন। বাসন্তী যায়নি, আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কথায় কথায় তার প্রসঙ্গে উঠে পড়ে, দরদীরা আহা-হা করেন, সেই লজ্জায় কোথাও সে যায় না। একলা রান্নাঘরে বসে ভাত খাচ্ছিল, এমনি সময় ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরের মতো মানুষটি ঘরে ঢুকে দরজা দিল। ভাত ফেলে উঠে এলো বাসন্তী। তারই সমবয়সি এক সখী —প্রভাসনলিনী নাম, নূতন বিয়ে হয়েছে—বাসন্তী ভেবেছে সে-ই। প্রভাসের বর খুব প্রেমপত্র লেখে, তারই ক'খানা বাসন্তী এনে লুকিয়ে রেখেছে—সে ভাবল, ফাঁক বুঝে প্রভাস বুঝি ডাকাতি করতে এসেছে সেই চিঠিগুলো।

কে গো লাটসাহেব, দরজা দিয়েছ? খোল—দুয়োর খোল বলছি—

দুয়োর খুলে অরিজিত বলে, ভাত খাব চাট্টি।

সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলে উঠল বাসন্তীর। বলে, ভাত রেঁধে থালা সাজিয়ে কে বসে আছে কার জন্যে? কার দায় পড়েছে?

তবে একটু ঘুমিয়ে নিই। তিন দিন দু-চোখ এক করতে পারি নি।

অপমান গায়ে মাখে না, এরা এমনি। পরম আরামে অরিজিত মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ল। চোখ বুঝল সঙ্গে সঙ্গে। এক মুহূর্ত বাসন্তী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। অরিজিত চোখ বুজে আছে, তাই সে তাকিয়ে থাকতে পারল। তারপর চিঁড়ে নলেনগুড় আর আমসত্ব বাটিতে করে এনে ডাকল: ওঠ—শুনছ? উঠে খেয়ে নাও।

ভেবেছিল, স্বামীর গায়ে হাত ছোঁয়াবে না আর কোনো দিন। কিন্তু গাঢ় ঘুম—মুখের ডাকে ঘুম ভাঙে না, আর বেশি চিৎকার করতেও সাহস হয় না। অনেক নাড়ানাড়ি করে বিস্তর কষ্টে তাকে জাগিয়ে তুলল।

খেতে খেতে অরিজিত বলে, পরশু রাত্রে ভাত খেয়েছিলাম গোয়ালন্দর এক হোটেলে।

আর জোটে নি? জুটবে কি করে, মানুষ তো নও। পাখিও পারে না এমন উড়ে বেড়াতে।

কত কাজ!

কাজ নয়—বলো, অকাজ—

কাজ না থাকলে এদ্দিনের মধ্যে আসতাম না একবার দেখতে?

তিক্তকণ্ঠে বাসন্তী বলে, দয়া করে দেখে যাবে বলে পথ তাকিয়ে থাকে না কেউ। তোমাদের জানি তো! শিয়াল-কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে খেয়ে এ-দরজা সে-দরজা ঘুরে বেড়াও। লম্বা-লম্বা কথা বল্লে পশার বাড়িও না।

শেষ দিকটায় গলা কেমন ভারি হয়ে আসে। দ্রুত সে বেরিয়ে গেল। যখন ফিরে এল, অরিজিত খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

এত দয়া ?

স্নিগ্ধ হাসিভরা মুখে অরিজিত বলে, যাই তা হলে ?

আমি যে ভাত চাপিয়ে দিয়ে এলাম।

আজ নয়।

শোন, ভাত ফুটছে, আর মিনিট দশেক বড় জোর—

উঁহু। ছুটি নেই বাসন্তী, কড়া মনিব।

ছুটি মিলেছিল অভাবিত ভাবে এর বছরখানেক পরে।

শ্রীশকে বাতে ধরেছে। তাঁকে নিয়ে দিবারাত্রি কাটে। সেই সময় সন্ধ্যার পর এক অচেনা ছেলে এসে বলল, একজন আমাদের মধ্যে বড় অসুস্থ হয়েছেন। একবারটি দেখা করতে চান।

বাসন্তী বলে, হাসপাতালে যেতে বলো। নার্স-ডাক্তার নই আমরা।

সৌদামিনী এগিয়ে এলেন : কে বলো তো মানুষটি ?

ক্রুদ্ধস্বরে বাসন্তী বলে, সে খবরে আমাদের গরজ কি মা ? কত মানুষেরই রোগপীড়া হচ্ছে। ঐ যে—বাবা ডাকছেন যেন। উপরে চলো।

সৌদামিনী নড়লেন না দেখে অগ্নিদৃষ্টি হেনে একাই সে চলে গেল।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় আছে সে এখন ? কেমন আছে ?

আছেন নিকটেই—

এদিক-ওদিক চেয়ে ছোকরা ফিসফিস করে বলল, আছেন কদমতলার ঘাটে ডিঙি-নৌকোয়।

আমায় নিয়ে চলো।

কদমতলার ছায়ান্ধকারে হোগলাবনে ঢোকানো ছোট্ট ডিঙি।

ছইয়ের ভিতর অরিজিত নিস্পন্দ হয়ে আছে। ছোকরা গিয়ে ডাক দিল : চোখ মেলুন দাদা, দেখুন কে এসেছেন।

অরিজিত তাকাল। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, ঘাড় উঁচু করে এদিক-ওদিক চায়, খুঁজছে যেন আর কাকে। যেন হতাশ হয়ে বলল, আপনি একা এসেছেন মা?

তোমায় নিয়ে যেতে এলাম। দল বেঁধে ঘাটে এসে কি করব বাবা?

একটু ভেবে বললেন, হেঁটে যেতে পারবে কি আস্তে আস্তে আমাদের কাঁধ ধরে? ওঠ দিকি।

অরিজিত জিজ্ঞাসা করে : আপনি নিয়ে যাবেন?

হ্যাঁ। অমন করে তাকাচ্ছ—ধরিয়ে দেব ভাবছ নাকি।

ভাবছি, কোথায় নিয়ে তুলবেন। আপনাদের বাড়ি?

সৌদামিনী বললেন, তা ছাড়া পথের উপর বেঘোরে এমনি পড়ে থাকতে দিতে পারি না তো!

বাসন্তী রাগারাগি করে : কেন তুমি নিয়ে এলে মা?

সৌদামিনীও রেগে বলেন, আসব না তো কি মারা পড়বে বিনি-চিকিচ্ছেয়? ওষুধ নেই, ডাক্তার-বদ্যি নেই, এক বাটি বালি রেঁধে দেবার মানুষ অবধি নেই।

বাসন্তী বলে, ত্রি-সংসারে যাদের কেউ নেই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই এত বড় পৃথিবীতে, পথে-ঘাটেই মরে থাকে তারা। নিয়ে এসেছ মা, বাবা দেখতে পেলে অপমান করবেন—দূর করে দেবেন গলাধাক্কা দিয়ে।

দেখবেন কি করে—উঠতে তো পারেন না! আর এ-ও কিছু উপরতলায় পায়চারি করতে উঠছে না।

একটু স্তব্ধ থেকে সৌদামিনী বললেন, বাপের উপর বড্ড রেগে আছিস। কিন্তু ভেবে দেখ., যে নিয়মের মধ্যে ওঁরা মানুষ তার মাপে কিছুতেই যে হিসাব হয় না এদের। অরিজিতরা তাই সৃষ্টি-

ছাড়া মাথাপাগলা ওঁদের কাছে।

মাসখানেক কেটে গেল—একটানা প্রায় একটা মাস।

খুশিমুখে সৌদামিনী বললেন, শরীর বেশ সেরে এসেছে দেখতে দেখতে।

অরিজিত বলে, ওষুধ পড়েছে ভাল। আর এমন সেবাযত্ন হচ্ছে!

স্নিগ্ধ চোখে সে বাসন্তীর দিকে তাকাল। তখনকার সেই বাইশ বছর বয়সের বাসন্তীর দিকে।

বাসন্তী বলে, ওষুধ তবে বন্ধ করে দেওয়া যাক মা।

কেন?

ছুটির মেয়াদ বাড়বে।

অরিজিত বলল, তার চেয়ে ওষুধের বদলে এক পুরিয়া বিষ খাইয়ে দাও। ছুটি অনন্তব্যাপী হবে—কড়া মনিব নাগাল পাবে না আর তখন।

সৌদামিনী হেসে বলেন, মনিবটা কে শুনি?

অরিজিত বলে, এত বই পড়েন, এত খবর রাখেন, আপনি কি আর জানেন না মা! আমার দেশের কোটি কোটি মানুষ। এত দাবি আর কার হতে পারে? সৈন্যরা লড়াই করে, তার একটা সময়ের আন্দাজ থাকে—দু-বছর না-হয় পাঁচ বছর চলবে। কিন্তু এ সমুদ্র হতে কবে যে কূলে উঠব, কেউ আমরা জানি নে পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে চলেছে পারে উঠবার এই চেষ্টা। আর এমন নিষ্ঠুর ভুলো-মন মনিব আমাদের, মারা গেলে পায়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়, দশ বছর বাদে আমাদের হয়তো ভুলেও ভাববে না একটি বার।

বলতে বলতে যেন কত বড় রসিকতার কথা—অরিজিত হো-হো করে হেসে উঠল।

সেই রাত্রি। একটা বাজল দেয়াল-ঘড়িতে। ঘুম আসে না। বাসন্তী বিছানায় আইঢাই করছে। আলো জ্বালল, বই-টই কিছু পড়া যাক। চমকে ওঠে, হঠাৎ দেয়ালের আয়নায় নগ্ন-অঙ্গের

প্রতিবিম্ব পড়েছে। নিটোল সর্বাঙ্গে বাইশ বছর বয়সের যৌবন। সরু হার চিক-চিক করছে বুকের উপর। কপালে হাত দিয়ে বাসন্তী শিউরে উঠে, জ্বর হয়েছে নাকি? নিশ্বাস পড়ছে—তা-ও গরম। অস্বস্তি লাগছে, কত সব বিক্ষিপ্ত ভাবনা।

নিচে নেমে চুপি-চুপি বকুলতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। নিচে আসতে বারম্বার মানা করেছে, তবু বাসন্তী নেমে এলো।

মাঝের ঘরে আলো নিভিয়ে দিয়ে গূঢ় কথাবার্তা হচ্ছে। ক-জন এসেছে কোথা থেকে সন্ধ্যার পর। গলার আওয়াজ পাওয়া যায় না, তবু নিঃসন্দেহ তুমুল আলোচনা চলেছে এই গভীর রাত্রি অবধি।

শুকনো পাতা বাসন্তীর পায়ের তলে খড়মড়িয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন: কে?

অপ্রতিভ বাসন্তী বলে, আমি—আমি গো। বাইরে এসেছিলাম চলে যাচ্ছি।

জানলা খুলে গেল। অরিজিত জিজ্ঞাসা করে, বাইরে কেন? কি ওখানে?

কাছে গিয়ে বাসন্তী বলে, ঘুম ভেঙে গিয়ে হঠাৎ উঠোনের দিকে নজর পড়ল। মানুষ বলে মনে হল—গাছের তলায় চুপটি করে যেন কে দাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখতে এসেছিলাম।

মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, কিছু নয়—মনের ভুল।

অরিজিত বলে, তা হোক, খানিকক্ষণ তুমি একটু ঘুরে ঘুরে বেড়াও। না-ই বা ঘুমুলে।

একটু আগে দশমীর চাঁদ উঠেছে। নিঃশব্দ—নিঃসীম শান্তি চারিদিকে। স্বপ্ন যেন উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এই ঘুমের রাজ্য জুড়ে। এ হেন সময়ে তরুণী বউয়ের উপর ভার পড়ল—ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়ে বেড়াবার, কোনো চর এসে গোপন কথা শুনে না যায়।

আরও অনেকক্ষণ পরে অরিজিত বেরিয়ে এল। বাসন্তী তখনো

উঠানে—বকুলতলায়।

ওদিকে কোথা?

প্রণাম করে মাকে বলে কয়ে আসি।

আর আমাকে? কথা বলতে গিয়ে ওষ্ঠ থর-থর কেঁপে উঠল বাসন্তীর: আমাকে বলবে না কিছু?

অরিজিত থমকে দাঁড়াল: বলব বই কি!

কিন্তু জ্বর একেবারে বন্ধ হয় নি যে এখনো।

হাসিমুখে অরিজিত চেয়ে রইল।

চলে যাচ্ছ?

স্বামীর মুখে দু'টি চোখের দৃষ্টি পুঞ্জিত করে বাসন্তী প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে: যাচ্ছ এখনই? কোথা যাচ্ছ? আবার ফিরবে কবে?

তবু অরিজিত কথা বলে না। এমন শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, রাগ করা যায় না। সে যে কত ভালবাসে, নির্বাক চোখের কথায় বলা হয়ে যাচ্ছে।

কবে ফিরবে আমায় বলে যাও—

ফিরে আসব। বলে অরিজিত মাথায় হাত রাখল বাসন্তীর।

বনলতা তখন গর্ভে এসেছে। মেয়েটা বাপের মুখ দেখে নি। ফিরে আসব বলে চলে গেল, আঠার বছর কেটেছে তারপর।

শ্রীশের কণ্ঠস্বরে বাসন্তী চমকে ওঠে। ভাবনা ভেসে গেল। খেয়েদেয়ে তোয়ালেয় পরিপাটি করে মুখ মুছে তিনি বলছেন, চেয়ারটা ঠেলে দে তো মা জানলার ধারে। দেখি—

তাকিয়ে তাকিয়ে শ্রীশ দেখতে লাগলেন। আলো-আলোময় হয়েছে বাড়িখানা। ভাবলেশহীন তাঁর যে-মুখ সবাই দেখে এসেছে, আজকে সে-মুখে হাসি ঢল-ঢল করছে।···বেহালা বেজে উঠল। বাসন্তী উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখে সেই লোকটা—পাড়ায়

পাড়ায় বেহালা কাঁধে যে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। ঝাঁকড় চুল, গলায় কাঠের মালা, অস্থি-সর্বস্ব চেহারা। কোথাও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার থাকলে আপনি এসে জোটে, গেয়ে বাজিয়ে সকলের মনোরঞ্জন করে শেষে নিজেই একখানা পাতা করে বসে যায় ভোজসভা থেকে দূরে—একপাশে একলাটি। গায় ভারি চমৎকার।

বাসন্তী ডাকছে, বাবাজি, ও বাবাজি—

গণ্ডগোলে লোকটা শুনতে পায় না। বাসন্তী দ্রুত নেমে এলো। এসে বলে, গান গাও বাবাজি। সেই যে—সেই গানটা গাবে নাকি?

মাঝের ঘরে ওদিকে নূতন বউকে সেধে সেধে মেয়েরা হয়রান হচ্ছে। সৌদামিনী বললেন, বয়ে গেল না গাইল তো! আমি গাচ্ছি, তোরা শোন।

ছুটোছুটি করে সবাই সৌদামিনীকে ঘিরে বসে। আর যারা এদিকে-ওদিকে আছে, তাদেরও ডাক দেয়ঃ ওরে, দিদিমা গাবেন। গলা মিষ্টি বলে বড্ড দেমাক বউয়ের। কেউ ওর গান শুনব না। কানে আঙুল দেবো ও যদি গাইতে বসে।

সৌদামিনী বলেন, গোপাল উড়ের দলের গান কিন্তু—উনি এটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। দুয়োর দিয়ে সেকালে দু-জনে আমরা চুপিচুপি গাইতাম।

উঠে গিয়ে নিজেই সৌদামিনী ঝপাঝপ জানলা-খড়খড়ি এঁটে দিচ্ছেন। একটা নূতন-কিছু করবেনই আজ। এমনি সময় বেহালা। আর বাসন্তী ফরমাস করছে বাবাজিকে—

সৌদামিনী মেয়েদের ধমক দিয়ে উঠলেনঃ আহা, থাম্ দিকি তোরা—শুনতে দে, শুনতে দে। সঙ্গে সঙ্গে ঘর নিস্তব্ধ। সেই পুরাণো রুক্ষ স্বর—দিদিমার যে কণ্ঠের শাসনে মেয়েদের বুকের ভিতর অবধি গুরগুর করে ওঠে।

থাকতে পারলেন না সৌদামিনী, পায়ে পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে

এলেন। মেয়েরা পিছনে। যূথীও এসেছে। বারান্দা ভরে গেছে। উঠানে বকুলগাছের গুড়িতে একটা পা তুলে দিয়ে কাঁধে বেহালা রেখে বাবাজি বাজাচ্ছে, আর চোখ বুঁজে গাইছে :

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।
হাসি' হাসি' পরব ফাঁসি—
দেখবে ভারতবাসী।

সবাই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কোথায় ছিটকে গেল তারা এই মায়ামতী ধরিত্রীর কোল থেকে! গৌতম বুদ্ধের মতো সকল প্রলোভন উত্তীর্ণ হয়ে গেল—তাদের নিয়ে কে বেঁধেছে এই গান? ছন্দের নিপুণতা নেই, না আছে সুরের বাহার। নিরলঙ্কার নিতান্ত সাদাসিধে কতকগুলো কথা ঠেলেঠুলে দাঁড় করানো। তবু দূরতম গ্রাম অবধি ছড়িয়ে গেছে গানের কথা—কিসের গুণে?

বনলতা নিশ্বাস ফেলে বলল, আহা, ফিরবে না আর তারা কখনো, ফিরবে না, ফিরবে না—

সৌদামিনী কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। বনলতা চুপ করল ভয় পেয়ে।

গান থেমেছে। মেয়েরা ঘরে ঢুকল, আসর আবার জমছে। সৌদামিনীও যাচ্ছেন—দেখতে পেলেন, থাম ঠেশ দিয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে আছে বাসন্তী। মাকে দেখে তাড়াতাড়ি বাসন্তী চোখে আঁচল দিল।

সৌদামিনী বললেন, ছিঃ!

তারপর আস্তে আস্তে মাঝের ঘরে গিয়ে জমজমাট আসরে বসে পড়লেন। আবার সেই এক-মাথা পাকাচুল নবীনা দিদিমা-টি। এবার গান ধরেছে। আলো আর উল্লাসদীপ্ত ফুলশয্যার রাত্রি।

তারপর উৎসব মিটে গেল। শুয়ে পড়েছে সবাই। কুলুঙ্গিতে

মিটমিটে বরণ-দীপ জ্বলছে, আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি প্রকট হয়েছে তাতে।

মহীনের কোলের উপর ঝুপ করে যূথী বসে পড়ল। হাসির আভায় ঝলসিত মুখখানা কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ডাকে : ওগো—

খাটের তল থেকে, খুক !

বিপন্ন মহীন বলে, লাগছে গো। কম ভার নও তো তুমি—

যাও—বলে কৃত্রিম কোপে যূথী তাড়া দিয়ে উঠল। বিজলী-দীপ্তির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল ঘরের চারিদিকে। সুঠাম বাহু দু'টিতে মহীনের গলা জড়িয়ে কৌতুক-ভরা মৃদুকণ্ঠে ডাকে, প্রাণেশ্বর !

খুক-খুক-খুক !

হাসি হচ্ছে বনলতার একটা রোগ। এই নবেলি কাণ্ড দেখে কতক্ষণ সে থাকবে না হেসে ? খাটের নিচে সামনেটায় বাসনপত্র উপুড় করা। তার ওদিকে কম্বল পেতে দিব্যি আয়েস করে শুয়েছেন সৌদামিনী আর বনলতা। কী করা যায়—একা বনলতা কিছুতে রাজি হল না যে! তার ভয় করে। কিন্তু সমস্ত মাটি করে বুঝি হেসে! সৌদামিনী তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরলেন।

আর ওদিকে খাটের উপরে মাটি করল বেরসিক মহীনটা। চমৎকার জমে এসেছিল, নূতন বউকে সে ধমকে উঠল হঠাৎ। তোমার পায়ে ধুলো—পা ধুয়ে এসো।

জলের ঘটি নিয়ে পা ধুতে গিয়ে—ওমা, এমন বজ্জাত যূথীটা, আর মহীনও আছে ষড়যন্ত্রের মধ্যে—হুড়হুড় করে যূথী এই মাঘের রাত্রে জল ঢেলে দিল খাটের নিচে। কম্বল কাপড়চোপড় ভিজে জবজবে। জল না ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিত যদি, সে শাস্তি বেশি আরামের হত। দুয়োর খুলে হি-হি করতে করতে বারান্দা দিয়ে তাঁরা পালাচ্ছেন, এক হাতে জলের ঘটি আর এক হাতে টর্চ জেলে

যূথী তাড়া করেছে পিছনে। শিয়রে জানলার বাইরে আর একটি ছায়ামূর্তি—আরও একজন বাইরে থেকে দেখছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেছে, পালাবার চেষ্টা করছে—যূথী টর্চ ফেলল মুখে। বাসন্তী। অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছে মুখের উপর দিয়ে।

আপনি কাঁদছেন?

যূথী বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে যায়: কেন কাঁদছেন আপনি মা?

কই, না—কাঁদছি না তো আমি।

ধরা-গলায় জবাব দিয়ে বাসন্তী পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সৌদামিনী গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। স্থির পাষাণমূর্তির মতো খানিক দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে যূথী ঘরে ঢুকল। মা-বাপের কত প্রতীক্ষার পর এই বিয়ে। খুশিতে যূথী এতক্ষণ ঝলমল করছিল, হাওয়ায় উড়ছিল যেন তার মন। শাশুড়ির তাতে দুঃখ হয়েছে? জানলা অল্প একটু ফাঁক করে চেয়ে দেখছিলেন, এদের আনন্দে চোখে তাঁর জল এসে গেল? অভিমানে নববধূর মুখ থমথম করছে।

বারান্দায় বসে পড়েছেন সৌদামিনী। মায়ের কোলে মুখ গুঁজে বাসন্তী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আঠারো বৎসরের পুরাণো শোক আজ উচ্ছ্বসিত হয়েছে। সৌদামিনী ভর্ৎসনার সুরে বলছেন, ছিঃ বাসন্তী, কাঁদছিস তুই সেই থেকে? তারাই সব আজকে এই তো আমাদের ঘরে ঘরে—

চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, ওঠ্। ফিরে এসেছে সেই তারাই তো!

চোখ বুঁজে সত্যিই সৌদামিনী উপলব্ধি করেছেন, এই মহীনের দল তারাই—যারা বিদায় নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল পথে-প্রান্তরে, দেশলাইয়ের এক একটা কাঠির মতো অবহেলায় নিজেদের পুড়িয়ে দিয়ে গেল। স্নেহোচ্ছল বাংলার বাউলরা যাদের ফিরে আসবার

গান গেয়ে বেড়ায়, গান শুনে চোখ মোছেন মায়েরা। তারাই দেশের কোল জুড়ে ফিরে এসেছে—একটি ছু'টির জায়গায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ—নূতন কালের হাসিমুখ তরুণ-তরুণীদের মধ্যে, গণ-মানুষের প্রাণ-হিল্লোলের মধ্যে, আলো ভালবাসা আর ব্যথা-বেদনার মধ্যে। সেদিনের মুষ্টিমেয়র সঙ্কল্প সার্থক করতে এসে পৌঁচেছে এরা, আসছে—আরও কত আসছে, অগণ্য পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে..........